চিঠিপত্র

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১১। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

দ্বাদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র । দ্বাদশ খণ্ড

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩

শ্রীভবতোষ দত্ত- কর্তৃক সম্পাদিত

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭
মুদ্রক শ্রীরমারঞ্জন ভট্টাচার্য
শান্তিনিকেতন প্রেস । শান্তিনিকেতন

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

১
[১৮৯৮]

আমি ইতিপূর্ব্বেই প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা লইয়া অভিনন্দনজ্ঞাপন পূর্ব্বক আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। উহার প্রত্যেক গদ্য প্রবন্ধই সুপাঠ্য হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] প্রবন্ধটি সুগম্ভীর চিন্তাপূর্ণ— পাঠ করিয়া যথার্থ উপকার পাইলাম বলিয়া ধারণা হয়। নগেন্দ্র বাবুর গল্পটি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার অসামান্য ভাষা-নৈপুণ্য এবং প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ বলিতে পারি···প্রদীপের মত এমন একখণ্ড বাংলা সাময়িক পত্র ইতিপূর্ব্বে আমার হস্তগত হয় নাই।

২

বোলপুর * ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লিখিতে ভুলিয়াছিলাম জর্ম্মান কাগজগুলি এখানেই পাঠাইয়া দিবেন, সংকলনের উপায় করিব। কতকগুলি সংকলন হাতে আসিয়াছে সংশোধন করিয়া পাঠাইয়া দিব। এখানে কবে আসিতে পারিবেন?

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

২৫ জুলাই ১৯১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার লিখিত ইংরেজি পত্রখানি Modern Review পত্রে ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন— আশা করি বিচারে ভুল করেন নাই।

প্রুফে দ্বিতীয় গেলির শেষপ্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ যোগ করিয়াছি। ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও পদচ্ছেদ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন আছি— দয়া করিয়া যথেচ্ছা সংশোধন করিয়া দিবেন।

নেপালবাবু কিছু দিনের জন্য এখানকার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সেই কিছুকালের

মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে আরো আনন্দের কারণ হইবে।

আশা করি আপনার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। ইতি ৯ই শ্রাবণ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ আজ রবিবার বলিয়া প্রুফ রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠানো গেল না— তাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি? প্রবাসীর জন্য চারুকে গুটি তিনেক কবিতা পাঠাইয়াছি, এখনো প্রাপ্তিসংবাদ পাই নাই।

৪

[২২ জানুয়ারি ১৯১১?]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার অনুরোধ পালন না করা আমার পক্ষে কঠিন সেই-জন্যই আপনার প্রস্তাবে রাজি হইলাম, নহিলে ভিড় করিবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। অজিত প্রভৃতি দুই একজন এখানকার দলের লোক ইচ্ছা করেন বক্তৃতার দিনটা বৃহস্পতিবারে না হইয়া বুধবারে পড়ে তাহা হইলে তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে পারেন।

আমি সেই সভায় উপাসনার কাজ করিব না কেবল

আমার যাহা বলিবার তাহা বলিব। কি বিষয়ে বলিব তাহা আগে থাকিতে জানাইয়া দেওয়া কঠিন কারণ আমি যখন মুখে কিছু বলি তখন কি যে বলিব তাহা পূর্ব্বাহ্নে জানিবার কোনো উপায় আমার হাতে নাই। কিছু লিখিয়া পাঠ করি সে সময় এবং শান্তি নাই। ইতি রবিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কুমারস্বামী আশ্রমে আসিয়াছিলেন— তিনি আমার কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন— সেইজন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আমি তাড়াতাড়ি গোটা তিনচার কবিতা নিতান্ত নীরস গদ্যে তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছিলাম। কুমারস্বামী যদি সেগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিয়া দেন তবে Modern Review পত্রিকায় ছাপাইবেন। তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইয়া আসিলে আমার আপত্তির কারণ থাকিবেনা। অজিত কতকগুলি তর্জ্জমা করিয়াছিল— সেও কুমারস্বামীর হাতে আছে— তিনি যাহা ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া আপনার হাতে দিবেন তাহা আপনি প্রকাশ করিবেন।

কিন্তু স্বকৃত তর্জ্জমার বিড়ম্বনাগুলিকে কুমারস্বামী মাজিয়া ঘষিয়া দিলে তাহাতে অনুবাদক বলিয়া আমার নাম সংযোগ করা সঙ্গত হইবেনা।

ডাক্তার বসু বলিতেছিলেন, Sister Nivedita আমার দুইটি ছোট গল্প (কাবুলিওয়ালা ও ছুটি) ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিয়াছেন—তাহা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে, শুনিয়াছি সে দুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাঁহার আপত্তি নাই। ইতি
৮ই ফাল্গুন ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬
[এপ্রিল ? ১৯১১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তত্ত্ববোধিনীতে আমার ও বড়দাদার যে লেখা বাহির হইতেছে চারু তাহা প্রবাসীর জন্য চাহিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ দুইটি কতক ছাপানো ফর্ম্মা ও প্রুফ এবং কতক কাপি আকারে পাঠাইতেছি। বৈশাখের তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সঙ্গেই যদি প্রবাসীতে দিতে ইচ্ছা করেন ত দিবেন।

আমার বড় মেয়ে একটি ইংরাজি গল্পের তর্জ্জমা করিয়াছেন পাঠাইতেছি যদি পছন্দ করেন ত প্রবাসীতে দিবেন নচেৎ ভারতী প্রেসে পাঠাইয়া দিবেন।

আগামী ১লা বৈশাখে আমাদের আশ্রমে নববর্ষের উৎসব হইবে— সে জন্য আপনাকে নিমন্ত্রণ রহিল। তখন Easter-এর ছুটি আছে। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল— তাহারা এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে— আপনি তাহাদের সহায় না হইলে তাহাদের গতি নাই— এই কারণে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিব এইরূপ ভরসা তাহাদিগকে দিয়াছি।

ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে— এইজন্য এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না— জ্যৈষ্ঠে যাইবে।

বোলপুরে কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আর একবার আলোচনা করিয়া দেখিব। ইতি মঙ্গলবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩ মে ১৯১১

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া মফস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি

অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্ব্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল। কিন্তু আগে অজিতের লেখাটা বাহির হইয়া গেলে তাহার পরে এটা প্রকাশ হওয়া কি ভাল নয়? ভাবিয়া দেখিবেন। আমি ঐ লেখাটার ফাঁক ভরাইয়া আবার একটু সংশোধন করিয়া লইতেছি। যখন ইচ্ছা করেন পাইবেন।

মাতা শান্তার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই শুনিয়া দুঃখ বোধ করিতেছি— তাঁহার এই অস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের আতিথ্য যদি কোনো অংশে দায়ী হয় তবে সে আমার পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের কথা।

চারুকে বলিয়া দিবেন, বড়দাদার লেখাটা কম্পোজ হইবামাত্র সেটা ছাপিবার জন্য যেন তত্ত্ববোধিনীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

২৭ মে ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জীবনস্মৃতি কপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন— তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তিরূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে। ইতিমধ্যে আমি কালীমোহনকে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিতেছি তিনি আমার লেখাটাকে যেন প্রচার না করেন।

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে— সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যখন প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভাল করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া দেখিবেন— যদি কোনোখানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগল্‌ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্ম্মমভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না। যে সব বৃত্তান্তকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বলিয়া

বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে পারে। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ জুন ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রতীক্ষা নামক লেখাটি অল্প স্বল্প সংশোধন করিয়া দিলাম। গোড়ার দিকে দুই চার লাইন বর্ণনা ছিল, যাহা বাহুল্য এবং নিতান্ত দস্তুরমত, সেইগুলি বাদ দিয়াছি। শেষটুকুতেও অল্প একটু হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

সাময়িক পত্র যাহা পান তাহার ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে আমাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য আজই আপনাকে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে আপনার পত্রে তাহার উল্লেখ পাইলাম। অবশ্য, এখন নিজের সম্পাদকী দফ্তরের জন্যই ইহাদের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। তত্ত্ববোধিনীর রুচি এবং ক্ষুধা দুই সঙ্কীর্ণ অতএব প্রবাসীর জন্যও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে এমন আশা করা যায়। আপাতত কাগজগুলি এই ঠিকানাতেই পাঠাইবেন। এখানে আমার সঙ্কলনকারী দুই একটি আছে।

কাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার জীবনস্মৃতির কাপি আপনার কাছে পাঠাইয়াছি— বোধ হয় পাইয়াছেন। আশা করি আমার এই লেখাটিতে আমার শত্রু মিত্র কোনো পক্ষকেই উদ্বেজিত করিয়া তুলিবে না। যে পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছি ইহার পরেও আরো খানিকটা লেখা আছে। তাহাতে ক্রমশ অধিক করিয়া আমার রচনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কিনা। ইতি ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[সেপ্টেম্বর ১৯১১ ?]

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কলিকাতায় আমার যাওয়া কোনোমতেই সম্ভবপর হইবে না। এইরূপ যাতায়াতে আমার শরীর ও কাজের প্রচুর ক্ষতি হয়। আশুকে লিখিয়াছিলাম যে যদি শরীরটা ভাল থাকে ত যাইব— এখনো ভাল থাকিবার কোনো লক্ষণ দেখিতেছিনা। এবার রামমোহন রায় সভায় আমার যাওয়া ঘটিবে কি না সন্দেহ। গেলেও বক্তৃতাদি করিতে পারিব না। শক্তিতে কুলাইবে না।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

[৩১ অক্টোবর ? ১৯১১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। বোধ করি সবসুদ্ধ এক ফর্ম্মার অধিক হইবেনা। আমার ইচ্ছা প্রবাসীতে এই প্রবন্ধটি ছাপা হইলে সেই সঙ্গে চটি আকারে ইহাকে বাহির করিয়া চার পয়সা দামে বিক্রয় করা হয়। ছাপিবার খরচ বোধ করি বেশি হইবে না— সে খরচটা বিক্রয়ের মূল্য হইতে তুলিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা সুলভ চটি আকারে প্রচার করিলে উপকার হইতে পারে। যদি আমার এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি থাকে তবে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। লাভের টাকা এইরূপ সুলভ পুস্তিকা প্রকাশকার্য্যেই নিযুক্ত করা যাইবে।

এখনো নদীর উপকূল পথ গুণ টানিয়া চলিবার পক্ষে সর্ব্বত্র সুগম হয় নাই অতএব শিলাইদহের নিকটেই পদ্মার চরে বোট বাঁধিয়া থাকিব। প্রুফ ও পত্রিকা প্রভৃতি "শিলাইদা, নদিয়া" ঠিকানাতেই পাঠাইবেন।

শান্তা ও সীতাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইবেন ইতি মঙ্গলবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

৪ নভেম্বর ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ সেই নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় লেখাটা শেষ করিয়াছি— যদি সময় থাকে তবে আজই পাঠাইব কিন্তু রেজেষ্ট্রি করিবার অবসর যদি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবেনা— প্রায় এক ফর্ম্মা হইবে।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেই যে পুস্তিকা প্রকাশের প্রস্তাব করিয়াছিলাম সে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিবেন না। যে সকল প্রবন্ধ জনসমাজের বিচার-বুদ্ধিকে আঘাত করিয়া উদ্বোধিত করিবার উদ্দেশে লিখিত সেগুলি এইভাবে প্রচার করিলে যদি কোনো উপকার প্রত্যাশা করেন তবেই চেষ্টা করিবেন। আর একটি কথা মনে রাখিবেন আপনি নিজে যে প্রবন্ধগুলিকে যোগ্য মনে করিবেন সেইগুলিই ছাপিবেন। আমি এ সম্বন্ধে কোনো বিচার করিতে পারিব না। আপনার মনে যেটা ভাল লাগিবে অর্থাৎ যাহাতে কোনো উপকারের সম্ভাবনা বুঝিবেন সেইটেই নিজের দায়িত্বে আপনি এইরূপ ছাপিবেন। আমার সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আপনার এই অধিকার রহিল— যাহা প্রবাসীতে বাহির হইবে বা যাহা অন্যত্র। কিন্তু আপনি লেশমাত্র সঙ্কোচ মনে রাখিবেন না। আপনি যদি কোনো প্রবন্ধ ত্যাগ করেন তবে আমি তাহাতে কিছুমাত্র রাগ করিবনা।

নিবেদিতা আমার "কাবুলিওয়ালা"র যে ইংরেজি তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আপনি জগদীশের কাছে সন্ধান লইবেন।

Mrs Shomeকে আপনি বোধহয় জানেন। তাঁহারই এক কন্যাকে বৌমার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবার কথা চলিতেছে— যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায় তবে আপনাকে জানাইব। ইতি ১৮ই কার্ত্তিক ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

৯ নভেম্বর ১৯১১

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জয়-পরাজয়ের তর্জ্জমাটি আমার ভাল লাগিল। কেবল দুই এক জায়গায় প্রুফের মার্জ্জিনে আমি দুই একটা suggestion দিয়াছি আপনি বিচার করিয়া যথাবিহিত করিবেন। দুই একটা বাক্য কানে কেমন দুর্ব্বল ঠেকিয়াছে কিন্তু তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

নিবেদিতার কাবুলিওয়ালা কাল বিকালে পাইয়াছি। যদিচ রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠানো তবু সেটির খাম ছিঁড়িয়া খুলিয়া আবার জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ তিনখানি খুলিয়া জোড়া

চিঠি ইতিমধ্যে পাইয়াছি। বেশ বুঝা যাইতেছে আমাদের রাজকীয় শনির সন্দেহদৃষ্টি ইতিমধ্যে আমার প্রতি তীক্ষ্ণভাবে পড়িতেছে। চাণক্য রাজাকে বিশ্বাস করিতে বারণ করিয়াছেন বেশ দেখা যাইতেছে রাজায় প্রজায় বিশ্বাসের সম্বন্ধটা রাখিবার আশা করাই দুরাশা।

আমাদের বিদ্যালয়ের পরেও এতদিন পরে গোপনে রাজদণ্ডপাত হইয়াছে। হঠাৎ পূর্ব্ববঙ্গের রাজকর্ম্মচারীদের ছেলেরা বিদ্যালয় হইতে সরিতে আরম্ভ করিতেছে। এমন কি, টেলিগ্রাফযোগে তাহাদিগকে সরানো হইতেছে। আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতিই একান্তভাবে লক্ষ্য রাখিয়া আমি ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও বিদ্যালয়ে কোনোপ্রকার অশান্তিকর আলোচনা ঘটিতে দিই না। বস্তুত আমি ছাত্রদের মন সেদিক হইতে একেবারে ফিরাইয়া দিয়াছি— সেজন্য আমাকে নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ধর্ম্মপ্রচার হউক অথবা অন্য যে কোনো হিতকর্ম্মই হউক্— কোনো কিছু গড়িয়া তুলিতে গেলেই দেশের রাজার নিকট হইতে বাধা পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে মুখামুখি একটা বোঝাপড়ায় নামা যাইবে সে রাস্তাও বন্ধ— মেঘনাদের মত মেঘের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া যখন রাজশক্তি অস্ত্রপাত করে তখন তাহার জবাব দিবারও যো নাই নিজেকে বাঁচাইবারও পথ বন্ধ। এইপ্রকার ভীরু প্রণালীতে প্রজাদের সমস্ত হিতচেষ্টাকে দলন করিবার উদ্যোগের মত এমন হীনতা এবং দীনতা কি আছে। ইহাতে যে প্রজাকে শাসন করা হইতেছে রাজা তাহার চেয়েও

নিজেকে নীচে আনিয়া ফেলিতেছে। গুপ্তচর বিদূষকের দল যেখানে রাজাকে কানে ধরিয়া চালাইতেছে সেখানে রাজ্য-শাসনের সেই নিদারুণ প্রহসন কোন্ দানবীয় অট্টহাস্যে গিয়া সমাপ্ত হইবে!

যাহা হউক, দুই অসমপক্ষের এই অন্যায় লড়াই যতদিন চলিতে পারে চলুক্। দুঃখের মধ্য দিয়া পরাভবের মধ্য দিয়াও যিনি সারথি তিনি গম্যস্থানে লইয়া যাইবেন— ইতিমধ্যে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের যা কর্ত্তব্য তাহা করিব। হারিলেও ধর্ম্ম আমাদেব পক্ষে থাকিবেন— সেইখানে আমাদের জিত।

গবর্মেণ্টের এই গুপ্ত ছুরির আঘাতে কি পরিমাণে আমাদের রক্তশোষণ করিতে পারে তাহা আর কিছুদিন গেলে বুঝিতে পারিব। কিন্তু এই অন্যায়ের ছুরির বাঁট নাই— যে আঘাত করে সে কখনই নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। ইতি ২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

[নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে।

"রূপ ও অরূপ" বলিয়া একটি লেখা প্রবাসীর জন্য পাঠাইয়াছিলাম— পাইয়াছেন কি?

হেমলতা বৌমার কবিতাটি আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য জ্ঞানের নিকট দিয়াছিলাম— পান নাই কি?

আপনার প্রেরিত কাগজগুলি ষ্টেশনেই পাইলাম সুতরাং সঙ্গেই আসিয়াছে তাহার একটা সদ্গতি করিবার চেষ্টা করিব।

গল্প সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব ত আমার কাছে ভালই ঠেকিতেছে। ১১ই মাঘের পূর্ব্বে গল্প লেখায় হাত দেওয়া ঘটিবে না। ইতি শুক্রবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ডিসেম্বর ১৯১১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দীর্ঘকাল কন্যার পীড়ার উদ্বেগে Theistic Conference-এর জন্য "ধর্ম্মশিক্ষা" প্রবন্ধটি লিখিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া সেটি লিখিয়াছি। কিন্তু এখানে নিরুদ্বেগ অবকাশ এত বেশি যে প্রবন্ধটি বিনা বাধায় যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এত বড় বাংলা প্রবন্ধ কনফারেন্স্ সভায় পাঠ করা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। যদি সময় থাকিতে লেখা শেষ করিতে পারিতাম তবে ইংরেজি অনুবাদের চেষ্টা করিয়া ওটাকে বিদেশীদের কাছে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যাইত। কিন্তু আর তাহার সময় নাই। অতএব যদি আমাকে অব্যাহতি দেন তবে লেখাটা আর কোনো সময়ে বাঙালী শ্রোতাদের কাছে পড়িয়া চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে ভাবিয়াছিলাম লেখাটা পাঠাইয়া দিব তাহার পরে আপনারা যা খুসি করিবেন কিন্তু তাহার চেয়ে নিজে উপস্থিত হইয়া পাপক্ষালন করাই ভাল। কাল সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিতে চেষ্টা করিব। মঙ্গলবার আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে। কি বলেন? মঙ্গলবার সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হইতে পারিবে কি? যদি জোড়াসাঁকোয় ইহার উত্তর পাঠাইয়া দেন তবে কাল সন্ধ্যার সময়েই পাইব। ইতি রবিবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

[জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯১২]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বড়দিদির লেখা পাঠাইলাম। "ধর্ম্মের অধিকার" লেখাটার প্রুফ একবার দেখিতে দিবেন— তাহার মধ্যে কাটাকুটি জোড়া-তাড়া অনেক আছে— ভুল থাকিতে পারে। ইতি শনিবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিদ্যালয়েব জন্য একটি অধ্যক্ষসভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রথীন্দ্র ও সুরেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে— কেননা তাঁহাদের দুইজনের কাছ হইতে বিপদে আপদে অর্থের প্রত্যাশা করা যাইতে পারিবে।

আমি এখানে থাকিতে থাকিতে আপনি কি দুই একদিনের জন্য এখানে আসিবার অবসর করিতে পারিবেন? আমি বোধহয় আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিতে পারি। একবার

যদি আসা সম্ভব হয় তবে আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন। যদি ব্যাঘাত না থাকে তবে কবে আসিতে পারেন জানাইবেন। ইতি ২৬শে মাঘ ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জীবনস্মৃতির প্রুফ না হউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন কেননা কিছু কিছু বাড়ানো চলিতেছে। আমার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— আর ২০।২২ দিন লিখিতে পাইব ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। অতএব আপনি যদি "জীবনস্মৃতি"র সমস্ত কাপি আমার কাছে রেজেষ্ট্রি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপরে শেষ তুলির পোঁচ দিয়া সমস্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। সীতার ইচ্ছা জীবনস্মৃতি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিই— তাহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে অতএব কাপিগুলা একবার শীঘ্র করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

[১৯১২]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সেই পাঠ্যবহিটার কাপি পাঠাই। ইহার সঙ্গে গোটা দুই তিন গল্প যোগ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে "রাসমণির ছেলে" একটি এবং "গুপ্তধন" একটি। গুপ্তধন গল্পটি "আটটি গল্পে" পাইবেন, আরও গল্প যদি দেওয়া দরকার বোধ করেন তবে সেই আটটি গল্প হইতে বাছিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য যদি এই কাপির মধ্যে কোনো কারণে কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন আবশ্যক বোধ করেন তবে কুণ্ঠিত হইবেন না। বইয়ের নাম কি হইবে যদি ভাবিয়া ঠিক করেন তবে আমি বাঁচি। নামকরণ আমার আসে না।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

[১৯১২]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল রেজেষ্ট্রি ডাকে আপনাকে সেই সংকলিত স্কুল বইয়ের কাপি পাঠাইয়াছি। তাহার মধ্যে রাসমণির ছেলের গল্পটা দিতে বলিয়াছি। কিন্তু আমার বোধ হয় সেটা না দেওয়াই

ভাল। কারণ এই নূতন গল্পটি আর একটি বইয়ে ছাপান হইতেছে এবং এ বইটি বিদ্যালয়ের সম্পত্তি— ইহা পরিশরের হাতে দিই না— সে বই হইতে গল্প চুরি করিয়া আমাদের বিদ্যালয় কেন নিজেকে নিজে ঠকাইবে? আপনি আটটি গল্প বই হইতে অনধিকার প্রবেশ, কাবুলিওয়ালা, সাক্ষ্যদান প্রভৃতি তিন চারটি গল্প বাছিয়া লইয়া এই বইয়ের মধ্যে পুরিয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না এবং সেই ছোট ছোট গল্প ছেলেদের পড়িবার পক্ষেও সুবিধা হইবে। কি বলেন? জীবনস্মৃতির প্রুফটা পাঠাইবেন।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১
[১৩১২]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল শিলাইদহে যাওয়া হয় নাই। হয় ত আগামী কাল রাত্রে যাইব।

যদি এবারকার জীবনস্মৃতির ফাইল প্রস্তুত না হইয়া থাকে তবে অসংশোধিত প্রুফ পাইলেও চলিবে। অমনি আষাঢ়ের কাপি পাঠাইবেন, হয় ত কিছু যোগ করিতে হইবে। জীবনস্মৃতি

বই ছাপার কাজ কাপি অভাবে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। বৃহস্পতিবার।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

শিলাইদহ, * ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের জীবনস্মৃতি পাইলাম, সীতাকে এই খবরটা দিয়া নিশ্চিন্ত করিবেন। কিন্তু চৈত্রের প্রুফ ত পাইলাম না— সেইটেই সর্ব্বাগ্রে দরকার।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রুফটা সম্বন্ধে ডাকেই যদি ডাকাতি হইয়া থাকে তবে আর একখানা পাঠাইবেন

২৩

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ প্রুফ পাইলাম। ইহার শেষ প্যারাগ্রাফটায় কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। আজই তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধা হইল না, কারণ, হাতে এখন একটা অন্য লেখার উপসর্গ আছে। "ভগ্নহৃদয়" শীর্ষক এই প্যারাগ্রাফটি বৈশাখের কিস্তিতে চালাইয়া দিবেন। সেই হইলেই ঠিক ভাল হয়— চৈত্রের শেষে এটা ঠিক সঙ্গত হয় নাই— তাই এই প্যারাগ্রাফটা কাটিয়া রাখিলাম।

সেই বইটার নাম "পাঠসঞ্চয়" দিলে কেমন হয়? যে প্রবন্ধগুলি পাঠাইয়াছি তাহার মধ্যে কোনোটা যদি অনুপযুক্ত মনে করেন তবে বাদ দিয়া দিবেন।

"জীবনস্মৃতি"র শেষের কথাগুলা মোটামুটিভাবে লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— ছুটি আর ত বাকি নাই। এই কয়দিনের মধ্যে কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? বিশেষত ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখিতে হাত দিয়াছি— এটা লিখিতে সময় যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। দেখা যাক কতদূর কি হইয়া দাঁড়ায়। ইতি ১৩ ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

৭ মার্চ ১৯১২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পাঠসঞ্চয় লইয়া ত বিপদে পড়া গেল। গ্রন্থাবলী ঘাঁটিয়া ছেলেদের উপযোগী আর একটি প্রবন্ধও পাওয়া গেলনা। এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, প্রবাসীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সকল সঙ্কলন চলিয়াছে তাহার মধ্য হইতে আমার লেখা, এবং মীরার ও হেমলতা বৌমার লেখা হইতে বাছিয়া যতগুলা প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধ করেন জুড়িয়া দিবেন। সেই প্রবাসীগুলি হাতের কাছে থাকিলে নিজেই দেখিয়া দিতাম। স্মরণশক্তির অবস্থাও এমন যে কখন কি লিখিয়াছি তাহা মনেও নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকার দুই একটা ইস্কুল সম্বন্ধে কিছু যেন লিখিয়াছিলাম। এমন আরো কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে। ইহাতে যদি না কুলায় তবে আর ত উপায় দেখি না। তাহা হইলে অগত্যা প্রাইভেট পড়ার জন্যই এই পাঠসঞ্চয়টা তৈরি করিতে হইবে।

আমার প্রবন্ধপাঠসভায় সভাপতি কে হইবেন সেটা বিচার করিয়া স্থির করিবেন। আশুর কথা ত পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—আশু মুখুয্যে মশায়ের কথাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন—তিনিও ত বিচারক মানুষ। অবশ্য আমার মতামত তাঁহার কাছে কেমন ঠেকিবে তাহা জানি না। সভাপতির হাতে যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহাতে সমস্ত বক্তৃতার মাথায় ঘোল ঢালিয়া

দিয়া তিনি অক্ষত শরীরে বাড়ি চলিয়া যাইতে পারেন— এইটেই ভাবনার কথা। যাঁহার কথায় জবাব চলে তাঁহাকে ভয় করা কাপুরুষতা, কিন্তু সভাপতি যদি বিমুখ হন তবে সভার শেষ মুহূর্ত্তটা রামমোহন রায়ের গানের "শেষের সে দিন"-এর মতই ভয়ঙ্কর— কারণ, তখন "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

আগামী সোমবারে চাটগাঁ মেলে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়াছি। দেখা হইলে সকল কথা আলোচনা হইবে। ইতি ২৪শে ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫
২১ এপ্রিল ১৯১২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আগামী মঙ্গলবারে অভিনয়। এখানে বেশ ঠাণ্ডা আছে— বোধ হয় কলিকাতা হইতে আসিয়া উপকার বোধ করিবেন। শাস্ত্রীরা আসিতে পারিলে খুব খুসি হইব।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

১৩ মে ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কয়েকদিন থেকে আবার অসুস্থ বোধ করচি। জীবনস্মৃতি শ্রাবণের কিস্তিতে শেষ করে দিয়েছি— দেখলুম আর লেখবার সময়ও পাব না— ক্রমে জটিলতার অরণ্য ভেদ করে কলমও চলবে না।

লোকেনকে লিখে দেখব। আজকাল সে লেখায় অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে কি হয় বলা যায় না।

এখান থেকে ৭ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় ও বোধ হয় ১০ই বোম্বাই রওনা হব।

শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। সীতাকে বলবেন শ্রাবণের জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিটা তাঁর কাছেই পাঠাব— সেটা আর এক ব্যক্তির দ্বারা কাপি করিয়ে নিয়েছি। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩১৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭
২৭ জুন [১৯১২]

ওঁ 3 Villas on the Heath
Vale of Health
Hampstead
London. N. W.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লণ্ডনে একটু ফাঁকা জায়গা দেখিয়া একটা বাসা করিয়াছি। ছয় সপ্তাহ এখানে থাকিয়া তাহার পর বাহির হইয়া পড়িব।

এখানে আমি সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যিকদের চক্রের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। আমরা কবিতা ও গল্পের ইংরেজি তর্জ্জমা প্রকাশ করিবার জন্য ইঁহারা অকৃত্রিম উৎসাহের সহিত অনুরোধ করিতেছেন। আমার ভাল গল্পগুলির মাঝারি রকমের তর্জ্জমা খাড়া করিয়া দিলে ইঁহারা যত্নপূর্ব্বক মাজিয়া ঘষিয়া লইবার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন— এবং ভাল Publishers পাওয়া যাইবে এমন আশা পাওয়া গেছে।

Modern Reviewতে যে কয়টি বাহির হইয়াছিল পাঠাইয়া দিবেন। তাহা ছাড়া আর কিছু কি করা যাইতে পারে?

Modern Review এবারে পাই নাই। এখানে Ludgate Circus ঠিকানায় Thomas Cook & Son-এর কেয়ারে পাঠাইলেই আমি পাইব। দয়া করিয়া চারুকে বলিয়া দিবেন।

এ পর্য্যন্ত আমার শরীর ভালই আছে।

প্রবাসীর জন্য পথ হইতে দুইটি লেখা পাঠাইয়াছি

আশা করি শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া সেগুলি আপনার হস্তগত হইয়াছে। এখানে এমন আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছি যে লেখার অবকাশ পাওয়া শক্ত হইয়াছে।

শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। আশা করি আপনার শরীর ভাল আছে। ইতি ২৭শে জুন [১৯১২]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

৭ অক্টোবর ১৯১২

এখন হইতে আমার ঠিকানা

ওঁ C/o Prof. Seymour
Urbana.
Ilinois
U. S. A.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা আপনার পত্রে বিস্তারিতরূপে জানিতে পারিলাম।

আমার মনে হয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন জানাইয়া অভিভাবকদের নিকট মাসিক আরো দুই টাকা বেতন দাবি করার সময় আসিয়াছে। ইহাতে সকলেই সম্মত না হইতে পারেন কিন্তু যাঁহাদের অবস্থা ভাল তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে

পারেন। বর্ত্তমানে যে সকল ছাত্র আছে তাহাদের অভি-ভাবকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ২০ টাকা বেতন যদি না দেন তবে তাহাদিগকে রাখিতেই হইবে কিন্তু ভবিষ্যতে ২০ টাকার কমে ছাত্র লওয়া হইবে না এইরূপ নিয়ম করা অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপকদের বেতন কম করিবার প্রস্তাব করা আমি ঠিক মনে করি না। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক নিজে হইতে কিছু কি ত্যাগ করিবার কথা বলিতে পারেন না? উঁহাদের মধ্যে কেহ একজন দৃষ্টান্ত দেখাইলেই পথ সরল হইতে পারে।

আমি জানি না আমাদের বিদ্যালয়ের বেতনের হার অন্যত্র অপেক্ষা বেশি কিনা কিন্তু আমি ইহাদের কাহারও কাছে কিছু দাবি করিতে পারি না। ত্যাগ করিবার দাবি একমাত্র আমারই উপর আছে— বিদ্যালয়ের আইডিয়া আমাকেই ডাক দিয়াছিল অতএব যথার্থভাবে আমারই গরজ। যতক্ষণ আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে ততক্ষণ আমি অন্যের কাছে হাত পাতিতে পারি না। অতএব বিদ্যালয়ে অনটন যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার মূলে আমারই অপরাধ আছে— সেজন্য আমি অন্যকে দণ্ডনীয় করিব কি করিয়া? অধিক বেতনের অধ্যাপকদিগকে বিদায় করা একটা পন্থা বটে কিন্তু তাহা হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া ব্যয় বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। কারণ তাঁহারাই বিদ্যালয়ের মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

যেমন করিয়া হৌক একদিন ইহার সমস্ত দায় আমাকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে একথা মনে মনে ভাবিয়াছি।

অবশ্য আমার সামর্থ্যেরও সীমা আছে— সে সীমা যে বেশি দূরে তাহা নহে— কারণ, আমি ঋণে মগ্ন। তা ছাড়া আমার আয়ুর চেয়ে বিদ্যালয়ের আয়ু বেশি এই কথাই ধরিয়া লওয়া উচিত— অতএব আমার আয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের আয়কে এক করিয়া দেখিলে এক দিন বিপদ ঘটিবেই।

আসল কথা, যে জিনিষের প্রয়োজনকে সকলে সত্যভাবে স্বীকার না করে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাইয়া রাখা বিড়ম্বনা। যেটুকু আমার শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে বিদ্যালয়ের মধ্যে সেইটুকুই যদি সত্য হয় তবে সেই শক্তির শেষ পর্যন্তই চলুক। দেশালাই জ্বলে বাতিকে জ্বালাইবার জন্য, কিন্তু বাতি যদি না জ্বলে তবে দেশালাইয়ের শেষটুকু পর্য্যন্ত জ্বলুক— ততক্ষণ যতটুকু পথ পার হওয়া যায় ততটুকুই ভাল।

বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কটের কথা শুনিয়া দেশে ফিরিবার জন্য আমার মন টলিয়াছিল। কিন্তু আমার এখানকার বন্ধুরা বারম্বার আমাকে আশ্বাস দিতেছেন যে আমার বই ছাপার ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের আয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু বই বিক্রি করিয়া কিছু পাইব এ কথা বিশ্বাস করিবার ভরসা আমার চলিয়া গিয়াছে।...

আমেরিকায় যাইবার প্রস্তাব চলিতেছে। সেখানে কিছু সুবিধা হইতে পারে কিনা দেখিব। কিন্তু ভিক্ষা করিবার বিদ্যা আমি একেবারেই জানি না— এবং দেশের কাজের জন্য বিদেশে ভিক্ষার ঝুলি বাহির করিতে আমার অত্যন্ত লজ্জা

করে। অতএব আমার বিশ্বাস ঝুলিটা লুকানোই থাকি[ে]ব এবং যখন ফিরিয়া আসিব তখন শূন্য হাতেই ফিরিব।

জোর করিয়া বলিতে পারি না তবে আন্দাজে বলিতে পারি হয় ত হাজার খানেক টাকা নূতন বাড়ি তৈরি করিবার জন্য পাঠাইতেও পারি কিন্তু তাহাতেই কি সমস্যা পূরণ হইবে? অন্তর্যামী, যিনি অন্তরে বসিয়া বাহিরে ফল দিয়া থাকেন তিনি দেখিতেছেন আমাদের তপস্যা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। তিনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবেন না। যাহার আয়ু নাই তাহাকে মরিতে দিতেই হইবে। বাহিরে যে টানাটানি দেখিতেছেন সেটা অন্তরের টানাটানির বাহ্য লক্ষণ মাত্র। বাহির হইতে জোড়াতাড়া দিয়া একটা ইস্কুলকে খাড়া করিয়া রাখা চলে কারণ তাহা প্রাণের জিনিষ নহে কিন্তু আশ্রমকে বাঁচাইয়া রাখা চলে না। অতএব, যদি সামর্থ্য না থাকে তবে লোভ করিব না— আমাকে জবাব দিলেও তাঁহার সেবকের অভাব ঘটিবে না এই কথাই মনকে বুঝাইয়াছি। ইতি ২১শে আশ্বিন ১৩১৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুবার সঙ্গে আমার দেখা
হইয়াছে। ভালই আছে।
রোটেনস্টাইনকে অনুরোধ করিয়া

২৯

২ ডিসেম্বর ১৯১২

ওঁ 508 W. High Street.
Urbana
Illinois
U. S. A.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পাঠসঞ্চয় ত চলিল না। অতএব লাভের হিসাবটা এখন আলোচনা করিবার বিশেষ কোনো তাড়া নাই, আপাতত, ওটা ছাপার খরচ সম্বন্ধে বোধ হয় বিবেচনা করিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। সেটা ত চাপা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। কত খরচ হইয়াছে সে খবরটা জানাইবেন। নূতন ছাত্রদের বেতন কুড়ি টাকা করা সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়া দেখিবেন এবং পুরাতন ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছেও একবার দরবার করিবার কথা ভাবিয়া দেখিবেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলি আশা করি কোনো ব্যবসাদার ইংরেজ প্রকাশক গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিবে এবং সেই সঙ্গে আমার তরফেও আমি কিছু প্রস্তাব করিব— যদি সুবিধামত আপোষ হইয়া যায় তাহা হইলে কিছু পাইতে পারি। কিন্তু এদিকে আমি এক কীর্ত্তি করিয়া বসিয়াছি— বোলপুরের নিকটবর্ত্তী সুরুলের বাড়িটি সিংহদের কাছ হইতে আট হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া বসিয়া আছি এবং সেই দেনাটা শোধ করিবার চিন্তাও করিতেছি। গীতাঞ্জলি হইতে মাঝে মাঝে কিছু কিছু যদি পাওয়া যায় তবে ঐ দেনাটা কালক্রমে শোধ হইবার আশা আছে। ইতিমধ্যে ঐ বাড়িটা

বিদ্যালয়ের ব্যবহারে লাগাইবার কথা ভাবিবেন। রথী ফিরিয়া গেলে ঐখানে তাহার ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়া ঐ সূত্রে তাহার সঙ্গে কয়েকটি ছাত্রকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার সংকল্প আমার মনে আছে। রথীর ফিরিবার বিলম্ব আছে।

গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ এত দিনে পাইয়া থাকিবেন। Times এবং Nationএ তাহার ভাল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। বই সম্বন্ধে ইংরেজ পাঠকদের কাছ হইতে দুই একখানা পত্রও পাইতেছি। ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল রাত্রে বষ্টনে আসিয়াছি। পথে আপনার পত্র পাইলাম। রচেষ্টারে উদারমতি ধর্ম্মসম্প্রদায়দের একটি কন্‌গ্রেস ছিল, সেখানে আমি আহূত হইয়াছিলাম। কুড়ি মিনিট সময়ের মেয়াদে Race Conflict সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা পাঠ করিবার জন্য আমার প্রতি অনুরোধ ছিল। সেখানে জর্ম্মনির প্রসিদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ Eucken ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে সমাদর লাভ করিয়া আমি বিশেষ সম্মানিত হইয়াছি। তিনি

গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এবারকার ডাকে সন্তোষকে পাঠাইয়া দিয়াছি। Manchester Guardianএ Lascelles Abercrombie যে সমালোচনা লিখেছেন সেটা বোধ হয় দেখেছেন। বোধ হয় কালীমোহন তার এক কপি বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। সেটা পড়লে আপনারা খুসি হবেন। যিনি লেখক তিনি ইংলণ্ডের কবি ও সমালোচকদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছেন। আমার সব চেয়ে এইটে আনন্দের বিষয় বলে মনে হয় যে ইংলণ্ডের আধুনিক কবিসম্প্রদায় এমনতর অকুণ্ঠিত ঔদার্য্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের কবিকে উচ্চ আসন দিয়েছেন।

আমি এখানকার সভায় পড়বার জন্যে গোটাকতক ইংরেজি বক্তৃতা লিখেছি। তার একটা শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছি। সেখানকার শ্রোতাদের ভাল লেগেছে। সম্ভবত এখানেও পড়তে হবে। তার পরে Wisconsin, Iowa, Perdue এবং Michigan বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। অর্থাৎ এদেশে যতদিন আছি এগুলো পড়তে হবে। যদি সময় পাই তাহলে আরো গোটাকতক লিখব। তার পরে ইচ্ছা আছে ইংলণ্ডে যখন ফিরে যাব তখন সেখানেও একবার এই প্রবন্ধগুলো যাচাই করে নেব। এখানকার লোকেরা যতই ভাল বলুক এদের বিচারশক্তির উপর আমার শ্রদ্ধা নেই — দেখেছি এখানে নিতান্ত সস্তা জিনিষও উচ্চ মূল্যে বিকিয়ে যায়। আমাদের দেশের কত অযোগ্য লোক এখানে বক্তৃতা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করচে। তাদের দ্বারা দেশের গুরুতর অনিষ্ট হচ্ছে।...

যাই হোক্ একবার ইংলণ্ডের হাটে পরীক্ষা না করলে আমার এই ইংরেজি রচনাগুলির ঠিক ওজন বুঝতে পারচি নে। আপনারা আমাকে হাজার অভয় দিন তবু বিদেশী ভাষা ব্যবহার করবার সঙ্কোচ সহজে ঘুচতে চায় না। এদেশে পাঁচ ছয় বছর থেকে ভাষার সঙ্গে অত্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেলে তবে অসঙ্কোচ হতে পারতুম। যাই হোক আমার ইংরেজি গদ্য লেখা এখন কোনো কাগজে পাঠাতে ইচ্ছা করিনে— এখানকার কাগজে ছাপাবার জন্যে বারবার অনুরোধ পেয়েছি কিন্তু সে কাটিয়ে দিয়েছি। Rochesterএ যে ছোট্ট প্রবন্ধ পড়েছিলুম সেটা পাঠাচ্চি কিন্তু তাতে পদার্থ কিছুই নেই— যদি ছাপাবার যোগ্য মনে করেন ত ছাপাবেন। এখানকার এই অহরহ ঘোরাফেরা চলাবলায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি— এর থেকে কবে উদ্ধার পাব তাই ভাবচি। শান্তা সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৩

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

ফেব্রুয়ারি ১৯১৩

Felton Hall
Cambridge. Mass.
Boston

ফাল্গুন ১৩১৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়াছি। গতকল্য The Problem of Evil সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। শ্রোতারা বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এখানকার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Dr. Woods আমাকে বলিতেছিলেন যে ভারতবর্ষ হইতে অনেক অযোগ্য লোক আসিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ দেশে বক্তৃতা করিয়া থাকে— ইহাতে এমন অবস্থা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের কেহ বক্তৃতা করিবে শুনিলে শ্রোতা দুর্লভ হইয়া উঠে। একদা ভারতবর্ষের প্রতি এ দেশের লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এখন ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে।... ইঁহারা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু এ দেশের নিকট ইঁহারা আমাদের দেশকে অপমানিত করিতেছেন। দেশে আমাদের সম্মান নাই বিদেশেও যদি আমাদের মাথা হেঁট করিতে হয় তবে আমাদের কি দশা হইবে।

পাঠসঞ্চয়ের ছাপাই খরচের দেনা শোধ করিয়া দিবার জন্য কলিকাতায় লিখিয়া দিতেছি। বোধহয় আমাদের বিদেশভ্রমণের ব্যয় জোগাইতে গিয়া আমার তহবিলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা

শোচনীয় হইয়াছে— অতএব ৩।৪ মাসিক কিস্তিতে যদি এ দেনা শোধ হয় তাহা হইলে কি অসুবিধা হইবে? এ বই কি বিক্রয়ের কোনো প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারিবে না? আমাদের বিদ্যালয়েও কি ইহা পাঠ্যরূপে চলিবে না? যদি কিছু কিছু বিক্রয় হয় তবে তাহা হইতে এই খরচের দেনার পরিমাণ টাকা আমাদের খাতাঞ্চি যদু চাটুয্যেকে দিতে বলিবেন। দেনা শোধ হইলে বিদ্যালয়কে দেওয়া যাইবে।

এখানে অনেকে আমার বিদ্যালয় সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন— হয়ত এখান হইতে সাহায্য লাভ করা অসম্ভব হইবে না। কেবল মুস্কিল এই যে দশ জনের কাছে প্রচার করিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। নিজের দেশের কাজের জন্য এ দেশের লোকের মুখাপেক্ষী হইতে এত লজ্জা বোধ হয় যে আমি মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট করিয়া অভাব জানাইতে পারি না। আমি যদি আর একটু মুখর ও প্রখর হইতে পারিতাম তবে এখান হইতে সকল অভাব মোচন করিয়া ফিরিতে পারিতাম— কিন্তু আমার দ্বারা সে বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না। আমি আমার "পুরস্কার" কবিতার কবির মত শুধু বোধ করি মালা হাতে করিয়াই ফিরিব— যদিও নেপালবাবু আমার স্কন্ধে মোহরের থলি দেখিবার জন্য পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

১ মে ১৯১৩

ওঁ 37 Alfred Place West
South Kensington
London S. W.
1 May 1913

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া বুবা এবং প্রশান্ত দুই জনের সঙ্গেই দেখা হইয়াছে। বুবা আমাদের বাসার কাছাকাছিই থাকে এবং প্রশান্তও বোধ হয় আজকালের মধ্যে এই পাড়ায় আসিয়া আশ্রয় লইবে। এখানকার দুই চারি জন ভাল লোকের সঙ্গে যাহাতে বুবার আলাপ পরিচয় হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিব। বাহিরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস একেবারেই নাই বলিয়াই এখানকার লোকেদের সঙ্গে আলাপ করা আমাদের ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সকলেই বাসার মধ্যে পড়িয়া পড়া মুখস্থ করে— দেশকে ও দেশের লোককে চেনে না। সে হিসাবে আমাদের কালীমোহন ইংরেজি শিক্ষায় যথেষ্ট কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও এখানকার অনেক ভাল লোকের দলে মিশিতে পারিয়াছে এবং তাহাদের কাছ হইতে সকল বিষয়েই উপকৃত হইয়াছে।

Race Conflict প্রবন্ধটি আপনাদের ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি যে ছয়টি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছি তাহার মধ্যে একটি Hibbert Journal ও

একটি Quest পত্রিকায় দিয়াছি। এই দুটি পত্রই Quarterly সুতরাং জুলাই মাসে বাহির হইবে। এখনো প্রবন্ধগুলি এখানকার কেহ দেখে নাই। আগামী ১৯শে মে তারিখ হইতে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বক্তৃতা Quest Societyর সভায় পাঠ করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়াছি। অর্থ ও খ্যাতির লোভে কৃপণতা করিতে ইচ্ছা করি না— অতএব প্রথম প্রবন্ধটি Modern Reviewর জন্য পাঠাইতেছি। এটি Chicago Universityতে প্রথম পাঠ করিয়াছিলাম। যদি ইংরেজির কোনো গলদ থাকে দৃষ্টি রাখিবেন— কেন না ইংরেজি ভাষাটা আমি না জানিয়া আন্দাজে লিখি। এ প্রবন্ধগুলি আমি কানের অভ্যাসে লিখিয়াছি এবং এ দেশের শ্রোতারা কানে শুনিয়া ভাল বলিয়াছে— কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার উপরে ইস্কুল-মাষ্টারী চোখ পড়ে নাই। একজন ইংরেজ একবার চোখ বুলাইয়াছিলেন তিনি কেবলমাত্র গোটাকতক articleএর বাহুল্য বর্জ্জন ও অভাব মোচন করিয়া দিয়াছেন এবং কয়েকটা অব্যয় প্রয়োগের ত্রুটিও মার্জ্জনা করিয়াছেন। অতএব অনুমান করিতেছি একেবারে চমক লাগাইয়া দিবার মত ভুল ইহাতে নাই।

চৈত্র মাসের প্রবাসী আমি এখনো পাই নাই— বোধ করি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম বলিয়া গোলমালে মারা গিয়াছে। বাংলা লেখা অনেক দিন বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছি। ইংরেজিও যে বিস্তর লিখিতেছি তাহা নহে। নিতান্তই কুঁড়েমিতে ধরিয়াছে। বোধ করিতেছি এটা অনাবশ্যক কুঁড়েমি নয়।

শান্তা সীতাকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।
ইতি ১৮ই বৈশাখ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ মে ১৯১৩

ওঁ

C o Messers Thomas Cook & Son
Ludgate Circus
London
২৯ বৈশাখ ১৩২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দূর হইতে আপনি বুবার জন্য যে উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন তাহার অনেকটা অমূলক। আপনি তাহার প্রতি নিশ্চিন্ত চিত্তে আস্থা স্থাপন করিবেন এবং তাহার সম্বন্ধে আপনার মনে কোনো সংশয় আছে একথা তাহাকে বলিবেন না। তাহার ইচ্ছা, চেষ্টা ও শক্তির প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আছে ইহা জানিতে পারিলেই সে যথার্থ বল পাইবে। এখানকার কোনো লোকের প্রতি তাহার অভিভাবকতার ভার দিলে নিজের সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ববোধ শিথিল হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বুবার এখানে আসা যে ব্যর্থ হইবে না এ আশ্বাস আমি আপনাকে দিতে পারি।...

ইতিমধ্যে আমার আরো অনেকগুলি অনুবাদ জমা হইয়াছে। এইবার ম্যাকমিলানদের সহযোগে সেগুলি প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করা যাইতেছে। গীতাঞ্জলি এখানে সর্ব্বত্রই যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা আমার আশার অতীত হইয়াছে।

প্রবাসীর যে শত্রুসংখ্যা বাড়িতেছে ইহাতে আনন্দিত হইবেন। ইহাতে প্রবাসীর প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শত্রুসৃষ্টি করা শক্তিরই লক্ষণ— বিশ্ববিধাতারও শত্রুর অভাব নাই। আপনি বন্ধু যদি না পাইতেন তবে শত্রু দেখা দিত না। ইতি ১৯ বৈশাখ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

১৬ মে ১৯১৩

ওঁ

C/o Messers Thomas Cook & Son
Ludgate Circus
London
16 May 1913

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনাকে Modern Reviewর জন্য যে লেখাটা পাঠাইয়াছি তাহা আগামী সোমবারে পড়িতে হইবে এইজন্য তাহা ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া দেখি তাহাতে বেশ বড় বড়

অনেকগুলা ভুল রহিয়া গিয়াছে; তাহার কতকগুলার জন্য আমি দায়ী—কারণ সেগুলা আমার ইচ্ছাকৃত না হইলেও আমার স্বকৃত বটে— আর কতকগুলা টাইপ লেখকের— দুইয়ে মিলিয়া অপরাধের বোঝা ভারি হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি ছাপা সারা হইয়া যায় নাই। যদি পারি আজই আপনাকে একটা সংশোধিত পাণ্ডুলিপি পাঠাইব। এই জন্যই পরের ভাষায় লিখিতে আমি এত দ্বিধা বোধ করি। ফাঁকে ফাঁকে এত গলদ থাকিয়া যায় যে সে বাছাই করা দায়। বিশেষত বড় গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে এত বেশি কথার ভিড় যে তাহার ভিতর হইতে দুষ্ট ব্যাকরণের কীটগুলাকে নজর করিয়া বাহির করিতে পারি না। ছারপোকাওয়ালা হিন্দুস্থানী খাটিয়াগুলাকে যেমন করিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া আছড়াইতে হয় আমার বাকি প্রবন্ধগুলাকেও তেমনি করিয়া একবার আছড়াইব এই স্থির করিয়াছি।

চৈত্র মাসের প্রবাসী ও দুই খণ্ড Modern Review আমেরিকা ঘুরিয়া আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নভেম্বর ১৯১৩]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কণিকার তর্জ্জমাগুলি Modern Reviewতে বাহির হইয়াছে শুনিয়া প্রথমটা বড় ভয় পাইয়াছিলাম কেননা সেগুলা কাঁচা অবস্থার লেখা। তাহার পরে আবার প্রায় নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক পড়িয়া দেখিলাম ভয়ের কোনো কারণ নাই— আপনি আগাগোড়া মাজিয়া ঘষিয়া প্রায় নূতন করিয়া দিয়াছেন।

Ernest Rhys ও Andrews সাহেবের কাছ হইতে The Gardener সম্বন্ধে যে পত্র পাইয়াছি তাহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছি। এই তর্জ্জমাগুলি সম্বন্ধে আমার মনে কিছু ভয় ছিল। গীতাঞ্জলির তর্জ্জমায় ছন্দের অভাব তত বেশি গুরুতর নহে কিন্তু ক্ষণিকা সোনার তরী জাতীয় কবিতায় নিছক গদ্য পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে কেমন শোনাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না— এখন ভরসা হইতেছে ভাল লাগিতে পারে।

এইমাত্র ইংলণ্ড হইতে India Societyর সেক্রেটারি Fox Strangways সাহেবের নিকট হইতে পত্র পাইলাম তাঁহারা আমার চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ সোসাইটির জন্য ছাপিতে দিয়াছেন। এই মেলেই আমার কাছে একখানি preface চাহিয়াছেন। এখানে মূল মহাভারত খুঁজিয়া পাইলাম না। আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের সহিত চিত্রাঙ্গদার

মিলনকাহিনী মহাভারতে যেরূপ আছে দয়া করিয়া সংক্ষেপে সেইটুকু ইংরেজিতে লিখিয়া রথীকে দিলে রথী এই মেলেই যথাস্থানে পাঠাইতে পারিবে—আপনার হাতে জিনিষটিও ভাল হইবে।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

৭ ডিসেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চোখের বালি ইংরেজিতে তর্জ্জমা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন। অন্তত এ কাজ করিতে আমার বিস্তর সময় লাগিবে। Anderson চোখের বালির বিশেষ ভক্ত— তিনি ঐ বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষ্যে উহার একটি অংশ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন সেটুকু সুন্দর হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি রাজি হইবেন। ইংরেজি করিতে হইলে যে যে অংশ বাদ দেওয়া দরকার তাহা আমি দেখিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি। এবং তাঁহার তর্জ্জমা হইলেও আমি একবার দেখিয়া ঠিক করিয়া দিলে তাঁহার বুঝিবার ভুলের ত্রুটি সংশোধন হইতে পারিবে।

আপনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য যে তিনটি ছাত্রের

কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে তৃতীয়টিকে ছাড়া অন্য কাহাকেও লওয়া সঙ্গত হইবে না। স্থানাভাব ঘটিয়াছে, এ স্থলে অধিক বয়সের ছাত্র লইয়া ছোট ছেলেদের স্থান জুড়িয়া ফেলা আমাদের পক্ষে সকল প্রকারেই ক্ষতিকর। চতুর্থ শ্রেণীতেও বাহিরের ছাত্র লওয়া আমাদের অনভিমত— কারণ তাহাতে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর অনিষ্ট হয়— অন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের অধ্যাপনার পার্থক্য থাকাতে বাহিরের ছাত্রকে মাঝখানে লইলে আমাদের কাজ বাড়িয়া যায় ও অন্য ছাত্রদের ক্ষতি ঘটে— এই জন্য উমাপদ বাবুর দৌহিত্রটিকে বিদ্যালয়ে লওয়া সম্বন্ধে অধ্যাপকদের সম্মতি পাওয়া কঠিন হইবে। এই সম্বন্ধে তাঁহারা বারবার অনেক দুঃখ পাইয়াছেন বলিয়া বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন— বস্তুত বিনা বেতনে ছাত্র লওয়া তেমন গুরুতর বাধা নহে। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

১১ ডিসেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শিলাইদা

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চোখের বালির স্থানে স্থানে ছাঁটিয়া দেওয়া গেল। খুব যে বেশি বাদ পড়িল তাহা নহে। পড়িয়া বুঝিলাম স্থানে স্থানে তর্জ্জমা করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। জ্ঞানবাবুর কলম

কিরূপ চলে জানিনা কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন যদি এ কাজে লাগে তবে চলনসই গোছের একটা জিনিষ খাড়া করিতে পারে। তাহাকে অনুরোধ করিলে ফল পাইতে পারেন, অবশ্য লেখার মূল্য সে লইবে না। সুরেন যদি তর্জ্জমা করে তবে আমার সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে পারিবে। আমি নিজে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করি না। আমার অনভ্যস্ত কলম ইংরেজি ভাষা সঙ্কটের মধ্যে পথ করিয়া চলিতে বিস্তর সময় লয়। কাজটা এত কঠিন যে ভাল ইংরাজ লেখকের পক্ষেও দুঃসাধ্য আমার ত কথাই নাই।

সেই ছেলেটির কথা জগদানন্দকে লিখিতেছি— ছাত্র নিয়োগ সম্বন্ধে আমার স্বাধীন অধিকার নাই। ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮

[ডিসেম্বর ? ১৯১৩]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার অনুরোধ মত সুরেন চোখের বালির প্রথম কিস্তি ওখানে পাঠাইয়াছেন। অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে আছি। একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা পেন্সিলের লেখায় পরিবর্ত্তন করিয়াছি মাত্র। মোটের

উপর আমারও বোধ হয় ভালই হইয়াছে, আপনি পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আগামী বুধবার সায়াহ্নে কলিকাতায় পৌঁছিব। ইতি সোমবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অল্পকালের মধ্যে যে গল্পের বই পড়িয়াছি তাহার মধ্যে The Charwoman's Daughter নামক বইখানি বড় ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার একজন আধুনিক কবি এবং তাহার গদ্যরচনা ইংলণ্ডের পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। জানি না, বাংলায় তর্জ্জমা করিতে হইলে কাহারো অনুমতির প্রয়োজন হইবে কিনা। গ্রন্থকারের নামটি James Stephen। রথীর কাছে এই বই আছে। রথী রাঁচি গিয়াছে— ফিরিলে পাওয়া যাইতে পারে। সত্যেন্দ্রের চোখ খারাপ— নহিলে তাহারই হাতে তর্জ্জমা হইত ভাল। চারুকে চেষ্টা করিতে বলিবেন। আবশ্যক মত কিছু কিছু বাদসাদ দেওয়া দরকার হইতে পারে। গল্পটি ভাল সন্দেহ নাই— কিন্তু যাহারা গল্প পড়ে তাহাদের ভাল লাগিবে কিনা সে কথা বলা কঠিন। Joseph Conrad এখনকার কালের গল্পলেখকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়— তাঁহার

ছোট গল্প কিছু কিছু পড়িয়াছি— পড়িয়া ভাল লাগিয়াছে। ইতি রবিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ এপ্রিল [১৯১৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

খাসিয়া বালক দুটিকে লইতে আমার আপত্তি নাই। ব্যবস্থাপক সভার হাতে আপনার পত্রখানি দিয়াছি তাঁহাদের অধিবেশনে কর্ত্তব্য স্থির হইবে, কোনো বাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে স্থানাভাব ঘটিয়াছে, ছুটির পরে জায়গা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

১৩ই বৈশাখে ছাত্রগণ অচলায়তন অভিনয় করিবে— আপনি আমার মাতাদের লইয়া আসিতে পারিবেন? তাঁহাদিগকে আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ দিবেন এবং আপনি সস্ত্রীক আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩১৫[১]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ '১৩১৫' স্থলে '১৩২১' হইবে। দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়।

৪১

১৯ জুন ১৯১৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রবাসীর প্রতি আমার মমতা কিছুই কমে নাই। আমার মুস্কিল এই যে সবুজ পত্রে ঢাকা পড়িয়াছি। ওটা আত্মীয়ের কাগজ বলিয়াই যে কেবল উহাতে আটকা পড়িয়াছি তাহা নহে। ঐ কাগজটা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। অন্য পত্রিকাগুলি বিচিত্রবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে— তাহাতে তাহারা পাঠকদের মনকে বিশেষভাবে আঘাত করে না, নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। সবুজপত্রের একটা বিশেষ ভাবের আকৃতি ও প্রকৃতি যাহাতে ক্রমে দেশে পাঠকদের মনকে ধাক্কা দিয়া বিচলিত করে সম্পাদকের সেইরূপ উদ্যম দেখিয়া আমি নিতান্তই কর্ত্তব্যবোধে এই কাগজটিকে প্রথম হইতে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিনা কারণে সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখিবার বয়স আমার এখন নাই। ছুটির জন্য মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল আছে— অথচ কোনো মতেই ছুটি পাই না। এদিকে আজকাল আমার ক্ষমতার মধ্যে প্রাচুর্য্য জিনিষটা নাই তাই যেটুকু রচনা করি তাহাতে একটি কাগজের পেট কোনোমতে ভরে, উদ্বৃত্ত থাকে না। নহিলে প্রবাসীকে কদাচ বঞ্চিত করিতাম না— প্রবাসীর জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে ইহা নিশ্চয় জানিবেন। মনে মনে ঠিক

করিয়াছি আর একটা বছর সাহিত্যক্ষেত্রে কাজ করিয়া অবসর লইব। এই বৎসরে দেশের যৌবনকে যদি উদ্বোধিত করিতে পারি তবে আমার বৃদ্ধ বয়সের কর্ত্তব্য সমাধা হইবে বলিয়া মনে করি। রবি অস্ত যাইবার পূর্ব্বে একবার শেষ বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে চায়। ইতি ৫ই আষাঢ় ১৩১১

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২

[সেপ্টেম্বর ? ১৯১৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই সঙ্গে একটি ইংরেজি কবিতা পাঠাইতেছি। কবিতাটি আমার বন্ধু Mrs. Seymour এর রচনা। এটি আমাদের সকলেরই বিশেষ ভাল লাগিয়াছে— বোধ হয় আপনারও পছন্দ হইবে সেই আশায় পাঠাইলাম। যদি Modern Reviewতে ছাপান তবে এক কপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন—

Mrs. Seymour
909 Nevada Street
Urbana. Illinois
U. S. A.

প্রবাসীর জন্য আমার খাতায় অনেকগুলি গান জমিয়া উঠিয়াছে— কুঁড়েমি করিয়া কপি আর হইয়া উঠে না। শুনিয়াছি

চারু পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আসিবেন তিনি পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইতে পারিবেন। আশা করি ভাল আছেন— ছুটিতে কি কোথাও যাইবেন?

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

[১১ অক্টোবর ১৯১৪]

ওঁ

বুধগয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চারুর ছুটি শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাকে আমি ছুটি দিতে পারিতেছি না। সোমবারে এলাহাবাদে যাইব মঙ্গলবারে পৌঁছিব সেখানে চারুকে আশ্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের কিছু কাজ সারিবার ইচ্ছা আছে। এই দুই তিন দিনের জন্য প্রবাসীর কাজের যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে সে অপরাধে আমাকেই অপরাধী করিবেন এবং ক্ষমাও করিবেন আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি। ইতি রবিবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪
[নভেম্বর ১৯১৪]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে" গানটি তর্জ্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু মূলটা নির্ম্মল হইয়াছে বলিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু বাংলা এবং ইংরেজি উভয়েরই মালিক যখন আমি তখন কোনোপক্ষে নালিশ করিবার কোনো পথ নাই। অসিতের ছবির সঙ্গে এ লেখাটার কোনো বিরোধ হইবে না অতএব সে পক্ষেও ক্ষোভের কারণ দেখি না। এক্ষণে আপনার সম্পাদকীয় যাচনদারের পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হয় তবে ছাপাখানায় রওনা করিবেন।

গীতালি পাইয়াছেন ?

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫
৩ মার্চ [১৯১৫]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কবিতা প্রবাসীর জন্য পাঠাইলাম। যে খুসি নাম দিবেন। এক একটা লাইন বড় আছে, বোধ হয় দুই কলামকে এক করিয়া যদি এটা ছাপান তবে স্থানাভাব হইবে না। আমার

বোধ হয় কবিতা সেইরূপভাবে ছাপানো হইলে গদ্য প্রবন্ধের সহিত তাহার একটু বিশেষত্ব রক্ষা হয়।

মার্কাস অরেলিয়সের আত্মচিন্তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুচার লাইনের বেশি লিখিতে পারিব না। মন এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছে এবং বিশ্রামও অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আশা করি ভালো আছেন। ইতি ১৯ ফাল্গুন [১৩২১]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ অক্টোবর ? ১৯১৫

শ্রীনগর

শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটি

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাশ্মীরে আসিয়া পড়িয়াছি— বোধ করি ভালই লাগিবে। এ পর্য্যন্ত গিরিরাজের সঙ্গ পাইবার অবকাশ পাই নাই— সম্মান সৌজন্যের ব্যূহ যদি ভেদ করিতে পারি তবে কিছু আনন্দ সঞ্চয় করিতে পারিব বলিয়াই আশা করিতেছি।

ঠিক ঠাওরাইয়াছেন, অনুবাদক আমি ; কিন্তু ঢাক-বাদকের হাতে সে কথাটা সমর্পণ করিবেন না। আর কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শান লাগিয়া ঈর্ষ্যার মুখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যেন্দ্রের পক্ষেও ভালো হইবে না,

আমার পথও কণ্টকিত হইবে। তা ছাড়া কর্ম্মবন্ধনের আর একটা পাক বাড়িবে— অনেক বন্ধু এবং অবন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দাবী করিবেন— সে দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকস্তি হইয়া অবন্ধুর তটে পয়স্তি হইতে থাকিবে। এমনি করিয়া জীবনের ভার কেবল বৃথা বাড়িয়া চলে। শরশয্যায় ত এতদিন কাটিল, একটুখানি অবসরশয্যার সন্ধানে আছি— জুটিবে কিনা জানি না কিন্তু শরসংখ্যা আর বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না।

আপনার শরীর অনেকদিন হইতে খারাপ আছে শুনিয়া মন উদ্বিগ্ন আছে। অবকাশই আপনার একমাত্র পথ্য, কিন্তু জানি তাহা আপনার পক্ষে দুর্লভ। তবু একথাটা মনে রাখা উচিত যে অর্থ সম্বন্ধে দেনা করাটা যেমন অনুচিত প্রাণ সম্বন্ধেও তাই। আপনি কিছুকাল হইতে প্রাণের তহবিলে ঋণের দিকে ঝুঁকিয়া কাজ চালাইতেছেন— এ সম্বন্ধে একেবারে কি কোনো জবাবদিহি নাই?

শান্তা সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি আনুমানিক ২০শে আশ্বিন ১৩২২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

[মার্চ ১৯১৬]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি ছাত্রদের এই প্রবন্ধটা বাংলা হইতে ইংরেজি করিয়া মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছিলাম এণ্ড্রুজ লিখিয়া লইতেছিলেন। তারপরে সেইটেকে দুরস্ত করিয়া তিনি লিখিয়া দিলে আমি আবার তাহার উপর কিছু কারিগরি করিয়া তবে জিনিসটা দাঁড়াইয়াছে।

জীবনস্মৃতির তর্জ্জমাটার প্রুফ কাল সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা পাইয়া থাকিবেন। মাঝে মাঝে সুরেন দুইএক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়াছিল সেইগুলো পূরণ করিয়াছি দুএক জায়গায় কিছু বদল করিতেও হইয়াছে।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

২৮ মার্চ ১৯১৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ছাত্রশাসনের ইংরেজিটা যে তর্জ্জমা সে কথা বাদ দিলে ক্ষতি ছিল না— কেন না ইংরেজিতে কিছু কিছু বদল আছে— এবং রচনাটা প্রায়শই আমার।

চারুকে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়া দিয়াছি যতদিন Modern Reviewতে জীবনস্মৃতির অনুবাদ বাহির হইবে Yeatsকে একখণ্ড ও Rhysকে একখণ্ড করিয়া পাঠাইতে। আপনিও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। ইতি ১৫ চৈত্র ১৩২২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

৫ জুন ১৯১৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জাপানে পৌঁচেছি। অভ্যর্থনার ঘূর্ণি ঝড়ে পাক মেরে বেড়াচ্চি। কবে একটু শান্তি পাব জানিনে। আমার এখানকার খবর সমস্ত বোধহয় পেয়েচেন।

কোবে সহরে অনেকগুলি বাঙালি আছেন তাঁরা একটি সাহিত্যপরিষৎ প্রতিষ্ঠা করলেন। যা কিছু প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখবেন ছবি সমেত প্রবাসীতেই পাঠানো হবে স্থির হয়েচে। আপনি তার ভাষা একটু দেখে শুনে যদি ছাপান তা হলে এঁদের বিশেষ উৎসাহ হবে। এক খণ্ড প্রবাসী এঁরা বিনা-মূল্যে পেতে আশা করেন।

এখনি টোকিয়োতে যাচ্চি। তাই ব্যস্ত আছি। শান্তা

সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০

[মে ১৯১৭]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণটি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি পাঠাইতে পারেন আজই দেখিয়া আজই ফিরাইয়া দিব। আমার সেই ইংরেজি লেখাগুলি কি পাওয়া যাইবে?

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

[জুন ? ১৯১৭]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আগামীকাল বুধবারে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় যদুবাবুরা এসে বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থ প্রকাশের নিয়ম আলোচনা করবেন। আপনিও দয়া করে আসবেন। ইতি মঙ্গলবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

২৮ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হিন্দুমুসলমানের বিরোধ সম্বন্ধে কিছু লিখব বলেই ঠিক করেছিলুম কিন্তু দেখচি উদ্বেগ ও ক্লান্তির দরুণ আমার মনের শক্তি খুব তলায় এসে ঠেকেচে। এমন কি কারো সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দেখি অতি সামান্য কথাটা পর্য্যন্ত বেধে যায়। এদিকে কন্‌গ্রেসের সময় একটা লেকচার দিতে হবে এই চিন্তাটা মাথার উপর চেপে আছে, তাতে লেকচার এগোচ্চে না কিন্তু সেই চিন্তার আওতায় অন্য ছোটখাটো লেখাগুলো মুষড়ে আছে। তার পরে এই শান্তিনিকেতনের শরৎকালের দিনগুলি আমার মনের মধ্যে যে মন্ত্র আওড়াতে থাকে তাতে

আমার ধারণা একেবারে বদ্ধমূল করে দেয় যে আমি একজন কবি। সে ধারণাটার মস্ত দোষ এই যে, কিছুই না করাটা যে আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য নয় এমন একটা বিশ্বাস পেয়ে বসে। মনে হয় জগৎটা মস্ত, কালটাও নিরবধি, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা যে সৃষ্টি করে চলেচেন তা অতি বিচিত্র,— এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে আমি যদি ঘাসের ফুলও হই তবে সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারটাকে তেমনি করেই মেনে নিতে হবে যেমন করে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারাকে মানতে হয়। আমার চরম প্রয়োজনটা কি তা আমি জানি নে কিন্তু আমি সত্য যা তা আমাকে পূরোপূরি হতে হবে এইটুকু জানি। কিন্তু আমি যে সত্য কি সে খবরটা নানা দূত নানা রকম করে শুনিয়ে যায়। মুস্কিল এই যে, চৌমাথার ধারে আমার বাসা হয়েচে— জগতের Associated Pressএর আপিসটা তারই উপরের তলায়— সেখানে আমার নিজেরই খবরটা নানা রকম পাঠান্তরে নানা দিগন্তর থেকে এসে জমা হয়। কোনো একটা এক-রাস্তার ধারে যদি আমার বাসা মিলত, তাহলে আমার এই সাতান্ন বছর বয়সে হয় আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হতুম, নয় পাঁচালির দল করে গৌড়ীয় সুধীজনের মনোরঞ্জন করতুম— কিছু না হলেও তবু আলিপুরের জজ আদালতের সাম্‌লা-পদ্মবনে মাম্‌লা-বিলাসিনী যে লক্ষ্মী বিরাজ করেন তাঁর সেবকের ফর্দ্দে আমার একটা নাম লেখা হয়ে যেত। যাক্ এখন আর পরিতাপ করে কোনো লাভ নেই।

কিন্তু আপনি আমার কাছ থেকে প্রবাসীর প্রবন্ধ আদায় করবার জন্যে নানা কৌশলে চেষ্টা করে থাকেন এ রকম

জনশ্রুতি আমার কানে পৌঁছয় নি। কিন্তু যদি করতেন তাতে আমার দুঃখিত হবার কারণ থাকত না। আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না— ভয় মৈত্রী প্রলোভন প্রভৃতি নানা উপায়ে লেখা বেশি না পাই ত অল্প, অল্প না পাই ত স্বল্প আদায় করে নিতুম। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দোষ হচ্চে এই যে, খেজুর গাছের মত উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না। আপনি যদি আমাকে সময়মত ঘুষ না দিতেন তাহলে কোনোমতেই গোরা লেখা হত না। নিতান্ত অতিষ্ঠ না হলে আমি অধিকাংশ বড় বা ছোট গল্প লিখতুম না। যদি জিজ্ঞাসা করেন আমার মেজাজ এমন বিশ্রী কেন তবে তার উত্তর এই যে, আজ পর্য্যন্ত নানা প্রমাণ পেয়েও আমার সত্য বিশ্বাস হয় নি যে, আমি লিখতে পারি। ফরমাস পাবামাত্রই আমার মনে হয় আমার শক্তি নেই। অথচ শক্তি নেই সেটা ধরা পড়ে এমন ইচ্ছাও হয় না। এই ব্যাপারের মূলে একটি গোপন কথা আছে, সেটা বল্লে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি। সে হচ্চে এই যে, যে-ব্যক্তির লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে চলে সে রবীন্দ্র ঠাকুর নয়। যে-ব্যক্তি গাল খায় এবং নোবেল্ প্রাইজ পায় সেই হচ্চে স্যার রবীন্দ্রনাথ। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে পাছে একদিন ধরা পড়ে যায়। এই জন্যে কারো কাছে দাদন নিলে শোধ করবার ভয়ে তার রাত্রে ঘুম হয় না। যারা বলে গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমা আমি নিজে করি নি, আর কেউ করেচে তারা ঠিকই বলে। বস্তুত স্যার রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি জানেই না। আমাকে কোনো ইংরেজি সভাতে বক্তা

বা সভাপতিরূপে যদি ডাকা হয় তাহলেই আমার বিপদ— কেন না যিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখেন তিনি কোনোমতেই আমার সঙ্গে ইংরেজি সভায় আসতে রাজি হন না— এই জন্যে যদি বা সভায় যাই তবে চাণক্য মুনিকে স্মরণ করে "ন ভাষতে"র দলে বসে থাকি। ছোটখাট ইংরেজি কেজো চিঠি লেখার কাজে গীতাঞ্জলির অনুবাদককে কোনোমতে ভিড়তে পারি নে— বোধ হয় পাছে তাকে কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি করে দিই এই তার ভাবনা— কিন্তু কোনো বড় চিঠি লেখবার বেলায় হঠাৎ দেখ্‌তে পাই সে অনাহূত এসে কলম বাগিয়ে বসেচে। এই রকম খেয়ালী লোকের হাতে আমার খ্যাতিপ্রতিপত্তি বাঁধা আছে বলেই কোনো কাজের ভার নিয়ে আমি কাউকে কথা দিতে পারি নে। যাই হোক্‌ প্রবাসীর লেখার জন্যে আমাকে মাঝে মাঝে তাড়া দেবেন তাতে বুঝতে পারব এখনো আপনি বিশ্বাস করেন আমি লিখ্‌তে পারি।

"আমার ধর্ম্ম" প্রবন্ধটা স্বহস্তে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার জন্যে আমাকে আরো কেউ কেউ অনুরোধ করেচেন। চেষ্টা করে দেখ্‌ব। আমার মুস্কিল এই যে, অনুবাদ করতে পারি নে, আমাকে প্রায় নতুন করে লিখ্‌তে হয়। কেন না ঠিকমত অনুবাদ করতে গেলে নিজেকে ভুলে লেখা চলে না। নিজেকে না ভুল্‌লে আমি কথা ভুলি, ব্যাকরণ ভুলি, ষ্টাইল ভুলি। ইতি ১১ই কার্ত্তিক ১৩২৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

৩১ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি কোনো উপায়ে ইংরেজি অনুবাদ করতে পারি বলে সংস্কৃত অনুবাদ করতেও পারব এমন আশা করলেন কি করে? আমি বাংলা লেখাতেই যে সমস্ত কুকীর্ত্তি করি তাতে রাজেন্দ্র শাস্ত্রী যদি নামমাত্র রাজা না হতেন তাহলে আমাকে কোন্‌কালে উচ্ছন্ন করে দিতেন। আপনি আমাকে বৈয়াকরণিক মহাপাতকে উৎসাহিত করবেন না। বিধুশেখর শাস্ত্রীকে যদি অনুরোধ করেন তবে তিনি অতি সহজেই ঐ গানটিকে সংস্কৃত করে দিতে পারেন। আমি ওকে সংস্কৃত রেলপথের প্রায় লিলুয়া পর্য্যন্ত এগিয়ে রেখেছি— অনুস্বার বিসর্গের যোগে আর একটা ষ্টেশন পার হলেই যাত্রা সমাপ্ত হয়।

ইংরেজি বইগুলো ওরা একেবারে stereotype করে রাখে— একেবারে বহু সহস্র ছাপা শেষ হলে তবে বদলের সময় আসে— এই হয়েচে মুস্কিল। যা হোক্ "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"র ইংরেজিটা বইয়ের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করা যাবে।

কাল থেকে বিষম বাদলা নেমেচে। এত বর্ষণের পরেও আজও আকাশে প্রসন্নতার লক্ষণ দেখচি নে। ইতি ১৪ই কার্ত্তিক ১৩২৪

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

[৫ নভেম্বর ১৯১৭]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখা ত এগিয়ে চলেচে। আমি সকালে কেবল লিখি। বাকি দিনটা চিঠি লেখা এবং কুঁড়েমির মধ্যে ভাগ করে নিয়েচি। এখন আমার যে রকম শক্তি এবং মনের ভাব তাতে অল্প একটুখানি লেখার কাজের সঙ্গে সের দশ পনেরো ছুটি মিশিয়ে তবে কোনো রকমে লেখকের ব্যবসা চালাতে পারি। যে সব সম্পাদক নিত্য জোগান্ দাবী করেন তাঁদের মন রাখব কি করে এখন থেকে তাই ভাবচি। অথচ আমার দোষ হচ্চে অ্যাডাম্ স্মিথের অর্থনীতির নিয়মেই আমার লেখার কারবার চলে— ডিমাণ্ডের তাগিদ এলে তবেই আমার সাপ্লাই সুরু হয়। আপনি যদি এই সময়ে আমাকে একটু ধাক্কা না দিতেন তবে আমি এই শরৎকালের স্বচ্ছ অতল দিনগুলির মধ্যে ডুব মেরে নিছক নৈষ্কর্ম্ম্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতুম, আমার টিকি দেখা যেত না। দায়ে পড়ে যখন লিখতে সুরু করা গেল তার অল্পক্ষণের মধ্যেই মন সম্পূর্ণ আলাদা সুর ধরল, বল্লে, আমার লেখা উচিত ছিল। অথচ অল্পক্ষণ আগে আমি ওঁরই মন্ত্রণায় কলম ছেড়ে জানলার কাছে নেহাৎ ভালমানুষের মত চুপচাপ করে বসেছিলুম। আমি যদি চাণক্য হতুম তাহলে তিনি অন্য যে দুই একটি অবিশ্বাস্য পদার্থের উল্লেখ করেছেন তার

গোড়াতেই মন পদার্থকে বসিয়ে দিতুম। আমরা না চাইতেই মন জিনিসকে পেয়েচি অথচ কি করলে ওকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি জন্মায় এই সাধনাতেই জীবনটা গেল।

সাতটা লম্বা চওড়া পাতা আমার ক্ষুদে অক্ষরে ভরে গেছে। অর্থাৎ দু কলমে ভাগ করলে প্রবাসীর ১৪ কলমের বেশি ভর্ত্তি হবে। হয়ত আরো গোটা দুই ঐ রকম লম্বা পাতা ভরবে— অর্থাৎ আপনার ফর্ম্মা দুয়েক জুড়ে বসবে। হিসেব ঠিক হল কি না বল্‌তে পারি নে কিন্তু কাছাকাছি হয়ত হবে। এর মধ্যে হিন্দু মুসলমান, হোমরুল, ইন্টার্ণ্‌মেণ্ট্‌ প্রভৃতি কোনো কথাই বাদ পড়ে নি। লিখ্‌তে লিখ্‌তে কথা বেড়ে চলেচে— আরো দুতিন দিন যদি এমন ভাবে চলে তাহলে, সেদিন যেমন অবিশ্রাম বাদলার পালা পড়েছিল, সেই রকম হবে— বাতাসের সোঁ সোঁ, বৃষ্টির ঝরঝর মেঘের গরগর সমস্ত মিশে বীরকরুণ-হাস্যরসের একটা ছোটখাটো চক্রবাত্যার মত দাঁড়িয়ে যাবে। হয়ত ছাপা হবার পূর্ব্বে একবার সভায় দাঁড়িয়ে পড়লে আসর গরম করা যেতে পারে। সে সম্বন্ধে যথাকালে আপনার পরামর্শ নেওয়া যেতে পার্ব্বে।

সেই শচীন্দ্র দাসগুপ্ত এবং তার ভাইয়ের বধ ও বন্ধনের যে ইতিহাস সাক্ষ্যসাবুদসমেত আমার কাছে এসে জমেচে সে সম্বন্ধে আপনার কাছে সমস্ত দলিলসহ একটা প্রকাশ্য পত্র লিখতে চাই। সেই পত্র আপনি প্রবাসীর সাময়িক আলোচনা বিভাগে যদি সদরে পেশ করে দেন তাহলে কেমন হয়?

আপনারা শান্তিনিকেতনের এই ছুটির সময়কার শারদীয়া

মূর্ত্তিটা যে দেখতে পেলেন না এটা আপনাদের লোকসান হল। ইতি

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

৮ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করে প্রবন্ধটি আর একবার শোধন করে লিখচি। কাল পর্শু দুদিন সময় লাগবে বলে বোধ হচ্চে। প্রবাসীর দেড় ফর্ম্মার বেশি হবে বলে বোধ হয়না। ত্রিশ লাইনের চওড়া কাগজের দশ পৃষ্ঠা ভর্ত্তি হয়েচে— revise করবার সময় আমার যতটা ছাঁট পড়ে ততটা বাড়তি হয় না। এইজন্যে বলতে পারচিনে কতটা হবে। কাল এখানকার অধ্যাপকসভায় পড়েছিলুম— সকলেই নিরতিশয় উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়েছিলেন। যদি আদৌ সভাস্থলে এটা পড়ি তা হলে প্রবাসী বাহির হবার পূর্ব্বেই। পৌষ মাস পর্য্যন্ত বিলম্ব করলে ভাল হবে না। অগ্রানেই বাহির হওয়া চাই। Manchester Guardian আমার কাছে ভারতের আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে লেখা চাচ্চে। এইটেকেই ইংরেজি করে তাদের দিলে তাদের এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বোধ হয় এ প্রবন্ধটা

কিছু উপকারে লাগতে পারবে সেজন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি চাই ছুটি আপনারা মঞ্জুর করেন না, সেটাতে পরিণামে আত্মপ্রসাদ লাভেরই কারণ ঘটে। কিন্তু তাই বলেই Theistic Conferenceএর সভাপতিত্ব আমার কর্ত্তব্যের একটা অঙ্গ এ আমি কোনো মতেই মানতে পারিনে। Social Conferenceর চৌকিদারী করবার জন্যে পর্শু দিন ভূপেন-বাবুর পত্র পেয়েছিলুম। তাঁকে জানিয়েচি কোনো কন্‌ফারেন্সের চৌকির মাপে বিধাতা আমাকে তৈরি করেন নি সুতরাং সভা-পতিত্ব সম্বন্ধে আমি চিরকৌমার্য্যে সত্যবদ্ধ হয়ে পড়লুম। আমাদের দেশে আজকাল কন্যাদায়ের মতই সভাদায়টা খুব প্রবল হয়ে উঠেচে— অল্প দিনের মধ্যেই অনেকগুলি ঘটকালি আমার কাছে এসেচে— তার মধ্যে প্রথমটি ত লগ্ন পর্য্যন্ত পৌঁছলই না অথচ তার ঘটক বিদায় করতে আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি! আমার বয়সে এই সকল বিষয়ে খুবই সাবধান হওয়া উচিত।

বোধ হচ্চে দুচার দিনের মধ্যে অন্তত দুচার দিনের জন্যে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। ইতি ২১ কার্ত্তিক ১৩২৪

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

১০ জানুয়ারি ১৯১৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি গল্প চান কিন্তু মনে ত হয় আমার বড় গল্প লেখবার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। আসল কথা, ক্লান্তিতে আজকাল মনটা যেন ঝুঁকে পড়েচে। ইচ্ছা করচে কলমের গোলামী সম্পূর্ণ ত্যাগ করে এখানে ছেলেদের ক্লাশে মাষ্টারিতে ভর্ত্তি হই। ছুটো ক্লাশ পড়াতে শুরু করেচি— বেশ ভাল লাগচে। সন্ধ্যার সময় মানুষের ঘরে ফেরবার সময় আসে— তখন বড় সংসারের কাজ আর চলে না। ছোট ছেলেদের মধ্যে আমি সেই ঘরটুকু পাই। আর ত পাব্লিকের হাটে কারবার করতে একেবারেই ভাল লাগে না। আমার একদিন ছিল যখন প্রকৃতির সঙ্গে আমার গভীর একটা মিল ছিল। মাঝে এল লোকালয়। সেখানে প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরে ছুটোপাটি করেচি। আজ আবার দেখচি বিশ্বপ্রকৃতি আমার জানলায় এসে উঁকি মারচে। বড় আকাশ থেকে আমার ডাক আসচে। পৃথিবী থেকে আমার বিদায়ের রাস্তা ঐ দিক দিয়েই কোথায় চলেচে। এখনকার খাতাপত্র বন্ধ করে আবার আমাকে বেরতে হবে। জীবনের আরম্ভে বিশ্ব আমার কাছে এসেছিল, জীবনের পরিণামে আমাকেই সেই বিশ্বের দিকে চলতে হবে, সেই দিকেই আমার কিছু পাবার আছে, কিছু দেবার আছে— হয় ত ঐখান থেকেই সমস্ত ভাঙা জুড়ে নিয়ে, বেসুর সেরে নিয়ে তবে আবার রাজার আরেক দরবারে তালিম দিতে পারব।

এদিকে আবার ফেব্রুয়ারি মাসে বম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতে আমার যাত্রা স্থির হয়ে গেছে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেচি। হয় ত মার্চ্চের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ঘুরতে হবে। এই ভ্রমণের পরে যদি আবার হঠাৎ কলমের মুখে জোয়ার আসে বলা যায় না। তা হলে আবার লিখতে বসব। কিন্তু এর মধ্যে বিজ্ঞাপন দেবেন না। এবার টাকাও না। দরকার হবে না। খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত থেকে বইয়ের টাকা আসবে। ওদিকে বম্বেতে কিছু অর্থোপার্জ্জনের আয়োজন চল্‌চে। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ছাপতে যদি ইণ্ডিয়ান প্রেস নারাজ হন তা হলে আপনি ওগুলি ছাপিয়ে নেবেন। সীতা আশা করি ভাল আছে। ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৪

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

[২৩ এপ্রিল ১৯১৯]

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

এণ্ড্রুজ দিল্লিতে। সেখান থেকে দুই একটা চিঠি যা লিখেচেন তাতে মনটাকে উত্তপ্ত করেছে। আমার মনের তাপমান যন্ত্র আমার কলম। সুতরাং তার ভাষাটা চড়ে উঠচে। দুতিনখানা গরম চিঠি এণ্ড্রুজকে পাঠিয়েচি। বক্ষ্যমাণ

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন –

[illegible]

Dear Friend, I believe our outcry against the wrongs inflicted upon us by our governing power is becoming more vehement than is good for us. We must not claim sympathy or kind treatment with too great an insistence and intensely. I remember when in my school days I used to get blows and insult from a teacher who was particularly foul in his language and unjust in his dealings I refused to complain or to cry. In fact I tried to maintain my dignity by ignoring my punishment, and thus I had my moral victory. This victory possibly had no outer result and very likely it only exasperated my teacher without touching his conscience in the least. But all the same the victory abided with me and I am glad of it. He who causes suffering becomes small when his victims have the power to rise above it by their heroism of fearlessness. This is the [illegible] which Gandhi has been trying to preach to his countrymen. And now when [illegible] the [plaint] of moral power above those of the brute forces has met with an apparent failure, when those of us who desire success without having to pay for it and others who wait interminable days to reap their harvest of comfortable politics from the soil of sycophancy are hastening to disown him with shrill protestation of innocence, Gandhi's personality shines before world in greater glory than when his light was blurred by the duststorm of popularity. And this one fact of his presence in our midst reconciles us to whatever sufferings we are passing

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ৫৭ । আংশিক পাণ্ডুলিপিচিত্র

চিঠিখানি আজ লিখে মনে করলুম আপনার সম্পাদকী দরবারে তার নকল পাঠাই। এটা বর্ত্তমান দুর্যোগের দিনে প্রকাশযোগ্য হবে কিনা জানিনে। আপনি যা ভাল মনে করেন করবেন।

Dear Friend, I believe our outcry against the wrongs inflicted upon us by our governing power is becoming more vehement than is good for us. We must not claim sympathy or kind treatment with too great an insistence and intensity. I remember when in my schooldays I used to get blows and insult from a teacher who was particularly foul in his language and unjust in his dealings I refused to complain or to cry. In fact I tried to maintain my dignity by ignoring my punishment, and thus I had my moral victory. This victory possibly had no other result and very likely it only exasperated my teacher without touching his conscience in the least. But all the same the victory abided with me and I am glad of it. He who causes suffering becomes small when his victims have the power to rise above it by their heroism of fearlessness. This is the lesson which Gandhi has been trying to preach to his countrymen, and now when his attempt to hold the banner of moral power above those of the brute forces has met with an apparent failure, when those of us who desire success

without having to pay for it and others who wait interminable days to reap their harvest of comfortable politics from the soil of sycophancy are hastening to disown him with shrill protestation of innocence, Gandhi's personality shines before us with a greater glory than when his light was blurred by the duststorm of popularity. And this one fact of his presence in our midst reconciles us to whatever sufferings we are passing through and whatever others we have to face. The expression of the best ideal of the age need not grow fat in bulk but let it become immortal with its truth. And the rejection of it by a number of timid people overwhelmed with terror by no means proves its rejection by our history. Please convey my *namaskar* to Mahatmaji in these days of his trial.

Yours Rabindranath Tagore

৫৮

১১ মে ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন সংবাদ ১৩০৪ শালে, সুতরাং বছর বাইশ পূর্ব্বে, লিখিত।

যথারীতি জন্মোৎসব হয়ে গেল— সেদিন আমার নামের

প্রথম অংশ বলবান ছিল— তার পর দিন থেকে দ্বিতীয় অংশ আপন পালা সুরু করেচে। বেশ পেট ভরে বৃষ্টি হয়েচে।

সংযুক্তাকে আমার সংযুক্ত আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি

২৮ বৈশাখ ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

২৪ অগষ্ট ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ইংরেজি "ঘরে বাহিরে"র সমালোচনার cuttings আমার কাছে অনেকগুলি আসিয়াছে। সকলগুলিতেই সাধারণত সাহিত্য ও উপদেশ ও বিচারের তরফ হইতে বইখানির বিশেষ প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছে। কেবল একখানি মাত্র কাগজে boycott সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং এই উপলক্ষ্যে গাঁধির চেষ্টার বিরুদ্ধে আমার মত খাড়া করা হইয়াছে। অনেক কাগজেই একথা বলিয়াছে যে এ বইখানিতে প্রকাশিত তত্ত্বগুলি য়ুরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুজ্য। বস্তুত "ঘরে বাইরে" বইখানিকে বাঙালী পাঠক যেরূপ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিয়াছিল বিলাতের পাঠকেরা তেমন করিয়া দেখে নাই— ইহাতে অমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমি আমাদের দেশের পোলিটিক্যাল অবস্থাকে মুখ্য করিয়া সাহিত্য

রচনা করিতে অক্ষম— অথচ সেই কুণো দৃষ্টিতে আমার লেখা পড়িলে পদে পদে উল্টা বুঝিতে হয়। এইজন্যই "অচলায়তন"কে কেবল হিন্দুসমাজের উপর আরোপ করিয়া ও বইটাকে অধিকাংশ পাঠক অত্যন্ত বাঁকা করিয়া ধরে। অচলায়তন যদি সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েই না থাকিত তবে এ বই আমি কখনই লিখিতাম না। "ঘরে বাইরে"র মূল কথাটি রাষ্ট্রতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব আকারে বর্ত্তমান কালের সকল জাতির মধ্যেই চিন্তায় ও কর্ম্মে ব্যাপকরূপে সংক্রামিত। সেই কারণেই এ বইটি আমার পক্ষে লেখা সহজ হইয়াছে। অবশ্য গল্পের মূল ভাবটি যতই সর্ব্বজনীন হউক না তাহার মূর্ত্তিটি বিশেষ দেশকালকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না— সেই কারণে "ঘরে বাইরে" বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলন আশ্রয় করিয়া আপন আখ্যায়িকার কাঠামো বানাইয়াছে। ইহা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নহে।

সুরেনকে "গোরা" তর্জ্জমা করিতে অনুরোধ করিয়াছি॥ কিন্তু ইহার তর্জ্জমা শেষ হইয়া প্রকাশ হইতে অন্তত আরো দেড় বৎসর লাগিবে। অতএব "ঘরে বাইরে"র প্রতিষেধকরূপে এখনি ফল দিতে পারিবে না। যাহা হউক সুরেনকে আর একবার তাড়া দিব।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

[৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৯]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এইমাত্র মুলুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বড় ব্যথা বোধ করিলাম। তাহাকে আমি পড়াইয়াছি এবং তাহার প্রতি আমার বিশেষ স্নেহ ছিল। আমাকে আপনাদের ব্যথার ব্যথী বলিয়া জানিবেন। ঈশ্বর আপনাদিগকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন। ইতি সোমবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

[২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৯]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুলুর শ্রাদ্ধদিনের উপাসনা উপলক্ষ্যে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহার সারমর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইতেছি। যদি কোনোরূপে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন ত করিবেন। ইহার কাপি আমার কাছে নাই। অতএব প্রয়োজন অতীত হইলে ইহা আমাকে পাঠাইয়া দিবেন— অগ্রহায়ণের শান্তিনিকেতনে ছাপিব। ইতি বুধবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

১৫ নভেম্বর ১৯১৯

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে রাত্রে শিলং প্রভৃতি ঘুরিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম তাহার পরদিন প্রাতেই এখানে চলিয়া আসিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল ঘটিয়া উঠিল না। আশা করি পুরীতে গিয়া আপনারা সুস্থ হইয়াছেন।

আপনাদের এখানকার বাড়ি অনেকদিন ব্যবহার করেন নাই। ক্রমশই উহা জীর্ণ হইতেছে। যদি বিদ্যালয়কে এই বাড়ি বিক্রয় করেন তবে ইহা আমাদের বিশেষ উপকারে লাগে। এখানে অত্যন্ত স্থানাভাব ঘটিয়াছে। অনুরোধে পড়িয়া বিচলিত হইবেননা— এ ঘর যদি আপনাদের প্রয়োজনে লাগে তবে ত আমরা খুসিই হইব— এখানে আপনাদের থাকা আমাদের পক্ষে লাভ।

আমেরিকার নেশন পত্র একখণ্ড ডাকে পাঠাইতেছি। এনাটোল ফ্রাঁসের একটি বক্তৃতা ইহাতে বাহির হইয়াছে তাহা Modern Reviewতে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য।

গোরার ইংরেজি তর্জ্জমার জন্য আপনি অনুরোধ করিয়া সুরেনকে চিঠি লিখিলে হয়ত ফল হইতে পারে। তার কাজের ভীড় হয়ত কিছু কমিয়াছে।

শান্তা সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি ২৯ কার্ত্তিক ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩

২৫ নভেম্বর ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

···কে আপনাদের এখানকার কুটীরে বাস করিবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। আমার আশঙ্কা হয় পাছে সে মনে করে আমরা ব্যাঘাত ঘটাইতেছি এইজন্য এই ঘরখানি বিদ্যালয়ের তরফ হইতে ক্রয় করিয়া দখল করিবার প্রস্তাব পাকা করিতে পারিতেছি না। ··· মনে কষ্ট পায় বা অসুবিধা ভোগ করে ইহা আমি ইচ্ছা করি না। আপনাকে প্রতিবেশীরূপে পাইবার লোভ মনে প্রবল ছিল বলিয়াই এই কুটীরটাকে কোনমতে আপনার হাতে গছাইয়া দিয়াছিলাম— ভাবিয়াছিলাম আপনাকে intern করা গেল কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিতে পারিলাম না। দীর্ঘকাল আপনার অন্তর্ধানবশত যখন সন্দেহ করিতেছিলাম যে আপনি হয়ত এখানকার মায়া কাটাইলেন তখন আপনার এই ঘরটাকে, নিকটবর্ত্তী পেয়ারা গাছ সমেত, পুনশ্চ আশ্রমে খাস করিয়া লইবার প্রস্তাব করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে আপনার পুনরাবির্ভাবের কোনো সম্ভাবনা থাকে এই সংশয়ে দ্বিধা করিতেছিলাম। আমরা আপনার স্থলাভিষিক্ত কাহাকেও এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই না— হয় আপনারা, নয় আশ্রম, এই ছিল আমার কামনা। ঠিক এখনি যদি এই কামনা পূর্ণ না হয় তবে অন্তত অদূরবর্ত্তী কোনো এককালে পূর্ণ হইবে এই আশা করি।

ইহার মূল্য কি হইতে পারিবে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।

চিঠি লিখিয়া সুরেনের কাছ হইতে জবাব পাওয়া কঠিন। যদি কোনো মধ্যাহ্নে তাহার আপিসে চারুকে পাঠাইয়া দেন— তবে সুরেনের কাছ হইতে গোরার তর্জ্জমা সম্বন্ধে পাকা কথা সে আদায় করিয়া আনিতে পারিবে। এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাহার মোকাবিলায় আলোচনা হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন না।

Autumn Festival তর্জ্জমার সম্মতি চাহিয়া আমার কাছে বিস্তর পত্র আসিতেছে। সম্ভবত আপনার কাছেও আসিয়াছে বা আসিবে— আপনি সম্মতি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৪

২৯ নভেম্বর. ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সাংলি হইতে সেখানকার রানীর ভগিনী ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত পটবর্দ্ধন জানুয়ারির প্রারম্ভে আশ্রমে আসিবেন। পটবর্দ্ধন কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট তিনি আশ্রমের কাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহাদিগকে বাসের স্থান দিতে হইবে।

এখানে নূতন ঘর নির্ম্মাণ করিতে সাত আটমাস লাগে, বারম্বার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সেইজন্য আপনার পরিত্যক্ত কুটীরটিকে শীঘ্রই তাঁহাদের বাসোপযোগী করিয়া মেরামত করিতে হইবে।

আপনার কুটীরের মূল্য সম্বন্ধে এখানকার অধ্যক্ষদের মত যাচাই করিলাম। তাঁহারা তিন শো টাকা দাম ধরিতেছেন। আপনার কি এই মূল্যে সম্মতি আছে? আপনি যাহা সঙ্গত বোধ করেন বলিয়া পাঠাইবেন। এবং যদি বিক্রয় স্থিরই করেন তবে আপনার আসবাবপত্র সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন। ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই মেরামত সারিতে পারিলে সে সময়ে আপনার এই ঘর কাজে লাগাইতে পারিব। আজকাল এখানে স্থানের এত অভাব যে আমরা আশু প্রয়োজনের জন্য তাঁবু কিনিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুকাল হইল কানপুর এল্‌গিন মিলে পত্র লিখিয়াও ক্যাটালগ পাই নাই। শীঘ্র যে কোথায় তাঁবু পাওয়া যাইতে পারে তাহার খবরই পাইলাম না। এইজন্য উদ্বিগ্ন আছি। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪ ডিসেম্বর ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এবার কন্‌গ্রেসে যে প্রার্থনা মন্ত্র তিনটি পাঠাইয়াছি মডার্ন্ রিভিয়ুর জন্য পাঠাইলাম। এবার ছাপিবার সময় ও স্থান আছে কিনা জানি না। কাল ৭ই পৌষ উৎসব সমাধা হইয়া গেল— আপনাদিগকে স্মরণ করিয়াছি। আজও অতিথি অনেক আছেন— উৎসবের পরিশিষ্ট চলিতেছে। শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি ৮ই পৌষ ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ জানুয়ারি [১৯২০]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এণ্ড্রুজের পত্রটি আপনাকে দেখতে পাঠাচ্চি। এর কোন্ অংশ আপনার কাগজে বাহির করা যায় সে আপনি বিচার করে গ্রহণ করতে পারবেন। পত্রখানিতে অনেক কথা ভাববার আছে কিন্তু এতে ভারতবাসীকে যে আহ্বান আছে সেটা প্রকাশ হলে হয়ত কর্ত্তৃপক্ষকে অনর্থক সতর্ক করা হবে এবং ভারতবাসীর পক্ষে সেটা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এবারকার কন্‌গ্রেসে আমাদের খুব একটা বড় সুর দেবার অবকাশ ছিল। গান্ধী এবং শ্রদ্ধানন্দ সেই সুর লাগিয়েছিলেন কিন্তু মোটের উপর আমার মনে হয় dignity এবং সংযমের অভাব ঘটেচে। পঞ্জাবের উৎপাত সম্বন্ধে আমাদের এত বেশি বাচালতা করা অনাবশ্যক ছিল— উচিত ছিল এ সম্বন্ধে আমাদের অতিমাত্র উত্তেজনার দ্বারা কমিশনের বিচারকে বিচলিত না করা। আমাদের কথা পৃথিবীর কাছে যাবে না। আজ পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে পৃথিবীর কাছেই বিচার চলচে। আমরা যা পেয়েচি সে ত সয়েচি— তাতে আমাদের উপকারও হয়েচে— কিন্তু দোষীর দণ্ডের ভার সমস্ত জগতের উপর। যদি কমিশন দুর্ব্বলভাবে সত্য গোপন করতে চায়, তখনই আমাদের যা কর্ত্তব্য তা করা উচিত হবে। ঝগড়াটে সুর কিম্বা জিতের বড়াই ছেলেমানুষি— এত বড় উপলক্ষ্যের অনুপযুক্ত। লাট সাহেবকে তাড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে আমরা যে সব আবদার করেছি সে যেন আদুরে ছেলের বাপের কাছে আবদার করার মত— আমাদের কি সেই সম্বন্ধ? সত্য প্রকাশ হোক্ সেইটেই সব চেয়ে বড় দণ্ড, moral দণ্ড, তার চেয়ে ছোট দণ্ড আমরা মাপ করতে পারি— সত্যই নিজের দণ্ড নিজে গ্রহণ করুন— আমরা চঞ্চলতা করে এই বিচার প্রণালীর গাম্ভীর্য্য নষ্ট করলে দুঃখের কথা। ইতি ২৮ পৌষ

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

[ফেব্রুয়ারি ১৯২০]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের এখানে অবিচ্ছেদে অতিথি সমাগম চলিতেছে আজ ভাবিয়াছিলাম ছুটি পাইব— পাই নাই। আশা করি কাল আপনার পত্রের জবাব দিতে পারিব এবং মুলুর সম্বন্ধে একটা লেখা সম্ভবত পাঠাইব।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুলুর সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা ও কালীমোহনের লেখাটি পুস্তিকায় গ্রহণ করিবেন। এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহার পত্র ছাপিতে সম্মতি দিবেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমি এই সঙ্গে একটি লেখা পাঠাইতেছি ইহা আপনার পুস্তিকায় প্রকাশ করিতে পারেন। ছেলেরা বোধ হয় কেহ কেহ মুলুর সম্বন্ধে লিখিতে প্রস্তুত হইতেছে।

মুলুর ফোটোগ্রাফ পাইলে তাহার ছবি আঁকানো সম্ভবপর হইবে কিনা বুঝিতে পারিব। ইতি ২৬ মাঘ ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯

১ মার্চ ১৯২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুলুর ছবি প্রভৃতি সম্বন্ধে আপনি যে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছেন তাহার কোনো হেতু নাই। যে সব ছেলের আঁকিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের হাতে মুলুর ফোটোগ্রাফগুলি দিয়াছি তাহারা এই ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় উৎসাহ বোধ করিতেছে। আমার বিশ্বাস অন্তত একটি ভালো ছবি ইহাদের হাত হইতে বাহির হইবে। এজন্য ইহারা কিছু সময় চায়। লেখা সম্বন্ধে ছেলেদের স্বাভাবিক জড়তা আছে। সেই জন্যে এপর্য্যন্ত তাহাদের কাছ হইতে মুলু সম্বন্ধে কোনো লেখা পাই নাই। মুলু সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোনো প্রস্তাব করিতে আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না, কেননা, তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনেও বেদনা আছে। ইতি ২১শে ফাল্গুন ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২.৬

৭০

৯ মার্চ ১৯২০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

Young Indiaতে আমার সমস্ত পুস্তিকাটি খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। বিশ্বভারতীর অর্থসম্বল কিছুই নাই; লোকের কাছ হইতে সাহায্য প্রত্যাশা করি না, সেইজন্য আমার বই বিক্রয়ের টাকার উপরেই আমার একমাত্র নির্ভর। তাহার ক্ষতি করা আমার বিদ্যালয়েরই ক্ষতি করা।

"কর্ণকুন্তীসংবাদে"র ইংরেজি Modern Reviewর জন্য পাঠাইলাম। সুরেন বোধ করি "গোরা" তর্জ্জমা করিতে সাহস করিতেছে না। কেম্ব্রিজ হইতে এণ্ডাসনের পত্র পাইয়াছি তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন আমার গল্পের মধ্যে গোরা তর্জ্জমা করিতে তাঁহার সখ, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন বলিয়া দ্বিধা করিতেছেন। আমারও বোধ হয় কোনও নিছক ইংরেজের পক্ষে গোরা তর্জ্জমা করা সহজ নহে। এণ্ড্রুজ আসিলে তাহার সঙ্গে একত্রে মিলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। ইংরেজি ভাষায় আমার কলম যদি সহজে চলিত তবে Modern Reviewর জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম, কিন্তু নূতন অভ্যাসের আর সময় নাই। ইংরেজিই কি আর বাংলাই কি লিখিতে বসিতে কিছুতে মন যায় না। ইতি ২৬ ফাল্গুন ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

মহেশবাবু সম্বন্ধে আপনি যে কথা লিখেছেন আমার মনে লেগেচে। তিনি ঠিক বিশ্বভারতীর যোগ্য অধ্যাপক। শাস্ত্রী-মশায়কে আমি তাঁর কথা বলব এবং তাঁকে আমাদের এখানে পাবার জন্য চেষ্টা করব।

রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভার সভাপতিত্বে যাব কিনা মনে সংশয় আসচে। কলকাতা আমার পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটের স্থান— আমি শান্তি ও বিশ্রামের জন্য অত্যন্ত উৎসুক আছি। আর আমি নানা মিথ্যাতর্কের জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করিনে। এতে আমার শরীরও ক্লান্ত হয়ে পড়চে, নিজের কাজের ক্ষতি হচ্চে। মন উদ্‌ভ্রান্ত থাকাতে ভাল করে লিখতেও পারচিনে। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয়ে উঠ্‌বেনা। মোটের উপর, কলকাতার আবর্ত্ত আমার পক্ষে আয়ুক্ষয়কর। কিছু না কিছু মিথ্যার আঁধি সেখানে সৃষ্টি হবেই। তাই আমি সেখানে কিছুকাল যাবনা স্থির করেচি। ইতিমধ্যে লেখা শেষ হলে প্রবাসীতে পাঠাব। ইতি ১ আশ্বিন ১৩২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

শ্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

মহেশবাবুর কথা আপনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ইহাতে শাস্ত্রীমহাশয় রথী এবং অন্যান্য সকলেই উৎসাহিত হইয়াছেন। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। তিনি এখানে আসিতে সম্মত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এইজন্য রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে কলম সরিতেছে না। ইতি ২রা আশ্বিন ১৩২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

নভেম্বর ?, ১৯২২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

উত্তর দিতে দেরি হইল, তার কারণ অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে আছি, একটুও সময় পাই না। আপনি জানেন ইংরেজি প্রবন্ধ অত্যন্ত দায়ে না পড়িলে লিখি না, কারণ অভ্যাস নাই, ভরসা নাই, এ ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে ক্ষিপ্রতা নাই— তার উপরে

আমি স্বভাবত অত্যন্ত অলস— তার উপরে আমার ঘাড়েই রাজ্যের কাজের দায় চাপিয়াছে। তবু আপনার অনুরোধ ঠেলিতে পারি না— তাই আমার অনবকাশের ছোট ছোট ফাঁকের ভিতর দিয়া খানিকটা পুরাতন খানিকটা নূতন লেখা রিফু করিয়া তালি দিয়া একটা কাঁথা গোছের প্রবন্ধ আপনাকে পাঠাইলাম। আপনিও ইহার মধ্যে কিছু সূচিকর্ম্ম করিয়া এটাকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিবেন। নামকরণের ভার আপনারই উপর। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে তিন শত্রু। তিনখানা কাগজের বোঝা মাথায় লইলেন এ সংবাদে আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন লোকবাক্যকে আমি বিশ্বাস করি না— অনেক সময়ে কেবলমাত্র তিপ্পান্নতেই নৌকাডুবি ঘটে। শাকের আঁটিতে ভার নাও বাড়িতে পারে, কিন্তু ভারসামঞ্জস্য সম্পূর্ণ নষ্ট করিবার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। শেষ বয়সে বিশ্বভারতী কাঁধে তুলিয়া ভারলাঘবতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দিতে বসিলাম— ইহাতে আপনি কৌতুক বোধ করিবেন— শান্তা সীতাকেও এই কৌতুকের ভাগ দিবেন। ইতি তারিখ জানি না অগ্রহায়ণ ১৩২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ জানুয়ারি ১৯২৩

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"মুক্তধারা"র বইগুলি আপনি বিশ্বভারতীকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দ পাইলাম। আমাদের সকলের কৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ৭ মাঘ ১৩২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫

৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজার সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভাল হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথাসময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব।

Irelandএর মনীষী Æ (George Russel) Freeman সাপ্তাহিকে Lessons of Revolution নামক যে প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন তাহাতে আমাদের ভাবিবার কথা অনেক

আছে, সেই জন্য কাগজখানি আপনাকে পাঠাইলাম। ইতি
১৯ ভাদ্র ১৩৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬
২ মে ১৯২৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সঙ্গে এক যাত্রায় য়ুরোপে যাবার সম্ভাবনা আছে শুনে আনন্দিত হলুম। অপেক্ষা করে আছি কবে জাহাজের খবর পাব। আজও পাই নি। টুচি বলেন ইটালীয়ানরা আমাদেরই মতো— সময় মতো খবর দেওয়া বা কোনো কাজ করা ওদের ধাতে নেই। আশা তো আর দুই এক দিনের মধ্যে জানতে পাবো— এবং সম্ভবত ১৫ই মে মাসেই রওনা হতে পারব। ২৫শে বৈশাখের উপলক্ষ্যে একটা নাট্য অভিনয়ের উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে আছি।

কলকাতা এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। তিন চার দিন আগে বোলপুরে বহুসংখ্যক মুসলমান গুণ্ডার আমদানী হয়েছিল— সময় মতো সশস্ত্র পুলিসের সমাগমে তারা তামাসা বন্ধ করেই আবার কলকাতায় ফিরেছে। ইতি ১৯শে বৈশাখ ১৩৩৩

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

১০ মে ১৯২৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাকে ভুল বুঝবেন না, বুঝলে অন্যায় হবে। কারণ প্রবাসীর প্রতি মমত্ব ও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আমি অনেক কঠিন বাধার সঙ্গে লড়াই করে এসেচি। আপনাদের যে সব লেখা দিই অর্থ অর্জ্জন তার উদ্দেশ্য নয়— বস্তুত অর্থের দাবী করতে আমার একান্ত সঙ্কোচ বোধ হয় তার কারণ আমি সহজ প্রীতিবশতই আপনাকে বরাবর লেখা দিয়ে এসেচি— সে জন্যে অত্যন্ত নিকট আত্মীয়দেরও মনে প্রবল বেদনা দিতে হয়েচে। বিশ্বভারতীতে চির দুর্ভিক্ষ, তা ছাড়া আজকাল আমার সব লেখাই গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের হাতে পড়ে··· এই বিভাগের প্রয়োজন ও প্রণালী দুইই আমার অগোচর। এইটুকু জানি, এক এক সময়ে টাকার আশু প্রয়োজন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে— অল্পকাল আগে সেই রকম দিন এসেছিল। আমার হাতে নগদ টাকা বলে কোনো বালাই নেই, আমার ভিক্ষার ঝুলিতেও শনির দৃষ্টি। এই জন্যেই যে মুহূর্ত্তে যে কেউ টাকা হাতে ধন্না দিয়ে বসে অবিলম্বে তার হাতে লেখা গিয়ে পড়ে। কিন্তু কার্য্যবিধি আমার নয়। শরীর ক্লান্ত থাকাতে আমার সঙ্গে আর্থিক আলোচনা কেউ করে না। কিন্তু আমার লেখা তো আমারই— তার বিরুদ্ধে আপনার সম্পাদকীয় দ্বার বন্ধ হবে এমন কোনো অপরাধ আমি করি নি। আপনার কাজের সঙ্গে আমার লেখার সম্বন্ধ আছে সেজন্যে অন্য যে-

কোনো জায়গা থেকেই আমি শাস্তি পাই সেটাকে আমি অন্যায় বল্‌তে পারি নে কিন্তু আপনি যদি শাস্তি দেন তবে সেটাকে কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত বলা চল্‌বে না। আমার লেখা কোনো কোনো অবস্থার দুর্ব্বিপাকে পণ্য দ্রব্য হয়ে ওঠে— কিন্তু যখনি সে কথা ভোলবার সুযোগ পাই আমি তো নির্ব্বিচারে স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাকেই পাঠিয়ে দিই— এটুকুর জন্যেও ত আপনার কাছে বিচার দাবী করতে পারি— দোকানদারও নিজের দোকানের জিনিষ আত্মীয়কে উপহার দিতে পারে। যখন আপনার কাছ থেকে টাকাও পেয়েছি তখনো সে টাকাকে আমি মূল্য বলে মনে করি নি। পর্শু চলে যাব— কথাটা খণ্ডন করবার সময় পাব না— লেখাও হয় ত অনেকদিন বন্ধ থাক্‌বে— কিন্তু আমার এই অবসাদের সময় আপনারা আমার প্রতি মনকে প্রতিকূল করবেন না। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩৩।

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭৮

১২ মে ১৯২৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চিঠিখানি পেয়ে আরাম পেলুম।

"বৈকালী" লোকহস্তে পাঠাচ্ছি। কালিদাসের চিঠিতে এর বিবরণ পাবেন। যেমন ইচ্ছা ছাপাবেন। পরে এগুলি বই আকারে বের করব।

অত্যন্ত শ্রান্ত আছি। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩

আপনাব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯

২৫-২৬ অক্টোবর ১৯২৬

ওঁ

ভিয়েনা

২৫ অক্টোবর

১৯২৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মডারন্ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে আমার সম্বন্ধে যে মন্তব্য বেরিয়েচে, আপনার চিঠিতে সেটাকে আপনি ভুল বলে জানিয়েচেন। আমি তাকে ভুলের চেয়ে কেন বেশি মনে করি সে কথা গোপন করা উচিত নয়।
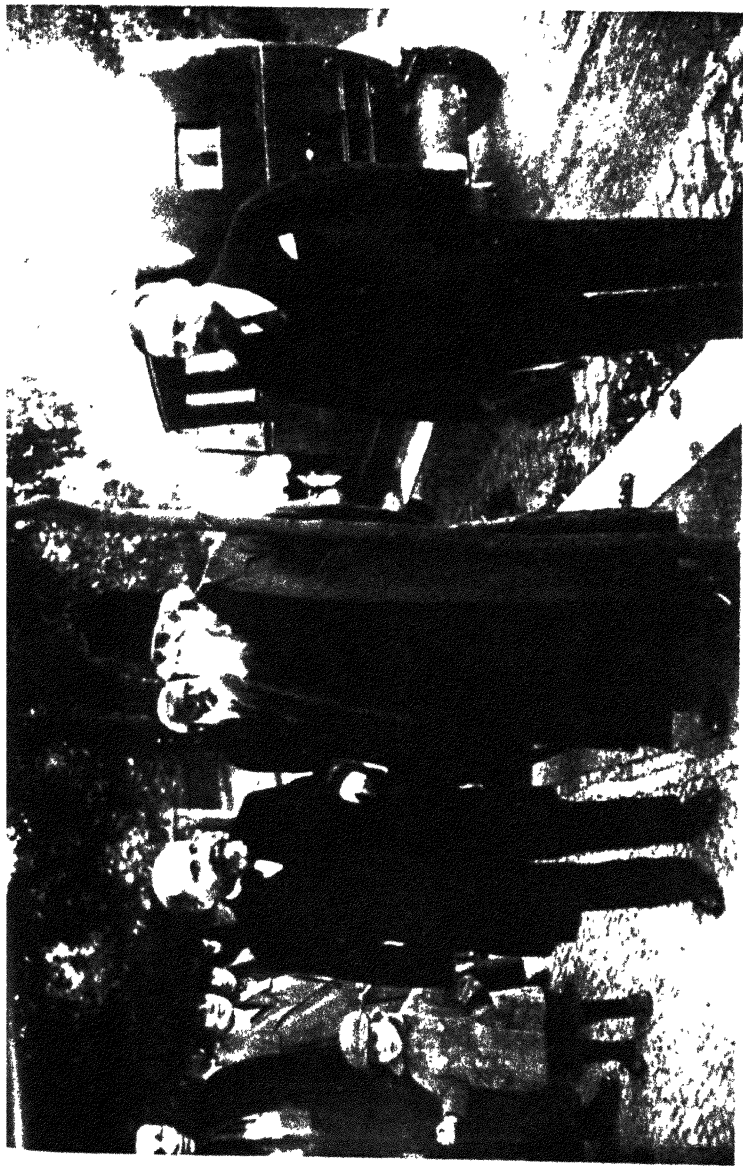
চিত্রে বাঁ দিক থেকে ভি. লেসনি, রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ (পশ্চাতে), এম. উইন্টারনিৎস

সরলা যখন আপনার সম্পাদকের কার্য্যকে ব্যবসাদারী বলেছিল তখন সেটাকে আপনার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাবশত ভুল বলে মনে করতে পারতুম। কিন্তু লেখার মধ্যে অসম্মানকর শ্লেষ ছিল বলেই আমি তা ভাবতে পারি নি এবং সেটাকে অপরাধ বলে গণ্য করেই আত্মীয়মণ্ডলীকে বেদনা দিয়ে প্রকাশ্যে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি— বিশেষ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করে তার ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করি নি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি বিচারক নই, আমি ফরিয়াদী কিন্তু সে জন্যে ত বিচারের আদর্শ স্বতন্ত্র হতে পারে না।

প্রথমতঃ বুঝতে হবে, আপনার কাগজে আমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধতা স্বতই অতিপরিমাণ লাভ ক'রে লোকের চোখে উগ্র হয়ে লাগে— নায়ক-এর মতো কাগজে এর গুরুত্ব অনেক কম হয়। এই লেখায় সাধারণ লোকে যে চমৎকৃত হয়েচে দেশের কোনো কোনো চিঠি থেকে তার পরিচয় পেয়েছি। দ্বিতীয়ত আমার সম্বন্ধে এ রকম তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাসূচক উক্তি দেশী বিদেশী শত্রু মিত্র কারো কাছ থেকে অনেকদিন পাই নি। যাদের সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমার মতান্তর আছে আমার মত ও আচরণকে আক্রমণ করবার ন্যায্য অধিকার তাদেরই। কিন্তু আপনার কাগজে এটা মতঘটিত প্রতিবাদ বা আক্রমণ নয় ব্যক্তিগত অবমাননা।

দেশের পলিটিক্স্, সমাজ বা সাহিত্যিকরুচি অথবা সমব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা নিয়ে লোকের মন যখন অত্যন্ত উত্তেজিত হয় তখন বাদপ্রতিবাদের মধ্যে ব্যক্তিগত কটূকাটব্য

আপনি এসে পড়ে। তখন পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আত্ম-বিস্মৃতি অন্যায় হলেও নিরতিশয় অসঙ্গত মনে হয় না। তৎ-সত্ত্বেও নন-কো-অপারেশনের ঘোর আন্দোলনের মুখেও আমার বিরুদ্ধবাদী কোনো পত্রে এমন ভাবে আমার প্রতি গ্লানিপূর্ণ শ্লেষ প্রয়োগ সম্প্রতি কোথাও ঘটেচে বলে জানি নে।

মডার্‌ন্‌ রিভিয়্যু ও প্রবাসীতে যে প্রসঙ্গে সমালোচনা বেরিয়েচে সে হচ্চে ফ্যাসিস্ট্‌ দলের প্রতি আমার আতিথ্যবিরুদ্ধ ব্যবহার। সে সম্বন্ধে আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাতে আমার বন্ধুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হতেও পারেন কিন্তু তাঁদের বক্রোক্তি অত্যন্ত বেশি গরম হয়ে ওঠবার মতো বিষয় এটা নয়। আমার পত্র প্রকাশের পর ইটালীর বাহিরে ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের নানা স্থানের কাগজ থেকেই কাটা টুক্‌রো পেয়েছি কোথাও কেউ আমাকে এমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বক্রোক্তি করেন নি— আমার কৈফিয়ৎটাকে সাধারণত শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেচেন। এমন কি ফর্মিকিও নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হলেও দুঃখ প্রকাশ করেচেন আমাকে অসম্মান করেন নি।

লেখাটাকে ভুল বল্‌চেন। কিসের ভুল? ঘটনার ভুল? এ সম্বন্ধে যেটুকু ঘটনা প্রাসঙ্গিক সে আমার চিঠিতেই আছে। কিন্তু লেখক ব্যঙ্গ করে বলেচেন চিঠি আমার কি না তার সন্দেহ রয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর মতে চিঠি আমার এতই অযোগ্য যে ওটাকে জাল বলে মনে করলেই আমার লজ্জা রক্ষা হয়। বোধ করি ইটালীর কোনো ফ্যাসিস্ট কাগজেও এমন ছদ্মসন্দেহের কুটিল অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয় নি।

নিকটের ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক সময়ে ক্ষিপ্রহস্তে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি চালনার আশু প্রয়োজন ঘটে— সে অবস্থায় মানুষের ক্ষোভের মাত্রাও বেশি হয়। সে অবস্থায় মান্য ব্যক্তিকে বা বন্ধুকেও বিনা বিচারে বা স্বল্প প্রমাণে কঠিন কথা বলা সম্ভবপর হয়। সেই কারণে যদুনাথ সরকার মশায়ের পত্র নিয়ে আপনার ইংরেজি বা বাংলা বা উভয় কাগজেই যদি অপ্রিয় আলোচনাও হত তাহলে সেটা আক্ষেপের বিষয় হলেও বিস্ময়ের বিষয় হ'ত না। কিন্তু দূরের ব্যাপার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অসংযত উত্তেজনা স্বাভাবিক নয় বলেই অন্তত মান্য বা বন্ধুব্যক্তির প্রতি আমরা ধৈর্য্য প্রত্যাশা করি। তার ব্যতিক্রম ঘটলে সেটা অশোভন হয়।

··· র সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয় নি ; তার সঙ্গে সম্বন্ধ আপনার সম্বন্ধ অনুসরণ ক'রেই। কিন্তু ··· আত্মীয়ের মত নিকটে এসেছিল। ··· আমার কাছ থেকে অজস্র স্নেহ পেয়েছে। মডারন রিভিয়ুতে ও তার পনেরো দিন পরে প্রবাসীতে সর্ব্বজনগোচর যে অবমাননা আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হয়েছে তারা যে তা স্বীকার করে নিতে পারলে এটাই সব চেয়ে আমাকে বেদনা দিয়েছে। অবশ্য কর্ত্তব্যের দাবী আত্মীয়তার দাবীর চেয়ে বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই দাবী কি এত অত্যন্ত বেশি ছিল যে, ভাষায় অপরাধীর প্রতি সামান্য সৌজন্যেরও সংযম রক্ষা করা অসাধ্য হয়েছিল।

আপনি Forwardএর প্যারাগ্রাফের উল্লেখ করেছেন। সুধীন্দ্র বসুর প্রেরিত সংবাদমালার পরে সে প্যারাগ্রাফ গ্রথিত।

তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে সংবাদ অবিশ্বাস করবার কোনো হেতু ছিল না। তবু যখনি সংবাদ অসম্পূর্ণ বলে জেনেছেন তখনি অসঙ্কোচে দোষ স্বীকার করেছেন। আপনার দুই কাগজে যে আলোচনা বেরিয়েচে সে আমার নিজের লেখা পত্র অবলম্বন করে— উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর।

জীবনে আত্মীয়তার বিকার বন্ধুত্বের বিপর্য্যয় বিনাকারণেই বারবার ঘটেচে— চুপ করেই সহ্য করেছি। এবারেও প্রতিবাদ করব না, এমন কি, বৃদ্ধ দার্শনিক কবির সাঙ্গোপাঙ্গেরাও না করেন এই আমার ইচ্ছা। তবে কি না যেটা যা সেটাকে তাই বলেই গণ্য করার প্রয়োজন আছে— ইচ্ছাকৃত অত্যাচারকে অজ্ঞানকৃত ভুল বলে চাপা দিতে গেলেই যথার্থ ভুলের সম্ভাবনা ঘটে— সেইজন্যেই আপনার চিঠির উত্তরে এই চিঠি লিখ্‌লুম— নইলে কোনো কথাই বল্‌তেম না।

এই বিদেশে আমার পত্রে আপনি কিছুমাত্র ক্ষোভ অনুভব করেন এ আমি ইচ্ছা করি নে। সেই জন্যে দেশের ঠিকানায় পাঠালেম, ফিরে গিয়ে পাবেন— ততদিনে এই বিতর্কের অনেক উত্তাপ আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। ইতি ২৬ অক্টোবর ১৯২৬

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০

২৩ ডিসেম্বর ১৯২৬

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবিবেচনা ও ত্রুটি সম্বন্ধে আপনি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা লইয়া যদি বিবাদ বিতর্ক করি তাহাতে নিজের বেদনার উপরে অশান্তি চাপানো হইবে। জীবনে সহস্র অপরাধ করিয়াছি,— আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি যে দোষবহুল মানুষ এ আমার ছদ্ম বিনয়বাক্য নহে। অতএব আপনার প্রতি ব্যবহারে কখনো জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অন্যায় অবিচার করি নাই এমন স্পর্দ্ধা মনে রাখি না। আমি অত্যন্তই অসতর্ক— বিবেচনাব ত্রুটিতে দুঃখ পাই ও দুঃখ দিয়া থাকি। অতএব আপনার অভিযোগের প্রতিবাদে পীড়াজনক বাগ্‌বিতণ্ডাকে পুঞ্জীভূত করিয়া না তুলিলেই আমার পক্ষে গ্লানির কারণ অল্প ঘটিবে।

কেবল একটিমাত্র কথা বলা উচিত মনে করি। এণ্ড্রুজ কেন যে আমার পত্র পাওয়ামাত্র প্রকাশ করেন নাই সে সম্বন্ধে তিন চারটি পত্রে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে— বরঞ্চ তিনি এই পত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমার সেই পত্র যে আমার যোগ্য হইয়াছিল এ কথা তাহার প্রমাণ নহে— আমার বলিবার বিষয় কেবল এই যে, এই বিশেষ

ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার ধারণা ভুল হইয়াছিল। ইতি ৮ই পৌষ ১৩৩৩

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

৪ জানুয়ারি ১৯২৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সীতার কন্যাটির মৃত্যু হয়েছে শুনে মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করচি। তার যে রকম বেদনাপ্রবণ মন, সে খুব কষ্ট পাচ্চে সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এ রকম শোকের সান্ত্বনা দিতে পারে এমন শক্তি কার আছে। এসময়ে সে আপনাদের কাছ থেকে দূরে আছে এও দুঃখের কথা।

আপনি কবে আসতে পারেন লিখবেন। আপনার সেই কুটীর প্রস্তুত আছে। ইতি ৪ জানুয়ারি ১৯২৭

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

৫ জানুয়ারি ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্ভবত আগামী কাল বৃহস্পতিবারে মধ্যাহ্নের গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করব — দুই তিন দিনের জন্যে সেখানে থাকবার কথা। ইতিমধ্যে আপনি যদি আশ্রমের অভিমুখে না আসেন তাহলে সেখানেই দেখা হবে। ইতি বুধবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ জানুয়ারি ১৯২৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার যে কখানি চিঠি ছাপা হয়েচে তাতে এমন কিছুই নেই যা অছাপ্য। যাতে কাউকে আঘাত করতে পারে এমন জিনিষ বর্জ্জন করলেই আর কিছুতে ক্ষতি হবে না। ব্যক্তিগত আলোচনা চিঠি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে চিঠিত্ব চলে যায়— সেই সহজ ভাবটি রাখবার জন্যে অন্য হিসাবে অনাবশ্যক হলেও কিছু কিছু ঘরের কথার আমেজ থাকা ভালো।

আমি রবিবার প্রাতে অত্যন্ত পীড়িত ক্লান্ত হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে

পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলুম— শ্বাস বড় বেশি বাকি ছিল না। আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপের সুযোগ হল না। স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি কলকাতায় বাস আমার পক্ষে পথ্য নয়। এই শীতের সময় এখানে বিদেশী অতিথির আমদানী প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণেই হচ্চে কিন্তু তাদের অভ্যর্থনা কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলে সেটা স্বীকার করে নিতে হবে। কলকাতায় ভূরি পরিমাণ অকৃত্যের চাপে একেবারে তলিয়ে যেতে হয়,— এ বয়সে সেটা সয় না।

নটীর পূজার অভিনয় কলকাতায় হবে সম্প্রতি তারই আয়োজনের ভার নিতে হয়েচে। কাজটা সহজ নয়— অবকাশ একেবারে সম্পূর্ণ গিলে খাচ্চে। শাস্ত্রার কন্যার সঙ্গে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি এখনো হল না— কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়েছে— দেখা হলে হয়ত পাকা হবে। ইতি
১ মাঘ ১৩৩৩

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

২৮ মে ১৯২৭

ওঁ

Uplands
Shillong

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি বোধহয় জানেন বালী দ্বীপে হিন্দুসভ্যতা আলোচনার জন্য কোনো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে সেখানে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে আমি যুগলকিশোর বিরলা মহাশয়ের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেম। এখনো পাই নি, পাব কিনা জানি নে। জাভা গভর্মেণ্টের কাছে আমি অর্থসাহায্য প্রার্থনাও করি নি। বিরলা যদি সাহায্য না করেন তবে আমি যেমন করে পারি নিজের ব্যয়েই যাব— সেখান থেকে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং এ সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নেই। আমি নিজে বোধ করি অতি অল্প দিনই থাকব এবং যদি সাধ্যে কুলোয় তবে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য রেখে দিয়ে আসব। কাজটাকে আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি এবং এও জানি আমার দ্বারা কাজটা সহজসাধ্য হতেও পারে। জাভা গবর্মেণ্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি। সেখান থেকে যাঁদের উৎসাহ পেয়েচি তাঁরা পুরাতত্ত্ববিৎ— আমাদের দেশের পণ্ডিতের সহযোগিতা পেলে তাঁদের সন্ধান-কার্য্যের সুবিধা হতে পারবে।

এখানে এসে প্রথমটা জ্বরে পড়ে কিছু দিন অসুখে কেটেচে। আমি যদি বা উঠেচি পুপের জলবসন্ত হল, অল্প অল্প করে সে সেরে উঠ্‌চে— এবারকার হাওয়া বদলটা, যাকে বলে successful, তা নয়। হাওয়াটা ঠাণ্ডা একথা স্বীকার করতে হবে— নিম্নভূমিতে জ্যৈষ্ঠ মাস বলতে যে কি বোঝায় তা ভুলে যাই বলেই কেবলমাত্র ঠাণ্ডার জন্যে মনে কৃতজ্ঞতা জন্মায় না। যা সহজে পাই তার চেয়ে বেশি পাবার ইচ্ছে মন থেকে ঘোচে না। শিলঙ শিলঙই থাকবে অথচ দার্জ্জিলিংও হবে এইটেই মনের কামনা। ইতি ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

৫ জুন ১৯২৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সেই ছাটা কাগজগুলি আমার টেবিলের উপর ছিল এই পর্য্যন্তই জানি— তার চেয়ে হাল আমলে কোথায় তাদের গতি হয়েচে আমি তার কিছুই ঠিকানা জানি নে। তাদের আর উদ্ধার হবে বলে বিশ্বাস করি নে— এই শৈলমালার ধুলির ভিতর দিয়ে একদা এখানকার পুষ্পপল্লবের মধ্যে তাদের নবজন্ম লাভ হবে।

পুপে সেরে উঠেচে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও ঘন বৃষ্টিধারায় অবগুণ্ঠিত। ইতি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

১৮ জুন ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার সঙ্গে Thompsonএর কথাবার্ত্তা যা কিছু হয়েচে কোনো ছাপাব বহিতে তার গতি হবে এমন আশঙ্কা মনেও উদয় হয় নি। সেগুলো যে আমাকে দেখিয়ে নেবে এমন মানুষই ও নয়। Early British Officerরা তাদের ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীমাত্রকে ঠাকুর বলত এ খবর আমার জানা নেই। Castle of Indolence এবং Faery Queen আমি পড়ি নি— Princessএর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই— আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে।

The Ring & the Book একটা মাম্‌লার ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্যের সমষ্টি। ঘরে বাইরেতে প্রত্যেকে মুখ্যতঃ নিজের সম্বন্ধেই নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করেছে— অন্যেরা গৌণ।

বিমলার struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের— সন্দীপ নিজের মধ্যে নিজেরই হারজিৎ বিচার করচে— নিখিলেশও নিজের feelingএর সঙ্গে নিজের কর্ত্তব্যের adjustment করচে। অন্য কোনো মানুষ বা ঘটনা সম্বন্ধে এরা সাক্ষ্য দিচ্চে না। এদের আত্মানুভূতি নিজের record নিজে রাখচে।

টমসন লিখেচেন আমি কাকে বলেচি যে আমি বাইবল্ পড়ি নি। আমাকে প্রশ্ন করলে সহজেই জানতে পারতেন আমি New Testament পড়েচি— একান্ত বিতৃষ্ণাবশত Old Testament পড়ি নি। আমি Shakespeare ভালোবাসি কি না এ প্রশ্ন করবারও যথেষ্ট অবকাশ তাঁর ছিল। আমার বয়স যখন ৯ আমি ম্যাকবেথ তর্জ্জমা করেছি। ৩ আষাঢ় ১৩৩৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ জুলাই ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি অমিয়কে যদি জিজ্ঞাসা করতেন জানতে পারতেন এবার আপনার সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগেই আমি তাকে বারবার বলেছি যে প্রবাসীর সঙ্গে অন্য কোনো কাগজের

প্রতিযোগিতায় আমি যোগ দিয়েচি এই অন্যায় জনশ্রুতিকে দূর করবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম বলেই কিছুই করতে পারি নি সত্য, কিন্তু শীঘ্রই আমার এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করব বলে প্রস্তুত হতে যাচ্ছিলুম। সেটা যখন অসম্ভব হল তখন বুঝতে পারচি বন্ধুত্ব সম্পর্ক নিয়ে চিরদিন আমার যেরকম আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেচে এবারেও তাই ঘট্‌ল। অর্থাৎ কোনো অপরাধ না করেও আমাকে দুঃখ পেতে হবে।

বারবার দেখেচি যখন পরস্পর বোঝাপড়ার একটা কোনো ব্যাঘাত ঘটে তখন বাইরে থেকে অত্যুক্তি ও মিথ্যা উক্তি কোথা থেকে ঝাকে ঝাঁকে এসে পড়ে। যখন চিত্তরঞ্জন ও দ্বিজেন্দ্রলাল আমার অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন তখন আমার জবানী এমন সকল কথা আমাদের দুই পক্ষের সুপরিচিত লোকে তাঁদের কাছে রটিয়েছিল যার কোনই মূল ছিল না। মিথ্যা জনশ্রুতি আপনাদের কানে যে পৌঁচচ্ছে না তা বল্‌তে পারি নে। এইরকম সময়ে ছোট কথা বড়ো হয়ে ওঠে, আকস্মিক ঘটনাকে চেষ্টা-ঘটিত বলে মনে হয়।...

এই সব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে যখন ক্ষোভের কারণ ঘটে তখন একান্ত লজ্জিত হই এবং তাতে আমার গভীরতর ক্ষতির কারণ ঘটে। আপনাদের কারো সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এই রকম খিটিমিটির দ্বারা আহত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা আমার পক্ষে [আর] নেই। আমি কোনো অভিমানকে মনে স্থান দিতে চাই নে। আমার অন্তরের একান্ত প্রার্থনা আমার মন যেন বাধামুক্ত হয়। আমার বয়স আয়ুর শেষ কোঠায় এসে

পৌঁচেছে তবু আজও প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গ্লানির দ্বারা নিজেকে আক্রান্ত দেখ্‌লে খেদের অন্ত থাকে না। জীবনে যে সম্বন্ধগুলি মূল্যবান তার সংখ্যা খুব বেশি নয়— তাদের মূল্য উপলব্ধি করেছিলাম বলেই আজ যখন চিত্ত মুক্তিকামনায় উৎকণ্ঠিত তখনো তাদের দ্বারা অপঘাতে অবসাদের হাত এড়াতে পারি নে। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে শেষ পর্য্যন্ত হতাশ করবেন না— নিষ্কৃতি দেবেন।

আপনি বোধ হচ্চে ···র লিখিত কোনো একটা নিন্দাসূচক পত্রের আভাস আপনার পত্রে দিয়েচেন। এ কথাটা আমাকে কেন লিখ্‌লেন। কর্ত্তব্য তো ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপরেব কথা— আমি বেদনা বা লজ্জা পাব, বা আমার কাজের ক্ষতি হবে বলে আপনি কেন সঙ্কুচিত হবেন? ইতি ১ জুলাই ১৯২৭

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ জুলাই ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল আপনার চিঠির শেষ অংশে যখন বিশ্বভারতীর আর্থিক ব্যবহার ঘটিত নিন্দাসূচক পত্রের উল্লেখ দেখেছিলুম তার ঠিক সঙ্গতি না বুঝতে পেরে আমার ধোঁকা লেগেছিল।

এটা জানা ছিল, যে ··· অনেকদিন থেকেই বিশ্বভারতীর মাথায় বজ্রাঘাত করবে শাসিয়েছিল— অনুমান করেছিলুম আপনার উল্লিখিত চিঠি তারি রচনা।

এমন দিন ছিল, যখন সবুজপত্রে আমার বড়ো বড়ো অনেক রচনা গল্প ও কাব্য বাহির হয়েছিল। তখন এ রকম ভাবের কথা শুনি নি। আজ দৈববিপাকে যখন থেকে লেখা বেচাকেনা করতে বাধ্য হয়েছি তখন থেকে নিজেকে অবমাননা ও বেদনার থেকে রক্ষা করা আমার পক্ষে অসাধ্য হোলো। যে মানুষ হাটে নেমেছে সে বন্ধুত্বের দাবী করতে পারে না। পূর্ব্বে আমার যে সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য ছিল আজ পণ্যশালায় তা বিকিয়ে দিয়েচি। এই বিরুদ্ধতার এই ভুল বোঝাবুঝির আবহাওয়া আমার শান্তির পক্ষে সাধনার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। এর থেকে প্রাণপণে আমাকে দূরে যেতেই হবে। অসমাপ্ত কাজগুলি সমাপ্ত করতে হবে। তার পরে সাহিত্যের কারখানা থেকে ছুটি নেব। অনেক লিখেছি। আর লিখ্‌ব না। কলম বন্ধ করে এবার আমাকে অন্য সাধনার পথে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাতে হবে।

নিশ্চয়ই অবিবেচনাবশত আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করেচি। সকল সময়ে সব দিক চিন্তা করতে পারিনে এ দোষ আমার আছে। সেই জন্যেই সকল দিকেই আমার সংসারের পথ কণ্টকিত। অন্তরের দিক থেকে এই কণ্টক তোলবার চেষ্টা করব।

আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আপনি

যেন না মনে করেন যে, কোনো বাইরের বিভীষিকায় আমি শঙ্কিত। জীবনে সে রকম আঘাত নিরন্তর সহ্য করে করে সয়ে গেছে। এখন যে বিভীষিকাকে ভয় করি সে আমার নিজের অন্তরের দুর্ব্বলতা। ইতি ১ জুলাই ১৯২৭

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রসঙ্গে আর একটি ক্ষোভের কথা বলে সব কথা শেষ করি। কাল আপনি পাত্রাবশিষ্ট লেখার কথা বলেছিলেন। বৃক্ষবন্দনা ও বর্ষশেষ কবিতা দুটি আমার আধুনিক সব লেখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি। দুঃখের বিষয় কবিতার কোনো দাম নেই। ধর্ম্মবোধ লেখাটাও অবহেলা করে লিখি নি। কিন্তু এ কথাটা আজকের চিঠিতে অপ্রাসঙ্গিক।

৮৯
২ জুলাই ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অনেক কথা হৃদয়ে চাপা থাকে, বলবার প্রয়োজন হয় না, দুঃখের দিনে সেগুলো বলবার সময় আসে। আজ সেই রকমের একটা কথা আপনাকে বলি :—

জানিনা, কি কারণে সংসারে আমার বন্ধুত্বের সীমা অত্যন্ত

সঙ্কীর্ণ। আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস, সেই অভাবটা হচ্চে, আমার হৃদ্যতা-প্রকাশের প্রাচুর্য্যের অভাব। শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একলা ছিলুম, লোকসঙ্গ না পাওয়াতে লোকব্যবহারের শক্তি সম্ভবত আমার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্যেই এ জীবনে বন্ধুসমাজে আমার বাস করা ঘটে নি। শিশুকালের মতো আজো বস্তুত আমি একলাই আছি। সেটাতে আমার অনেক ক্ষতিও হয়েচে, তাছাড়া একটা স্বাভাবিক আনন্দের বরাদ্দ আমার ভাগ্যে চিরদিন কম পড়ে গেছে।

যখন বয়স হয়েছে পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি রক্ষা করতে পারি নি। এঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জগদীশ, আপনি, যদুবাবু, ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এই চারজনের নাম [মনে] পড়চে। হঠাৎ এক সময়ে অরবিন্দকে নিয়ে অন্তত বাইরের দিক থেকে জগদীশ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। আমার সে একটা সুদীর্ঘ ও সুগভীর দুঃখের ঘটনা।

তার পরে হঠাৎ এক সময়ে, বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো, যদুবাবুর কাছ থেকে একটা অত্যন্ত অবজ্ঞাপূর্ণ নিষ্ঠুর চিঠি পাই, সে কথাও আপনি জানেন। সেই অবধি তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে আমি সাহস করি নি। তিনিও সম্ভবত আমার কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মরীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই আমার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা পোষণ করেচেন। অথচ তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ গুরুতর বিষয়ে আমার মতবিরোধ ছিল।

আপনারা ছাড়া আমার স্নেহভাজন অল্পবয়সের সুহৃদ কেউ কেউ ছিলেন এবং এখনো আছেন। তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রকে মৃত্যুদ্বারা হারিয়েছি, কাউকে কাউকে হারিয়েছি অকারণে অথবা অজ্ঞাত কারণে।

এখন আয়ুর প্রান্তে এসেচি — নূতন সম্বন্ধ রচনার সময় চলে গেছে।

আপনি হয় ত সব কথা জানবার সুযোগ পান নি কিন্তু আজ আপনাকে বলচি, আপনার জন্যে, অর্থাৎ আপনার প্রবাসী প্রভৃতির জন্যে আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের কাছ থেকে অনেক বার অনেক আঘাত পেয়েছি। সেটা আমি কর্ত্তব্যবোধেই স্বীকার করেচি। প্রবাসীতে অগ্রগামী হয়ে আপনি যে পদ্ধতি প্রথম প্রবর্ত্তন করেছিলেন অন্য সকল কাগজ যখন তারই অনুবর্ত্তন করে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন আমি সেজন্য অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেছি। প্রমথ সবুজপত্রে একেবারে সেদিকে যান নি বলেই আমি আরাম পেয়েছিলুম। সবুজপত্র কোনো হিসাবেই প্রবাসীর প্রতিযোগী ছিল না, নিজের প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই আমার পক্ষে সবুজ-পত্রকে আনুকূল্য করা এত সহজ হয়েছিল। না হলেও সবুজ-পত্রকে পরিত্যাগ করতে পারতুম না কারণ ইন্দিরা আমার

একান্ত স্নেহের পাত্রী এবং প্রমথকে সাহিত্যিক ও মনস্বী বলে বিশেষ শ্রদ্ধা করি।

সেই সবুজপত্রকে দীর্ঘকাল আমি উপবাসী রেখেছি অথচ আমি মনে মনে জানি তাঁরা সহায়তা আশা করেই দ্বিতীয়বার আসরে নেমেছিলেন। তার একটা কারণ, আমার সময় ও শক্তির প্রাচুর্য্য এখন নেই। দ্বিতীয় কারণ বিশ্বভারতীর দাবিদ্রে্য আমি আজ দরিদ্র। আমাকে ভিক্ষা কেউ দেয় না, উপার্জ্জন করতে হয়। সবুজপত্র থেকে বার বার আমার কাছে একটা বড়ো উপন্যাস দাবী করা হয়েছিল কিন্তু সেটা বর্ত্তমান অবস্থায় দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে জেনেই উপন্যাস লেখাই আমি সুদীর্ঘকাল বন্ধ রেখেছিলুম। প্রমথ যদি বিচিত্রার ভার না নিতেন তাহলে আমি উপন্যাস কখনোই লিখ্‌তুম না।

কিন্তু যখনি এই উপন্যাস লিখ্‌তে বসেচি তখনি আমার মনে হয়েচে প্রবাসীর জন্যে একটা উপন্যাস লিখ্‌তেই হবে। অর্থোপার্জ্জনের জন্যে নয়, এতকাল বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েও প্রবাসীর প্রতি (আপনাব প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার খাতিরেই) যে মনোভাব পোষণ করে এসেচি সেইটেকে রক্ষা করবার জন্যে। আমার পক্ষে, এ বয়সে একসঙ্গে কলমের রথে জুড়ি গল্প হাঁকানো প্রায় অসাধ্য বল্‌লেই হয় কিন্তু তাও আমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল।

একদা প্রত্যক্ষত আপনার মধ্যে দিয়েই প্রবাসী ও মডারন্‌ রিভিয়ুর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক সম্বন্ধ ছিল।

তাতে আমি খুবই তৃপ্তি পেয়েচি। সম্প্রতি কিছুকাল থেকে হয় তো দুই পক্ষেই সেই অব্যবহিত সম্বন্ধের ব্যাঘাত হয়েচে। তাতে মনে যে কঠিন দুঃখ পেয়েছি তার কারণ সাহিত্যিক নয়। এটা নিছক বন্ধুত্বের বেদনা। আপনার কাগজের ভিতর দিয়ে আমাদের পরস্পরের স্পর্শ ছিল সেটার মধ্যে কঠিন ব্যবধান পড়েচে। অন্যান্য কারণের মধ্যে আর্থিক কারণটাই হয় তো সর্ব্বপ্রধান। তাই ইদানী এই অর্থের সম্পর্কটাকে অস্বীকার করবার মৎলবই মনে মনে আঁটছিলুম। এখন বুঝতে পারচি সেটাতে ভুল বোঝার সৃষ্টি হত। হয়ত কখনো না কখনো এমন কথার সৃষ্টি হতেও পারত যে, "সস্তার তিন অবস্থা।" একবার ভুল বোঝার দূষিত হাওয়া সুরু হলে তার স্পর্শে সমস্তই বিকৃত হয়।

যাই হোক্ প্রবাসী ও মডারন্ রিভিয়ুর তো দরোয়াজা বন্ধ। অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আমার যে একটি অকৃত্রিম আত্মীয়সম্বন্ধ আছে সেটা প্রকাশ করবার পথে দেয়াল উঠ্‌ল। সবসুদ্ধ জড়িয়ে আবহাওয়াটা আমার পক্ষে এতই দুঃখজনক হয়েছে যে, আমার সাহিত্যিক জীবনের পরেই আমার ধিক্কার জন্মেছে। লেখার আনন্দ আজ একটা গুরুতর ব্যাঘাত পেয়েচে। শুধু তাই নয় এই সমস্ত ব্যাপারে আমাকে একটা খর্ব্বতার মধ্যে নামিয়েছে তাতে নিজের জন্যে বড়ই লজ্জা বোধ করি। কেউ জানে না, মুক্তির জন্যে আমার মনের মধ্যে কত বড় একটা উৎকণ্ঠা আছে। আমার সেই সাধনায় ব্যাঘাত হয় যখন এই সকল ব্যাপারে আমাকে নিজের দিকে সচেতন করে তোলে।

সেই নিজেটা বড় ক্ষুদ্র, মাঝে মাঝে তার অনাবৃত পরিচয় পেলে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। এ কয়দিন এত কষ্ট পাচ্চি সেই জন্যে। সেই জন্যেই সাহিত্যের সাধনা ফেলে রেখে অন্য সাধনাটার দিকে দৌড় মারবার জন্যে মন আজ এত উৎসুক হয়েচে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্তই কম্‌লি হয় ত ছাড়বে না।

২ জুলাই ১৯২৭

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ জুন ১৯২৮

ওঁ

[কলম্বো]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কোনো মতে শরীরটাকে টান্‌তে টান্‌তে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে এত দূরে এসে পৌঁচেছি — কিন্তু আর চলচে না। ঘাটের থেকেই ফিরতে হোলো। দেশে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাসের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম্ম থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেব ঠিক করেচি— ছোট ছোট দাবীর শিলবৃষ্টিতে আমার দেহ মনের সমস্ত ডাঁটাগুলো একেবারে আল্‌গা হয়ে গেছে। ডাক্তার বল্‌চে স্থির হয়ে থাকা ছাড়া ওষুধ নেই। অন্তরের মধ্যে তার একান্ত প্রয়োজনও বোধ করচি।

চিঠি দুটো ছাপবেন।

অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হোয়ে বড়োই তৃপ্তি পেয়েছি। এ সম্বন্ধে একটা লিখেছি ফিরে গিয়ে আপনার হাতে দেব। আগামী ১০ই তারিখে একটা জাহাজ যোগে যাব মাদ্রাজে— সম্ভবত ১৪ই ছাড়ব মাদ্রাজ থেকে রেলযোগে— যদি পথের মধ্যে কোথাও বিশ্রাম কামনায় না নামতে হয় তাহলে বোধ করি ১৬ই পৌঁছব কলকাতায়। ইতি ৮ জুন ১৯২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"লেখন" সম্বন্ধে লেখাটি পাঠিয়েছি, পেয়েচেন বোধ করি। ক্ষুদ্রকায়া কবিতা সম্বন্ধে দুচারটে কথা লিখেছি— সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের অত্যন্ত ভীরুতা আছে, বলা বাহুল্য য়ুরোপে সেটা নেই, আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। Fireflies সম্বন্ধে একটি অ্যামেরিকান পত্রিকার সমালোচনা ক্ষুদুর হাতে দিয়েছিলুম, সেটা বোধ হয় সে হারিয়ে ফেলেচে। কিন্তু অ্যামেরিকায় Dial সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যিক পত্র— তাতে Firefliesএর কবিতাকে যে ভাবে কবিতার

পদবী দিয়েই সমালোচনা করেচে সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য অপূর্ব্বকে বলেছিলুম ঐ লেখাটা আপনাকে দিতে। বোধ হয় দিয়েচে। তাতে এইটে দেখা যায় সেখানকার সাহিত্যিকদের সাহিত্যরসবোধ ভীরু নয়, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে বার বার তার প্রমাণ পেয়েছি এবং তার উল্টো প্রমাণ এদেশে সর্ব্বদাই পাই। জাপানের এবং চীনের কাব্য সম্বন্ধে য়ুরোপের পাঠকদের যে প্রভূত আনন্দবোধ দেখেচি তাতে করে তাদের বিচারশক্তির ঔদার্য্য দেখতে পাই। এই ঔদার্য্য কন্টিনেন্টের চেয়ে ইংলণ্ডে কম তা সত্য।

সেই নাম্নী কবিতাটার প্রুফ একবার দেখতে হবে—অল্পস্বল্প কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক আছে। ইতি ৫ আশ্বিন ১৩৩৫

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ অক্টোবর ১৯২৮

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

যদুনাথ সরকার মহাশয় মৃত যুগের কাহিনী নিয়ে কারবার করেন— টুক্‌রো খবর জোড়াতাড়া দেওয়াই তাঁর অভ্যস্ত। তিনি পণ্ডিত, সংবাদ সংগ্রহ করে সেগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করে

তাতেই তিনি তৃপ্তি পান— মরা জিনিষ নিয়ে এমন করে ম্যুজিয়ম সাজানো চলে, যথাস্থানে তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পাণ্ডিত্যের ঘরগড়া কাঠামোর মধ্যে জীবধর্ম্মী পদার্থকে লেবল্ মেরে যিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তিনি অস্থানে আপন শক্তির অপব্যবহার করে থাকেন। তিনি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে অবধি চিরকাল ছেলে-পড়ানো ব্যবসাতেই এতকাল কাটিয়েছেন, অর্থাৎ বাঁধা নিয়মের পুনরাবৃত্তি করেছেন ও উপরওয়ালাদের হুকুম মেনে চলেচেন। সেইজন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি মৃত পদার্থের মতোই ব্যবহার করেচেন— নিজের চিত্ত থেকে তাকে কিছুই দিতে পারেন নি, বরঞ্চ তার ক্ষয় সাধন করেচেন। আশু মুখুজ্জে মশায়ের মনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব রূপ ছিল— বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তিনি পণ্ডিতী করেন নি, সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তার অন্তরের থেকে তার প্রাণশক্তিকে নব নব বিকাশের মধ্যে উদ্ভাবিত করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। মৃত বস্তুর কোনো বালাই নেই, তাকে নেড়ে চেড়ে সাজিয়ে রাখলেই, স্ক্রু পেরেক লাগিয়ে জোড়াতাড়া দিতে পারলেই চুকে যায়; কিন্তু সজীবের সঙ্গে কারবারে সতেজ চিত্তের ও সমগ্রদৃষ্টির প্রয়োজন হয় তাতে পদে পদে ভুলের আশঙ্কা আছে—কিন্তু শক্তিমানের হাতে সেই ভুলও ভালো, পাণ্ডিত্যাভিমানীর জড় হস্তে প্রাণের অবমাননা এবং হুকুমের তামিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গর্হিত। আশু মুখুজ্জে মশায় জানতেন এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি শেষ হয়ে যায় নি, সবে আরম্ভ হয়েচে। তাকে দেশের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে

তুলতে হবে, তাকে এমন কিছু করে তুলতে হবে যা অন্য কোনো দেশের প্রতিষ্ঠানের নকলমাত্র নয়।

সৌভাগ্যক্রমে মুখুজ্জে মশায় কেবলমাত্র পণ্ডিত ছিলেন না, নির্ভীক চিত্তশক্তির বলে পুরাতনের মধ্যে নূতনের উদ্বোধন করতে পারতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো একটা শ্রেণীগত কাঠামোর মধ্যে এঁটে সেঁটে ঠেসে রেখে তার পর থেকে দুই চক্ষু বুজে অন্ধ প্রদক্ষিণের জন্যে বাঁধা প্রণালীতে চক্রপথ সৃষ্টি করতে চাননি। সেই কারণেই তিনি ভুলও করেছিলেন, কিন্তু সব ভুলকে অতিক্রম করে সৃষ্টি করে-ছিলেন। পণ্ডিত সরকার মশায় শাস্ত্র মিলিয়ে এবং সর্ব্বদা উপরওয়ালাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার কাজ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কোনো কূলই রক্ষা করতে পারেন নি।

তাঁর এইরকম বিশুদ্ধ পণ্ডিতী মনোভাববশতই তিনি নিশ্চয় ঠিক করে বসেচেন যে আমার বিদ্যালয়ে আমিও জোড়া-তাড়ার কাজে লেগেচি। ইচ্ছা করলেও তা আমার পক্ষে অসাধ্য। আমার কোনো কর্ম্মঅনুষ্ঠানকে পণ্ডিত মশায় তাঁর সযত্নপঠিত পুরাতন ইস্কুল বইয়ের থেকে সঙ্কলিত সুনির্দ্দিষ্ট কোনো জড়প্রণালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারবেন না। তাকে ঠিকমতো বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ আমি পাণ্ডিত্যবর্জ্জিত,— ধ্যানদৃষ্টিতে সমগ্রভাবে দৃষ্ট সত্যরূপকে জীবনের সৃষ্টিপ্রণালীতে অন্তর থেকে বাহিরে উদ্ভিন্ন করে তোলবারই সাধনা করে থাকি। আমার বাক্যের রচনা ও

কর্ম্মের রচনা সেই একই পথে চলে। পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করা এই বিধানেই হয়, ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্পূর্ণ অন্য বিধানে।

পণ্ডিত সরকার মশায় বলেন, আত্ম-অগোচর অনুকরণের পথ বেয়ে আমি কিছু উপনিষদ কিছু খৃষ্টানী মিলিয়ে একটা জোড়াতাড়া বিদ্যায়তন তৈরি করেছি। আমি যা করেছি তা বর্ত্তমান যুগেই আছে, সে আওরঙ্গজেবের যুগে নয়, অতএব সশরীরে এসে স্বচক্ষে দেখে আটায় আঁটা বা পেরেক-ঠোকা জোড়গুলো যদি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে কথাটা নিয়ে যথার্থভাবে আলোচনা করা চলে। তিনি আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে এক কাল্পনিক পঞ্চদশ শতাব্দীর শিখরে চড়িয়ে দিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক দূরবীন কষে একটা আভাস এদিক থেকে একটা আভাস ওদিক থেকে নিয়ে একটা টুক্‌রো-জোড়া ছবি এঁকেচেন। বহুকাল পূর্ব্বে এক সময়ে সরকার মশায় দয়া করে আমার বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন। সেটা বিদ্যালয়ের প্রায় আরম্ভকালে। তার পর অতি দীর্ঘকাল এখানে একবারো আসেন নি। এর মধ্যে এখানকার কর্ম্মে আমার মনস্তত্ত্ব যে ভাবে নিযুক্ত আছে সেটা তাঁর সুদূরস্থিত মনোভাবের মধ্যে অকস্মাৎ যে একটা থিয়োরি জাগিয়ে তুলেচে, সেটা সাইকোএনালিসিসের স্বপ্নবিশ্লেষণের বিষয় হতে পারে কিন্তু সেটা বর্ত্তমানের ইতিহাস রচনায় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। যাঁরা জোড়া-দেওয়া প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করেন, আমার

বিশ্বাস বর্ত্তমান ইতিহাসকে সত্যভাবে প্রত্যক্ষ করা তাঁদের অসাধ্য।

যদি পণ্ডিত সরকার মশায় এমন কথা বলেন যে উপনিষদের প্রভাব আমার মনের উপর আছে এবং আধুনিক কালের প্রভাব থেকেও আমার মন মুক্ত নয়, তবে সে কথা আমি গৌরবের সঙ্গেই স্বীকার করব। কিন্তু যে চিত্ত বর্ত্তমান ও অতীতকালের অনুপ্রেরণাকে গ্রহণ করেচে তার তো একটা নিজের স্বাতন্ত্র্য থাকে— সে তো একটা জোড়া দেওয়া সঙ্কলন ব্যাপার নয়। মাছের ঝোল যে খায় তার দেহের মধ্যে মাছের ঝোলের মাছ এবং তার আলু কাঁচকলা এক সঙ্গেই কাজ করতে থাকে— তার পটোলের অংশ পাটোলিক ও মাগুর মাছের অংশ মাগৌরিক ভাবে জোড়াদেওয়া রূপে কাজ করেনা। অবশ্য যে-ঝুড়িতে মাগুর মাছ ও আলু পটল আনা হয় সেই ঝুড়িতে ঐ উদ্ভিদ ও জলচর একত্র হয় কিন্তু একীকৃত হয় না। আমার বিদ্যালয়টা ঝুড়ি নয় আশা করি সে কথা বলা বাহুল্য। ঐতিহাসিক মশায়কে আমার মতো লোকের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই ধৃষ্টতা যে, পৃথিবীতে যত বড় বড় সভ্যতা, এমন কি বড় বড় কর্ম্মী ও গুণী জন্মেচে তাদের প্রকৃতিতে নানা প্রভাবসঙ্করতা ঘটেচে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকারী চিত্তের অখণ্ড স্বাতন্ত্র্যই প্রকাশ পেয়েছে। শেক্স-পিয়রকে ঐতিহাসিক ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যেতে পারে তাঁর কত অংশ গ্রীক, কত অংশ খৃষ্টান, কত অংশ রোমান, কত অংশ কেল্টিক, স্যাক্সন ও এলিজাবীথিয়

বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের— কিন্তু তাই বলে যদি কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদ তাঁর বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, শেক্সপীয়রের রচনা বৈরাগীর আল্‌খাল্লার মতো একটা তালি দেওয়া ব্যাপার তাহলে পৃথিবী জুড়ে এত লোক অট্টহাস্য করে উঠবে যে সভা জমানো অতি বড়ো প্রত্নতত্ত্ববিদের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠবে। আমার পক্ষ নিয়ে তত বড় নিঃসংশয়ভাবে তত বড় ব্যাপক হাস্যের দিন আসেনি, কিন্তু তাই বলেই নির্ভয়চিত্তে হাস্যকর ব্যাপার ঘটানো অধ্যাপকদের পক্ষে শোভন নয়।

এমেরিকা য়ুরোপ থেকে কোনো কোনো শিক্ষাতত্ত্বের অভিজ্ঞ অধ্যাপক আমার বিদ্যালয়ে এসে এখানকার আকার প্রকার পর্য্যালোচনা করে গেছেন। তাঁরা এখানে যা দেখেচেন সেটা তাঁদের নতুন বলেই ঠেকেচে এবং বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করেই তাঁদের গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তার উল্লেখ করেচেন। তাঁদের ভুল হতে পারে কিন্তু তাঁরা স্বয়ং এখানে উপস্থিত থেকে দেখে গেচেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ যা বলেচেন তা না দেখে। না দেখে পাণ্ডিত্য করা যায় কিন্তু সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া যায় না।

মনের ক্ষোভে অনেক কথা লিখলেম। আজ সুদীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানকে আমি গড়ে তুলচি— তাতে আমার স্বাস্থ্য, সময় ও সামর্থ্য যে কি পরিমাণে ব্যয় করেচি তা আপনারা অনেকেই জানেন। দেশের লোকের কাছ থেকে আনুকূল্যের চেয়ে প্রাতিকূল্য যে কত পেয়েছি সে কথাও আপনাদের অগোচর নেই। যাঁরা এই আশ্রমের ক্রমশ বিকাশের অতি-বন্ধুর পথ অভিজ্ঞভাবে অনুসরণ করে এসেচেন তাঁরা এর

সম্বন্ধে ভালো মন্দ যাই বলুন স্বীকার করে নিতে পারি। কিন্তু যাঁরা না জেনে বা অতি অল্পমাত্রই জেনে এর প্রতি প্রকাশ্য অবজ্ঞাবর্ষণ করতে কুণ্ঠিত হন না, গোপনে এর ক্ষতি করতে যাঁদের উৎসাহ তাঁদের সম্বন্ধে আমার ক্ষুব্ধ মনের এই প্রশ্ন কিছুতে শান্ত হতে চায় না যে, এই কাজে আমার শক্তি প্রায় নিঃশেষে ব্যয় করে আমি তাঁদের কাছে বা দেশের কাছে কী এমন অপরাধ করেচি। আমি তাঁদের সাহায্য প্রত্যাশা করিনে কিন্তু আমার পথে বাধা দেবার জন্যে কেন তাঁদের এই রুচি?

আমার বয়স সত্তরের কাছে এল— এই বিদ্যালয়ের সকল ভার দেশের উপেক্ষা সত্ত্বেও প্রাণপণে বহন করতে গিয়েই নিষ্ঠুর উদ্বেগের ক্লান্তিতে আজ আমার শরীর অবসন্ন। তবু আপনি জানেন সম্প্রতি আমার দুর্ব্বলতাকে অস্বীকার করে পুনর্ব্বার এই বিদ্যালয়ের পরিচালনাভার সম্পূর্ণ নিজের পরেই নিয়েছি। মনের মধ্যে এই একটি মাত্র আশা আছে যে আমার অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করে আজ আমার দেশের লোক আমার ভার যদি লাঘব নাও করেন তবু ভারবৃদ্ধি করবেন না। ব্যক্তিগতভাবে যত অন্যায় আঘাত আমি সহ্য করেছি এমন আজকের দিনে আমার দেশের কোনো খ্যাতিমান লোককেই সহ্য করতে হয় নি। আমি কখনো তার প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু আমার প্রতি অন্ধ অবজ্ঞা-বশত আমার কর্ম্মকে আঘাত করলে আমাকে মর্ম্মান্তিক দুঃখ দেওয়া হয়।

শিক্ষাসত্র নামটা চল্‌বেনা। আপাতত নামের প্রতি হস্তক্ষেপ করবনা।

সেই গাছের গল্পটা সম্বন্ধে সেদিন আপনাকে বল্লুম যে সেটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লেখা অতএব সমস্তটা নতুন করে লেখা দরকার হবে। তার পরে পড়তে গিয়ে দেখলুম প্রায় তার একটি কথাও বদল করার দরকার হবে না। সেটা আপনাকে পাঠাব কিন্তু অগ্রানের পূর্ব্বে ছাপবেন না।

আমার চৈন বন্ধু সু এখানে আসচেন— তিনি যখন কলকাতায় যেতে ইচ্ছা করবেন তখন তাঁর সঙ্গে যাব। তিনি এলে বুঝতে পারব কবে যাওয়া সম্ভব হবে। ইতি ৭ অক্টোবর ১৯২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৩

১০ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

অমিয়কে তাড়া লাগাব।

আমার চৈন বন্ধুটিকে নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে আছি।

হোম য়ুনিভর্সিটির কথাটা আমার মনে লেগেছে। এই রকম অনুষ্ঠানের উদ্দেশে কতকগুলি পাঠ্যগ্রন্থ রচনার আশু প্রয়োজন হবে। সে কথাটাও ভেবে দেখবেন।

অপূর্ব্বকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা সে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে। আপনাকে পাঠাবার জন্যে তাকে লিখে দিয়েছি।

সেদিন যদুবাবুর সমালোচনা সম্বন্ধে আপনাকে একটা দীর্ঘ পত্র লিখেচি। সেটা কি পাননি? আপনার আজকের পত্রে তার উল্লেখ নেই কেন ঠিক বুঝতে পারলুম না। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯২৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ অক্টোবর ১৯২৮

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার নিবেদন---

সেদিন যদুবাবুর সম্বন্ধে চিঠিখানা লেখার পরেই মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। আমার শরীর ক্লান্ত এবং মন নানা-প্রকার দুর্য্যোগে এত অত্যন্ত উদ্বেজিত যে এই ব্যথিত অবস্থায় ছোট আঘাতও বড়ো হয়ে ওঠে— এখন শান্তভাবে বিচার করা কঠিন। কিন্তু মনের মধ্যে নিয়তই এই কথাটা জেগে ছিল যে ঐ চিঠি আমার যোগ্য হয়নি। আপনি ওটা ছাপতে চান না শুনে আমি আরাম বোধ করলুম।

নাম্নী কবিতাটার কয়েক কপি যদি পাঠিয়ে দেন ত কাজে লাগাতে পারব।

সেই গাছের গল্প তো দুতিন [দিন] আগেই পাঠিয়েছি এতদিনে নিশ্চয় পেয়ে থাক্‌বেন।

অপূর্ব্বর কাছ থেকে তার চিঠিখানার ইংরেজি অনুবাদ তলব করে পাঠাবেন। তাকে আমি আগেই লিখে দিয়েছি। ইতি ১১ অক্টোবর ১৯২৮

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫

২৬ নভেম্বর ১৯২৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

…এর উক্তি অনেক স্থলেই শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। সিংহলে থাকতেই তাঁর সেখানকার বিবরণ শুনেছিলুম। মনে রাখবেন তিনি সেখানকার য়ুরোপীয় প্লান্টারদের নিমক খাচ্চেন।

তবু আমি ডিসিল্‌ভাকে মডারন রিভিয়ুর লেখাটি পাঠিয়ে দিলুম।

শরীর ক্লান্ত। তার উপরে বিদ্যালয়ের কাজের ভার নিয়ে নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে আছি। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৬

৮ ডিসেম্বর ১৯২৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

নন্দলালরা কলাভবনের নতুন ঘরগুলি সাজিয়ে তোলবার ব্যাপারে নিতান্ত ব্যস্ত। তাই কোনো কাজে হাত দিতে পারচেন না। চেষ্টা করবেন যদি গীতাঞ্জলির কোনো কবিতার সঙ্গে ছবি এঁকে কন্‌গ্রেস উপলক্ষ্যে বিক্রির জন্যে পাঠাতে পারেন। একটু বড়ো সাইজে দেয়ালে ঝোলাবার মতো। আর আর ছবি প্রায় সবগুলিই প্রবাসী মডারন রিভিয়ুতে ছাপা হয়ে গেচে। সেগুলি বাছাই করে নতুন ব্লকে ছাপানো যেতে পারে কিনা ভাবচেন। ৭ই পৌষের ব্যাপারটা চুকে না গেলে মন স্থির করতে পারচেন না।

আপনি জানেন, জোরোয়াস্ত্রিয় শাখার ব্যাখ্যানকারের নাম আমরা আমাদের বুলেটিন বা কাগজে প্রচার করিনি। করবার প্রয়োজন ছিল। তার কারণ বুঝতে পারচেন। তারাপুরওয়ালাকে শাস্ত্রীমশায় বক্তৃতাগুলি লিখিত আকারে দিতে বলে অকৃতকার্য্য হয়েচেন এই তো জানি। শাস্ত্রীমশায় এলে খবরটা আরো স্পষ্ট করে জানা যাবে। ইতি ৮ ডিসেম্বর ১৯২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিরতিশয় ব্যস্ততার মধ্যে "সাহিত্যবিচার" বক্তৃতার মোট কথাটা দ্রুত লেখনী চালনায় লিখে আপনাকে পাঠাই। মাজা ঘষার, ভেবে দেখার সময় একটুও নেই এর পরে অন্য কাজের অবতারণার সম্ভাবনা আছে। অতএব যেমন আটপৌরে ভাবে লেখা গেল তেমনি পাঠিয়ে দিচ্চি। ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৮

৮ নভেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার এই লেখাটি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে প্রবাসীতে ছাপাবেন। ইতি ৮ নভেম্বর ১৯২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৯

১৫ নভেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তা লিখে পাঠাবার চেষ্টা করব। Political Philosophy of Rabindranath নামে যে একটি ইংরেজি বই সম্প্রতি বাহির হয়েচে সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে আপনার নামে প্রবাসী আপিসে পাঠিয়েছিলুম— কোনো একজন ব্যানার্জি উপাধিধারী "প্রাপ্ত" বলে স্বীকার করেছিলেন। সে লেখা আপনার গোচর হয়েচে কিনা আপনার চিঠি থেকে বুঝতে পারলুম না। বিষয়টা স্বতই উপদ্রবজনক সেইজন্যে আপনার বিচারের অপেক্ষা করেছিলুম।

বরোদায় একটা বক্তৃতার জন্যে আমি আহূত। সেইটি লিখতে হচ্চে। প্রতিদিন অনুভব করচি আমার রচনাশক্তির সহজস্রোত মন্দীভূত হয়ে আসচে। বোধ হয় আমার চিত্ত সেই ধারায় কাজ করতে এখন আর উৎসাহ বোধ করে না। বিশেষত আমার মন ইংরেজি লেখায় অত্যন্ত অনবধান হয়ে পড়েচে। বড়ো ধীরে ধীরে কলম চলে। এটা প্রত্যেক বারে ঘটে যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসি— বোধ হয় যেন ইংরেজি ভাষায় চিন্তা করবার প্রণালীটা এখানে রুদ্ধ হয়ে আসে। অথচ হিবার্ট লেকচার উপলক্ষ্য করে আমার কিছু বলবার আছে। আমি

স্বভাবত কুঁড়ে, বাইরে থেকে খুব একটা চাপ না পড়লে আমার অনেক কথাই অকথিত থেকে যায়। তাই আমার ক্লান্ত মনকে এই কাজের জন্যে তাগিদ করচি। দেশে থাকতে এত ছোট ছোট দুঃখ এবং দায় এসে নিরন্তর এত অকারণ আবর্জ্জনায় আমার দিনগুলোকে ভারাক্রান্ত করে যে, মনে করচি য়ুরোপে কোনো নিভৃত স্থানে গিয়ে আমার লেখাটা শেষ করব। নিজের ভিতরকার যেটা বড়ো দান সেটা বড়ো শান্তি ও অবকাশ ছাড়া যথোচিতভাবে উদ্ভাবিত হতে চায় না। সেই শান্তি ও নিরাবিল অবকাশকে আপন অন্তরের জিনিষ করে তোলবার জন্যে একান্ত মনে চেষ্টা করি। যদি সফল হতে পারি তবে নিজের জীবনটাই নৈবেদ্যরূপে রচিত হতে পারবে অন্য কোনো রচনা নাইবা হোলো।— একটা ইংরেজি লেখা চেয়েচেন। আপনি চাইলে অস্বীকার করা আমার পক্ষে সহজ হয় না। মুস্কিল এই যে শীতের অনেকটা সময় রেলপথে কাটবে— নিমন্ত্রণরক্ষায় এবং ভিক্ষা সংগ্রহে। সংগ্রহ বেশি হবে বলে আশা করিনে— কিন্তু বাংলার বাহিরে নিগ্রহের আশঙ্কা কম— অতএব ঝুলি নিয়ে বেরতে হবে— কেননা এই ভিক্ষাটা সাধনারই একটা অঙ্গ--- বোধ করি নিরর্থক হলেও তার একটা সার্থকতা আছে। আমার পোলিটিকাল মত সম্বন্ধে প্রবাসীতে যে লেখা লিখেচি সেটা যদি আপনার মনঃপূত হয় তবে সেইটেই কাউকে দিয়ে তর্জ্জমা করিয়ে পাঠিয়ে দিলে সেটাকে আমি শোধন করে কিছু পরিমাণে তাকে স্বকীয় করে আপনার কাছে পাঠাতে পারি। আর যদি শতকরা একশত পরিমাণে আমার কিছু চান তবে

সে প্রস্তাবটা মনে রইল কিন্তু অবস্থাগত প্রচুর অনুকূলতার উপর তার সাফল্য নির্ভর করবে। ইতি ১৫ নবেম্বর ১৯২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনি বোধহয় জানেন কিছুদিন থেকে আমার যে কোনো লেখা যে কোনো কাগজে বেরচ্চে সে আমার দীর্ঘকালের পুরোনো লেখা। এত পুরোনো যে পুরোনো বলে ধরা পড়ে না। অমল তার ম্যুনিসিপাল শকটের জন্যে এমনি একটা লেখা জন্মতারিখ চাপা দিয়ে বোঝাই করবে বলে নিয়ে গেছে।

২১ নভেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রামকৃষ্ণ পরমহংস যেদিন আমাদেব বাড়িতে পিতৃদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সেদিন আমি বাড়িতে ছিলাম কিন্তু তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাৎকারের স্থলে উপস্থিত ছিলাম না। নিবেদিতার মুখের ভাবে অনুভব করেছিলুম তিনি সন্তুষ্ট হন নি। তিনি পরমহংসদেবকে যথোচিত শ্রদ্ধা করেন নি সেটা অসম্ভব নয়। কেননা তিনি একেবারেই বিগ্রহ

মানতেন না, এবং উপনিষদের অনুশাসন অনুসারে তাঁর চিরজীবনের সাধনা ছিল শান্ত সমাহিত আত্মসংযতভাবের। ভক্তিপ্রেমের যে আবেগ তাঁর মধ্যে ছিল তার একমাত্র পরিতৃপ্তি তিনি পেয়েছিলেন পারসিক সুফী কাব্যগ্রন্থে। আমাদের দেশের শাক্ত বা বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে ভাবোন্মাদের আলোড়ন আছে তাকে তিনি দূরে পরিহার করেছিলেন তার প্রধান কারণ এ নয় যে ধর্ম্মবিশ্বাসে তাঁর মনে একটা আভিজাত্য-বোধ ছিল, আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ ঐ দুই ধর্ম্মমতের সঙ্গে যে সকল মূর্ত্তি ও কাহিনী জড়িত তাকে তিনি আধ্যাত্মিক দিক থেকে নির্ম্মল ও নিরাময় মনে করতেন না। সেই কাহিনীগুলিতে রূপকের মূলগত ভাব-প্রধানতা অতিক্রম করে অতিবাস্তবের ভাববিরোধী স্থূলত্ব প্রকাশ পেয়েছে বলে তার প্রতি তাঁর চিত্ত নিরতিশয় বিমুখ ছিল। ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে তাঁর একটা অত্যন্ত শুচিত্ববোধ ছিল, সেই শুচিত্ব খৃষ্টান ধর্ম্মের স্থূল মতবাদকেও সহ্য করতে পারত না। রামমোহন রায়ের মধ্যে একেশ্বরবাদের একটা প্রবল ঐকান্তিকতা ছিল, যে জন্য আজও ভারতবর্ষ তাঁকে প্রসন্ন মনে স্বীকার করতে পারেনি— আমার পিতা বাল্যকালেই সেই অতি বিশুদ্ধ একেশ্বর-বাদের আদর্শ রামমোহন রায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন— সেই কারণে বিগ্রহপূজার সংস্রবমাত্র যেখানে আছে সেখানে তাঁর মন আঘাত পেয়েছে। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের সিংহদ্বার দিয়ে— এইজন্যে আত্মউপলব্ধির বিশুদ্ধ আত্মসমাহিত আনন্দের সাধনা তাঁর ছিল না— শাক্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম

থেকে হৃদয়াবেগ মন্থন করে নেওয়া এবং তার আন্দোলনে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া তাঁর [পক্ষে] সহজ ছিল। যাই হোক আমার এই মত আপনাকে জানালুম এ প্রকাশ করবার জন্যে নয়।

শপথ গ্রহণ সম্বন্ধে এণ্ড্রুজকে একদা যে পত্র লিখেছিলুম সেটা আপনাকে পাঠাই বোধহয় মডার্‌ন্ রিভিয়ুতে এটা চলতে পারে।

আপনার পত্রে লিখেছেন আমার সম্বন্ধে যে সব গঞ্জনা-বাক্য সম্প্রতি মুখর হয়ে উঠেছে সেগুলি আমার কর্ণগোচর করা অনাবশ্যক ও অন্যায়। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সুখকর না হলেও তার প্রয়োজন ছিল। বাইরের অপমানে বিচলিত হওয়ার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে সেইটেতে যখন লজ্জা দেয় তখনি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নিজের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা একান্তই চাই। তুচ্ছ কারণে চিত্তবিক্ষেপের দ্বারা জীবনকে ব্যর্থ করার মতো এত বড়ো আধ্যাত্মিক অপব্যয় আর নেই। তার থেকে নিজেকে বাঁচাবার অধ্যবসায় আমি গ্রহণ করেছি—আর সময়ই বা কত আছে? সাধনা সত্য হয়েছে কিনা পদে পদে তার প্রমাণ দরকার করে— যদি একেবারেই তা না পাই তবে অলস শক্তি নিয়ে আত্মবিস্মৃত হবার আশঙ্কা ঘটে। তার চেয়ে বাইরের অবমাননা ও আঘাত অনেক গুণে ভালো। বস্তুত বাইরের অকস্মাৎ অকারণ লাঞ্ছনায় আমাকে কঠোর-ভাবে বিস্মিত করেছিল বলেই আজ আমি অন্তরতম শান্তি-ধামের পথে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি— মনে আশা আছে

এপথ থেকে সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা আর ঘটবে না, ক্ষণকালের জন্যে ঘটলেও নিজেকে উদ্ধার করতে পারব। কিছুদিন থেকে একটা বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় হয়েছে যে, এখান থেকেই আমাদের পাথেয় নিয়ে যেতে হয়— মরুপথের পারে যাবার জন্যে জল নিয়ে যাবার মতো,— নানা খুচ্‌রো আঘাতের ধাক্কায় সেই জল সঞ্চয় যদি মরুবালুর উপরে ক্ষয় করতে থাকি তাহলে তার কঠোর দায়িত্ব আছে। কথাটা পুরোনো কিন্তু যেদিন তার সত্যতার পূরো খবরটা মনে আসে সেদিন মনে হয় একথাটা আগে কোনোদিন শুনি নি। আশা করি সময় থাকতেই শুন্‌তে পেয়েছি। ইতি ২১ নবেম্বর ১৯২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০১

২৮ নভেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কোরীয়-রবীন্দ্রসংবাদ আপনাকে পাঠানো হয়েচে। আপনার আজকের পত্রে তার উল্লেখ দেখলুম না। বোধকরি রেজেস্ট্রি ডাকের গতি বিলম্বিত।

···কে দিয়েচেন আমার লেখা তর্জ্জমা করে দিতে। ফলের আশা ত্যাগ করে যদি সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে দিয়ে থাকেন

তাহলে দুঃখের কারণ থাকবেনা। দান্তের কাব্যে পাপীদের বিশেষ একটি বস্তির দ্বারে লেখা আছে এখানে যারা যায় তাদের ফেরবার আশা নেই। যে রচনাকে চিরবিলুপ্তির দণ্ডযোগ্য মনে করেন তাকে ··র [কাছে] দেবেন সে আর ফিরবেনা।

আমার দুটো ইংরেজি লেখা আপনাকে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলেচি। অপরাধের মধ্যে এরা পুরোনো লেখা। কিন্তু অপরিচিত। বাল-বিধবার মতো। দ্বিতীয়বার পরিণয় প্রথম পরিণয়েরই সামিল। বিশ্বভারতীর পত্রিকায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাসে ছিল, বহুকাল পূর্ব্বে। আপনি আজ যদি প্রকাশ করেন তবে অপূর্ব্বরূপেই প্রতিভাত হবে। কিছু বাদসাদ দিয়েচি, নামান্তরও ঘটেচে, এখন আপনি যদি গোত্রান্তর করেন তবে তাদের সদ্গতি হবে। ম্যুনিসিপাল গেজেটে অমল এমনি করেই আমার একটা লেখা বিস্মৃতির ঝুলি থেকে উদ্ধার করেচে— সম্পূর্ণ নতুন বলেই পাঠকেরা তাকে স্বীকার করে নিয়েচে কেউ তাকে বৈধব্যের খোঁটা দেয় নি। ইতি
১১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বরোদার পথে আমেদাবাদে শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। যখন নিশ্চয় বুঝলুম কোনোমতে সাহিত্যসম্মিলনে এ শরীর নিয়ে পৌঁছতে পারব না— তখন বহুকষ্টে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে একটা লেখা অবনের মারফৎ সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেম। দেশের লোক আমাকে সহজে ক্ষমা করেন না জেনেই এই কষ্টসাধ্য কাজ করতে হয়েছিল। তাও ব্যর্থ হল ক্ষমা পাই নি। শুনলুম ডাকপেয়াদার মারফতে না গিয়ে অবনের মারফতে লেখাটা যাওয়াতে তাঁরা অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এ সকল বিষয়ে আমার বুদ্ধির ত্রুটি আছে কিন্তু কাউকে অসম্মান করবার কারণ ও ইচ্ছা আমার ছিল না। এত ক্লেশ করে আমার জীবনে আর কোনোদিন লিখিনি— এর থেকে প্রমাণ হয় স্বদেশবাসীকে আমি যমদূতের চেয়ে বেশি ভয় করতে আরম্ভ করেছি। যতটা সম্ভব দূরে থাকবারই চেষ্টা করব।

আপনার শরীর অসুস্থ শুনে উদ্বিগ্ন রইলুম। আমার শরীর এখনো কাজের বা'র হয়ে আছে। লম্বা চেয়ারে নিষ্কর্ম্ম পড়ে পড়েই দিন কাটাবার চেষ্টা করি। কিন্তু যথেষ্ট বিশ্রামের

সম্ভাবনা বিরল। আপনি ও শান্তা কেমন আছেন কালিদাসকে লিখতে বলে দেবেন। ইতি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ জুন ১৯৩০

ওঁ Dartington Hall
Totnes

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এখনো আপনার প্রেরিত অমৃতবাজারের রিপোর্ট পাই নি। যদি কিছু করতে পারি চেষ্টা করব। কিন্তু যদি হিন্দুমুসলমানে আত্মকলহের বেশী কোনো খবর না পাওয়া যায় তাহলে চুপ করে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। পলিটিক্‌স্ একটা দ্যূতক্রীড়া। পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে হারজিতের লড়াই। কোনো পক্ষ যদি অন্যায় চাল চালে তবে জগৎসভার কাছে তার নিন্দা প্রচার করা চলে। কিন্তু কে বিচার করবে— এ খেলায় ধর্ম্মের নিয়ম কেউ তো মানে না। আর দয়ার দোহাই কাকেই বা দেব? আয়ার্লাণ্ডে কৃষ্ণপিঙ্গল উপদ্রবের কথা মনে আছে তো? এত বড়ো নিষ্ঠুর উচ্ছৃঙ্খলতা সমস্ত য়ুরোপের সামনেই ঘটেচে— অথচ তাদের পরস্পরে রক্তের সম্বন্ধ আছে। গবর্মেণ্টকে ঠেলে ফেলতে গেলে গবর্মেণ্ট সনাতন রীতি

অনুসারে দলে ফেলতে চাইবেই। এই অনিবার্য্য দুঃখ সহ্য করেও যদি মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে পারি তবে জিতে গেলুম। রাষ্ট্রবিপ্লবে যে অস্ত্র দুর্ব্বলের হাতে আছে আমরা তা ব্যবহার করচি আর প্রবল প্রতিপক্ষের হাতে যে অস্ত্র আছে তারাও তার প্রয়োগ করচে— এই সঙ্গে গুপ্তিছুরিও পিঠের দিকে চালাচ্চে—এ ছুরি আমাদের কারখানাতেই তৈরি।— একটা কথা বলে রাখি, শুনলুম প্যারিসে আমার কোন্ ইণ্টারভিয়ু অবলম্বন করে সমুদ্রের এপার থেকে ওপারে তারযোগে আমার কলঙ্ক প্রচার হয়েচে। কোনো কাগজওয়ালাকে ইণ্টারভিয়ু দিইনি— যারা কাগ্‌জি নয় তাদের কাছেও কোনো মন্দ কথা বলি নি। ম্যাঞ্চেষ্টর গার্জিয়েনে যে প্রসঙ্গ বেরিয়েচে সেটা সমূলক এবং যথাযথ। এ ছাড়া স্পেক্টেটরে একটা লেখা বেরিয়েচে দেখে থাকবেন। নানা হাঙ্গামে লেখা বন্ধ আছে— চিঠিপত্রও চলচে না। শরীর মন্দ নেই কিন্তু মন পীড়িত। ইতি ২১ জুন ১৯৩০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬ অগস্ট ১৯৩০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিষ আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলেমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে সেই জন্যেই আসল জিনিষকে আঁকড়ে ধরতে চাই। কেউবা আমাকে উপহাস করে, কেউবা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানিনে আমি এসেচি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার ক'রে এবং প্রণাম ক'রে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েচেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্ম্মাল্য ললাটে প'রে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে, যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোষ পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষ রূপে দেখে তখনি এরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে, যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সঙ্কীর্ণ হয়ে

এসেছে অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে প্রিয় হবার নয়।

ঢাকার উৎপাত সম্বন্ধে স্পেক্টেটরে আমি যে পত্র পাঠিয়েচি তার একটা নকল পাঠাই। আমার এ চিঠি স্পেক্টেটরে স্থান পাবে কি না জানিনে।

আমার এখানকার খবর সত্য মিথ্যা নানা ভাবে দেশে গিয়ে পৌঁছয়। সে সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকতে পারিনে বলে নিজের উপর ধিক্কার জন্মে। বারবার মনে হয় বানপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। যাক্ গে। ইতি ২৬ অগস্ট ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৫
৪ অক্টোবর ১৯৩০

ওঁ অতলান্তিক মহাসাগর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেচি, চলেচি আমেরিকার পথে। রাশিয়া যাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল— ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কি রকম চলচে আর ওরা তার ফল কি রকম পাচ্চে সেইটে অল্পসময়ের মধ্যে দেখে নিতে চেয়েছিলুম।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্চে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম্মবিরোধ, কর্ম্মজড়তা, আর্থিক দৌর্ব্বল্য, সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেচে সে হচ্চে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা বিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়, গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে, জিনিষপত্র কেবলি হারায় তার পরে খুঁজে পায় না, ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে, নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেচে বলে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়— কেবলি বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে, উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই, ক্ষিধে পায় কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত— অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উপরে দেওয়া চলেনা— তারপরে সব শেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয়, আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেচি তাহলে সেটা কেমন হয়? ওরা একদিন ডাইনি বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েচে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেচে, ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুর-ভাবে পীড়ন করেচে, নিজেরই ধর্ম্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধি-কারকে খর্ব্ব করে রেখেচে, এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা

কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায়— এ সমস্ত দূর হল কি করে? বাইরেকার কোনো কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ড্সের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কার সাধনের ভার দেওয়া হয় নি, একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েচে, সে হচ্চে ওদের শিক্ষা। জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েচে, দেশের অর্থ উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেচে, বর্ত্তমান তুরুষ্ক প্রবলবেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্ম্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" কেন না ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি,— যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।

রুশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করি নি। কেন না কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েচি। ভারতের উন্নতি সাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রি টম্সন্ অতি করুণ স্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন। আমাকেও মানতে হয়েচে দুরূহতা আছে বই কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ার প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীয় লোকের মতোই তাদের

অন্তর বাহিরের অবস্থা। সেই রকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজা অর্চ্চনা পুরুত পাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা-পড়া, উপরিওয়ালাদের পায়ের ধুলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ সুবিধা তারা কিছুই পায় নি, প্রপিতামহদের ভূতে পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়, মাঝে মাঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের পরে খুন চেপে যায় তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না, উপরওয়ালাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুৎ, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তুত। এই তো হোলো ওদের দশা,— বর্ত্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য, ইংরেজের মতো তারা ঐশ্বর্য্যশালী নয়, কেবল মাত্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েচে— রাষ্ট্রব্যবস্থা আটেঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায় নি— ঘরে বাইরে প্রতিকূলতা— তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ইংরেজ এমন কি আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করেচে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তারা যে পণ করেচে তার "ডিফিকাল্টি" ভারতকর্ত্তৃপক্ষের ডিফিকাল্টির চেয়ে বহুগুণে বড়ো। অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এ রকম আশা করা অন্যায় হোত। কিইবা জানি কিইবা দেখেচি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে! আমাদের দুঃখী দেশে লালিত অতি দুর্ব্বল

আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখ্‌লুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। Law and Order কি পরিমাণে রক্ষিত হচ্চে বা না হচ্চে তার তদন্ত করবার যথেষ্ট সময় পাই নি— শোনা যায় যথেষ্ট জবরদস্তি আছে, বিনা বিচারে দ্রুতপদ্ধতিতে শাস্তি সেও চলে, আর সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হোলো চাঁদের কলঙ্কের দিক কিন্তু আমার দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক। সে দিকটাতে যে দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য্য— যারা একেবারেই অচল ছিল তারা সচল হয়ে উঠেচে। শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্ত্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেচে— এখানে তাই হোলো; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্চে— পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানব-সমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ। আমাদের সম্রাটবংশীয় খৃষ্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকাল্টিস যে কি রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেচেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না— কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসাগত অভ্যাস, আলো চোখে পড়ে না বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চষমার দরকার করে না। প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স

হোলো— এতকাল আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্ব্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যার দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেচে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়েছি। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েচি, তাঁরা বাহবাও দিয়েচেন, যেটুকু ভিক্ষে দিয়েচেন তাতে জাত যায় পেট ভরে না। সব চেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সবচেয়ে বাধা দিয়েছে। যে দেশ পরের কর্ত্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সবচেয়ে গুরুতর ব্যাধি হোলো এই— সে সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা, যে ক্ষুদ্রতা, যে স্বদেশবিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।

যাই হোক এ দেশের "এনর্ম্মাস্ ডিফিকল্টিজে"র কথা বইয়ে পড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকল্টিজ্ অতিক্রমের চেহারা চোখে দেখ্‌লুম। বিস্তারিত বিবরণ লেখবার সময় নেই। অন্যদের যে সব চিঠি লিখেচি সেই সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে অনেক কথা জানতে পারবেন। এ সমস্ত সংবাদ সবাইকে জানানো চাই অতএব ইংরেজিতে তর্জ্জমা করে মডারন রিভিয়ুতে ছাপাবেন।

শান্তিনিকেতনে সুরেন করের কাছে কিছু চিঠি পাবেন,

রাণী প্রশান্তকেও লিখেচি— রথীকে লিখেচি তার কপি হয় ত শান্তিনিকেতনে আছে। ইতি ৪ অক্টোবর ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬

১৮ নভেম্বর ১৯৩০

ওঁ নুয়র্ক্

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শরীর যখন অসুস্থ এবং মন যখন উদ্বিগ্ন সেই দুর্ব্বল অবস্থায় অর্দ্ধশয়ান দেহে একটা কবিতা লিখেছি। সেই কবিতার একটা কোনো অর্থ আছেই, কিন্তু সে অর্থ আমার কাছে যত সত্য অন্যের কাছে তেমন হবে বলে আশা করি নে। তবু অন্তত অপাঠ্য হবে না আশা করে প্রবাসীতে পাঠাবার সঙ্কল্প করেছিলুম। সংশোধনের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু অমিয় বিলম্ব সইতে পারলনা অসংশোধিত অবস্থাতেই আপনাকে পাঠিয়েচে। কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমি বিলম্ব সইতে পারি কিন্তু অসম্পূর্ণতা সইতে পারি নে তাই বিশুদ্ধ পাঠ নকল করে পাঠাতে হল। এখনো মনে দ্বিধা রয়ে গেছে।

প্রাণলক্ষ্মী

আঁধার তিথিতে তারকা-বীথিতে
তন্দ্রাজড়িত চন্দ্র।
যূথীকলিগুলি দিতেছে আকুলি
হিমগদগদ গন্ধ।
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়, ঘন কুয়াষায়,
ঘুমে জাগরণে, কায়ায় মায়ায়,
তোমায় আমায় আলোয় ছায়ায়
যুগলে ঘটিল দ্বন্দ্ব।
জন্ম-মরণ-অতীত বেলায়
স্মরণের পরপারে
তব ভাবনায় মোর চেতনায়
এক হোলো একেবারে॥

সূর্য্য যখন উড়ালো কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু জানতে।
সেই ধ্বনি ধায় বকুল শাখায়
প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়,
সুপ্ত কুলায়ে জাগায়ে সে যায়
আকাশপথের পান্থে।

তরুণ রথের সে ধ্বনি, পথের
মন্ত্র শুনায়ে দিলে
তাই পায়ে পায় দোঁহার চলায়
ছন্দ গিয়েছে মিলে ॥

তিমির-ভেদন আলোর বেদন
লাগিল বনের বক্ষে
নব-জাগরণ পরশরতন
আকাশে এলো অলক্ষ্যে
কিশলয়দল হোলো চঞ্চল,
শিশিরে শিহরি করে ঝলমল,
সুরলক্ষ্মীর স্বর্ণকমল
তুলে বিশ্বের চক্ষে।
রক্ত রঙের উঠে কোলাহল
পলাশকুঞ্জময়
তুমি আমি দোঁহে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিনু আলোর জয় ॥

সঙ্গীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল রঙ্গে।
চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী
চলিলে আমার সঙ্গে।

চক্ষে তোমার উদিত রবির
বন্দনবাণী নীরব গভীর,
অস্তাচলের করুণ কবির
ছন্দ বসন-ভঙ্গে।
উষারুণ হোতে রাঙা গোধূলির
দূরদিগন্তপানে
বিভাসের গান হোলো অবসান
বিধুর পূরবী তানে॥

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটেচে বিশ্বচিত্র।
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
উদ্গাথা সুপবিত্র।
অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য।
মোর ফাল্গুন হারায় যখন
আশ্বিনে ফিরে লহ।
তব অপরূপে মোর নবরূপ
তুলাইছ অহরহ॥

আসিছে রাত্রি স্বপনধাত্রী,
বনবাণী হোলো শান্ত।

জলভরা ঘটে চলে নদীতটে
বধূর চরণ ক্লান্ত।
নিখিলে ঘনালো দিবসের শোক
বাহির আকাশে ঘুচিল আলোক,
উজ্জ্বল করি অন্তরলোক
হৃদয়ে এলে একান্ত।
লুকানো আলোয় তব কালো চোখ
সন্ধ্যাতারার দেশে
ইঙ্গিত তার গোপনে পাঠালো
জানি না কি উদ্দেশে॥

দেখেছি তোমার আঁখি সুকুমার
নব-জাগরিত বিশ্বে।
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে।
হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান
বিমল আঁধারে ধুয়ে দিলে প্রাণ,
দেখিনু মেলেছ তোমার নয়ান
অসীম দূর ভবিষ্যে।
অজানা তারায় বাজে তব গান
হারায় গগনতলে।
বক্ষ আমার কাঁপে দুরু দুরু,
চক্ষু ভাসিল জলে॥

প্রেমের দিয়ালী দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি।
মোর সঙ্গীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপন-লিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এলো যে রাতি॥

চেনা মুখখানি আর নাহি জানি
আঁধারে হতেছে গুপ্ত।
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ
কোথায় সে হায় সুপ্ত।
অবগুণ্ঠিত তব চারিধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।
শুধু ঝিল্লির ঘন ঝঙ্কার
নীরবের বুকে বাজে।

কাছে আছ তবু গিয়েছ হারায়ে
দিশাহারা নিশামাঝে ॥

এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য ?
তুমি যে-বীণার বেঁধেছিলে তার
এখনি কি হবে ক্ষুণ্ণ ?
যে-পথে আমার ছিলে তুমি সাথী
সে পথে তোমার নিবায়োনা বাতি,
আরতির দীপে আমার এ রাতি
এখনো করিয়ো পুণ্য ।
আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয় ॥

যদি মনে করেন আধুনিক সাহিত্যে এ কবিতা চল্‌বেনা তাহলে ছাপবেননা। আমার সংশয় ছিল, অমিয়র উৎসাহে পাঠাচ্চি। ইতি ১৮ নবেম্বর ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭

২৬ জুন ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হিন্দু মুসলমান প্রবন্ধটির কথা শান্তাকে বলেছিলুম বটে কিন্তু পাঠানো হয় নি। আজ রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠালুম। পাণ্ডুলিপিটা নিতান্ত আটপৌরে ভাবেই আপনার কাছে গেল— ...র হাতের লেখা সুস্পষ্ট নয়, আমার অংশটাও অপরিচ্ছন্ন। মুদ্রাকরের দল এর চেয়ে দারুণতর অত্যাচারে অভ্যস্ত তাই কাপিটাকে অসংস্কৃত অবস্থাতেই পাঠাতে সঙ্কোচ করলুম না। প্রুফে যদি এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হয় তার জন্যে প্রস্তুত রইলুম। জুলাই মাসের প্রথম তারিখে দার্জ্জিলিং থেকে অবতরণ করব। ইতি ২৬ জুন ১৯৩১

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮
৩০ জুন ১৯৩১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রুফ এখানেই পাঠাবেন। কারণ দার্জ্জিলিং থেকে নামা পিছিয়ে গেল। যথোচিত সংশোধন করে দেব। ইতি ১৫ আষাঢ় ১৩৩৮

আপনাদের

দার্জ্জিলিং শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৯
২৭ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আশা করি পকেটঝাড়া শেষ করে ডাকঘর আমার প্রুফখানি অবশেষে আপনাদের আপিসে পৌঁছিয়ে দিয়েচে। সংশোধন করবার সময় দেখা গেল প্রতিলেখনকালে লেখক অনেকগুলি প্রমাদ ঘটিয়েচেন— দুই এক জায়গায় লাইন-ছুটও হয়েচে।

স্বদেশে যে "রবীন্দ্রসকাশে" প্রবন্ধটা বেরিয়েছে সেটা অধিক ভর্ৎসনার ভার সইবে না— ওটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

আপাতত ক্লান্ত আছি। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ

কলকাতায় গিয়ে বন্যাপীড়িতদের জন্যে কিছু একটা করবার চেষ্টা করব। ইতি ১০ ভাদ্র ১৩৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— ইংরেজি প্রবন্ধের প্রুফ আপনি দেখে দিলেই চল্‌বে। কিছু ত্রুটি থাকলে শোধন করে নেবেন।

২৮ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কলকাতায় স্টেজ পাওয়া দুঃসাধ্য হয়েচে। সার্ পি. সি. রায় আজ তাঁর তরফে অনুরোধ করে পাঠিয়েচেন— বলেচি যদি স্টেজ আমার হাতে দেন এবং দর্শক আদি জোগাড় করতে পারেন তবে অন্তত একটা অভিনয়ের ফসল তাঁকে দিতে পারি।

সুভাষ বসুর অনুরোধের উত্তরেও সেই কথা জানাতে হোলো। আমার এবং রথীর শরীরের যে দশা তাতে জিনিষটাকে ঘটিয়ে তোলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। দেশের আর্থিক দুর্দ্দিনে অন্যান্য বারের মতো দর্শক হবে বলে আশা

করিনে— অথচ এর গোড়াতেই খরচ তাই হতাশ হয়ে সংকল্প-
টাকে বর্জন করব বলেই মনে করেছিলুম। এমন সময় এঁদের
অনুরোধের সুযোগ নিয়ে এঁদের উপর ভার চাপিয়েছি। এঁরা
সম্ভবত দর্শক জোটাবার কাজে অনেক পরিমাণে সফল হবেন।
ভাঙা শরীর আরো ভাঙতে রাজি আছি কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে
যদি ফল না পাই তাহলে আমার পক্ষে সে ক্ষতি কঠিন হবে।
চার রাত্রি এটা চালাতে চেষ্টা করব এবং যাঁরা যে রাত্রির ভার
নেবেন তাঁদের হাতে সে রাত্রির মুনফা অর্পণ করব। চার
রাত্রি আমাদের সকলের পক্ষেই দারুণ হবে— তবু দায়িত্ব
নিচ্চি। আজো সমস্ত দিন বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করচি,
নইলে প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব হবে। ইতি ১১ই ভাদ্র ১৩৩৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১
৩০ অগস্ট ১৯৩১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বন্যার সাহায্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের কাছ থেকে টেলিগ্রাম
পত্র ও দূত আসছে। এই আবর্তের মাঝখানে পড়ে আমি
শঙ্কিত হয়েছি। অবশেষে এখানকার সুহৃদ্‌গণের পরামর্শে
স্থির হয়েচে বিশ্বভারতীর অর্জ্জিত অর্থ বিশ্বভারতী স্বয়ং ব্যবহার

করবার ব্যবস্থা করবেন। আত্রাইয়ের তীরবর্ত্তী যে জায়গাটা বন্যায় একান্ত পীড়িত তারই সঙ্গে বিশ্বভারতীর ঘনিষ্ঠ যোগ। সেইখানকার আনুকূল্য বিশ্বভারতীর মুখ্য অবলম্বন, নোবেল প্রাইজ ফণ্ডের সুদ সেইখান থেকে আসে। আমরা নিজের চেষ্টায় যে অল্প পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করতে পারব তাকে বিক্ষিপ্ত করে না দিয়ে এইখানেই প্রয়োগ করা হবে এই স্থির হয়েচে। আপনি এখানে এলে এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব। আমার শরীর এখন কোন প্রকার কাজেরই যোগ্য নয়— এমন কি লেখাপড়াতেও মন দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়েচে। তবু অবস্থা বিশেষে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাজ করে। চারিদিকের দাবীর মাঝখানে থেকে আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য— দূরে কোথাও গিয়ে বানপ্রস্থ্য আশ্রয়ই আমার পক্ষে বিহিত। কিন্তু কিছু পরিমাণে কাজের দায়িত্ব অনিবার্য্যভাবে আমাকে আঁকড়ে আছে বলেই আমার মুখে বিশ্রামের দাবী জোর পায় না। আমার পক্ষে বিশ্রাম একটা নঙর্থক শূন্যতামাত্র নয়, বিশ্রাম হচ্চে জীবনের নূতন পর্য্যায়ের ভূমিকা— এটাকে নষ্ট করায় হয়ত আন্তরিক অপরাধ আছে এই জন্যেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে মনটা এত বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। ইতি ১৩ ভাদ্র ১৩৩৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১২

২৪ নভেম্বর ১৯৩১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ছবি ছাপতে চান— রাজি আছি। কিন্তু আপনাদের কাউকে বাছাই করে নিতে হবে। আমার নিজের পছন্দের উপরে ভরসা নেই। সাধারণের ভালো লাগবার মতো জিনিষ হওয়া চাই। ছবি সম্বন্ধে আমি কোমর বেঁধে আধুনিকতার চর্চ্চা করিনি, করবার উপায়ও ছিল না, কারণ পরিচয়ের অভাব। বিদেশী আর্টিস্টরা কেউ কেউ বলেচেন আমার চিত্রকলায় সাবেকি আধুনিকীর অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেচে— কথাটা যদি সত্য হয় এ ঘটকালি অজ্ঞানকৃত। যাই হোক ইণ্ডিয়ান আর্ট যাকে বলে সেটা আমার আনাড়ি কলমে প্রকাশ পায় নি— অতএব এর জাতকুল মিশিয়ে কারো ভালো লাগবার আশা নেই। সম্পূর্ণ কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষ, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ফাউণ্ডলিঙ। তাই এদেশের নিষ্ঠাবানদের মহলে ওকে দাঁড় করাতে ভয় করি। তবুও ছবিগুলোর মধ্যে এমন কিছু কিছু আছে যাকে দেখে আচারী লোকেরা হুঁকোর জল ফেলে দেবে না। দেখে শুনে নেবেন, নইলে আমাকে নিয়ে চণ্ডী-মণ্ডপে চঞ্চলতার সঞ্চার হবে। আরো দেখতে হবে এমন ছবি, যাকে আমার কালীঘাট থেকে আপনাদের কালীঘাটের কালীর হাতে নিবেদন করলে নিতান্ত বলিদানের আশঙ্কা থাকবে না। অর্থাৎ যাতে নিরাপদে ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় সে ভার আপনাকেই নিতে হবে। মহুয়ার জন্যে আমার খাতায়

আঁকা দুই একটা রঙীন ছবি ইউ রায়দের কারখানায় তৈরী হয়েই আছে। দেখতে পারেন, কিন্তু সেগুলি খাতার পাতায় যদৃচ্ছাকৃতভাবে রচিত হয়েছিল। করুণার কাছে খোঁজ করে দেখবেন। ইতিমধ্যে ২৪ নবেম্বর ১৯৩১

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকি নে— দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনকরাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি— তারা অনাহূত এসে হাজির— রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন, তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন,— নামাশ্রয়হীনাকে নামের

আশ্রয় দিন। অনাথাদের জন্যে কতো আপিল বের করেন অনামাদের জন্যে করতে দোষ কি। দেখবেন যেখানে এক নামের বেশি আশা করেন নি সেখানে বহুনামের দ্বারা ছবিগুলো নামজাদা হয়ে উঠ্‌বে। রূপসৃষ্টি পর্য্যন্ত আমার কাজ তার পরে নামবৃষ্টি অপরের। কখনো কখনো নাম করবার উদ্যোগ আমরা নিজেই করি। জনরব এই যে রবীন্দ্রনাথ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিজের চেষ্টায় নিজের নাম উঁচু করে তুলচেন। যাতে নাম হয় এমন কিছু কিছু কাজ করেছি,— অবশেষে উনসত্তর বছরের পরে বাংলাদেশে বিস্তর কাঠখড় দিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে এক জয়ন্তী সাজিয়ে নিজের নামমহিমাকে পাকা করবার জন্যে সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি রেখে গেলুম। যখন আমার জীবনী বের করবেন আমার এই চরম চাতুরীটার কথা উল্লেখ করতে ভুল্‌বেন না— দেশের অনেক চতুর অন্তত মনে মনেও আমাকে বাহবা দেবে। বাংলার ভাবী কবিদের কাছে স্বনামসৃষ্টিপদ্ধতির একটা অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া গেল। ইতি ২ পৌষ ১৩৩৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৪

২৯ জুন ১৯৩২

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার

আপনার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হলুম। দুর্গতির আজ বন্যা বয়েছে পৃথিবীতে, আমার আর বিশেষ করে নালিশ করবার নেই। নিজের সাধ্যসীমার মধ্যে প্রয়োজন-সঙ্কোচ করে জীবনধারণ করবার সাধনা ভালোই— আমি তার জন্যে আনন্দে প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু এমন অপঘাত এসে পড়ে যাতে বেড়া ভেঙে যায়। মীরার ছেলে নীতু লাইপ্‌জিকে ছাপার কাজ শিখছিল, খবর এসেছে তাকে ক্ষয়রোগে ধরেচে। মীরাকে যেতে হচ্চে জর্ম্মনিতে। এই দুঃখাভিঘাতের জন্যে কোনোদিকেই প্রস্তুত ছিলাম না। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা বাড়িটা ভাড়া দেবার চেষ্টা করেছিলেম। আনন্দবাজার পত্রিকা সম্প্রতি একটি রোটারি প্রেস কিনেছেন, সেইটে বসাবার জন্যে তাঁরা ওটা মাসিক চারশো টাকায় ভাড়া নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। শেষ মুহূর্ত্তে বিচার করে বল্‌লেন, জায়গাটা ব্যবসায়ের পক্ষে উপযুক্ত নয়। জমিদারী ছাড়া প্রায় আমার সমস্ত আয় বিশ্বভারতীর। সেইজন্যে শেষ কালটায় লেখার ব্যবসা ধরতে হোলো। কিন্তু এ আমার সম্পূর্ণ সইবে না— কেননা লেখার শক্তিতে এখন আমার আর বেগ নেই— লিখতে ইচ্ছেও করেনা— লেখা বেচতে আরো অপ্রবৃত্তি।

দুর্দ্দশার কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলুম এই জন্যে, পাছে আপনি মনে করেন আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যবহারে কোনো বিকৃতি ঘটেছে।

দৈন্য পৃথিবীর অধিকাংশ জনতার সঙ্গে মানুষকে সমানক্ষেত্রে নাবিয়ে আনে। বস্তুত তাদের চেয়ে জীবিকার সুযোগ আমরা অধিক পেয়েছিলুম দৈবগতিকে, নিজ গুণে নয়। সেইটে বুঝতে পারা ভালো— এবং বুঝতে পেরেও মনের শান্তিরক্ষা করা চাই। সকলের চেয়ে দুঃসহ দৈন্য অন্তরের, সেইটে থেকে রক্ষা পেলেই জীবন সার্থক মনে করব।

কেদার এলে তার সঙ্গে ছবির বই ছাপানোর পরামর্শ করতে হবে। ইতি ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫
২৬ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ খড়দহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল এখানে এসেচি। আশ্রমে যাবার পূর্ব্বে যদি এখানে আসতে পারেন তাহলে আলোচ্য বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ হতে পারবে। আশ্রমে আশা আছে সেখানে

গেলে আপনার যত্নের ত্রুটি হবে না। মীরাও এখন সেখানেই। সেই ছবির বইয়ের সম্বন্ধে বুবা কি কিছু চিন্তা করচে? ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৬
২১ এপ্রিল ১৯৩৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার প্রেরিত বইখানি পেলুম। পৃথিবীতে যুগান্তর এলো। তার লক্ষণ য়ুরোপে দেখা দিচ্চে। কারণ য়ুরোপে মানুষ ভালোয় মন্দয় বেঁচে আছে সম্পূর্ণরূপে।

অতীত ইতিহাস যদি সন্ধান করি তবে দেখতে পাব, কী আর্থিক কী সামাজিক পদ্ধতি মানবসংসারে একটানা চ'লে আসে নি। এক মহাভারত আলোচনা করলে তার যত পরিচয় পাই তেমন কোনো একখানা বইয়ে পাওয়া যায় না। যে সব রীতি সব শেষে পরিণত হয়েচে তাই যে সব চেয়ে ভালো আমাদের চার দিকে চেয়ে দেখলে সে কথা মানা যায় না।

মানুষ অনেক প্রথা তৈরি করে তুলেচে যা মোটের উপর কাজ-চালানো, অথচ যা নানা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দুঃখকর, এমন

কি, মনুষ্যত্বের অপমানজনক। জীবনযাত্রা যখন সংকীর্ণ পরিধিতে স্তব্ধ হয়ে জটাবহুল ছিল না তখনকার প্রত্যেক রীতি-নীতি ধর্ম্মের নামে সনাতন চেহারা ধারণ করবার শান্ত অবকাশ পেয়েছিল। যেখানে অবস্থা আজও প্রায় সেই রকমই অচঞ্চল, নব যুগের আবর্ত্ত যেখানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি সেখানকার স্থাবরতায় পুরাতন নীতির ভিত্তি কাঁপে নি— সেখানে অবস্থান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে পুরাতন অনুশাসনপাশ ছিন্ন হয় নি। সেই অবস্থার ভাষায় অন্য অবস্থাকে বিচার করা চলে না।

যুরোপে আর্থিক নীতি অনেক দিন থেকেই বিশেষ পন্থায় চলছিল। সেখানে ধনসৃষ্টি ও ধনভোগে ব্যক্তিগত প্রতি-যোগিতাই ছিল প্রবল। তার প্রথম আঘাত লেগেচে গার্হস্থ্যে। গৃহযাত্রায় স্বভাবতই স্ত্রীপুরুষের অধিকার ভাগ আছে। পুরুষের কর্ত্তব্য ধন আহরণ, মেয়ের কর্ত্তব্য সংসারের প্রয়োজনে তার ব্যয়ের ব্যবস্থা। মেয়েকে আর্থিক দিকে পুরুষের অধীন থাকতেই হয়। সেই অধীনতায় পুরুষের ইচ্ছা ও আদর্শের সঙ্গে নিজেকে নম্রভাবে না মেলাতে পারলে সে বাঁচেই না। কিছুকাল থেকে যুরোপে জীবনযাত্রার আদর্শ বহুব্যয়সাধ্য হওয়াতে পুরুষেরা অনেকেই স্ত্রীর দায়িত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। সেখানে ঘর ভেঙে বাসার বিস্তার বেড়ে চলেচে। মেয়েরা তাদের চিরকালের আশ্রয়চ্যুত হয়ে স্বয়ং জীবিকাউপার্জ্জনে বাধ্য হয়েচে। আর্থিক স্বাতন্ত্র্য যে লাভ করে সে স্বভাবতই ভীরুভাবে পরের মন জোগায় না। পাশ্চাত্য মহাদেশে এই অর্থোপার্জ্জনরীতির বিপর্য্যয় ঘটাতেই ক্রমশই স্ত্রীধর্ম্মনীতির

পরিবর্তন স্বতই ঘটে আসচে। এর প্রভাব পুরুষের উপর পড়তেও বাধ্য। তারা অনেকেই গার্হস্থ্যের দায়িত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত, অপর পক্ষে বহুসংখ্যক মেয়েও তাই। এরা উভয়েই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায় অতএব এদের বিবাহ ঠিক কোন্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই নিয়ে সে দেশে আন্দোলনের সীমা নেই।

এর সঙ্গে যোগ দিয়েচে বিজ্ঞান— বিশেষত মনোবিজ্ঞান। স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি পর্যালোচনায় সমস্ত আব্রু সে খসিয়ে দিয়েচে। উপন্যাস নাটক রঙ্গভূমি সব জায়গাতেই মানবপ্রকৃতি আজ অনাবৃত। মানব ইতিহাসের আদি যুগে দেহ ছিল নগ্ন আজ মানুষের মনের রইল না বস্ত্র।

এমন সময় য়ুরোপে এল সর্ব্বনেশে এক যুদ্ধ। অতিকায় মৃত্যু এসে মানুষের মনকে দিয়েছে নির্লজ্জ নির্ম্মম করে। সেই কয় বৎসর বহুসংখ্যক মানুষ এমন এক অনিত্যতার মধ্যে দিন-যাপন করেছে যেখানে সে আজ আছে কাল নেই। মৃত্যু ব্যাপারটা যদিও চির সত্য তবু মানুষ যখন সংসারযাত্রা করে তখন মৃত্যু যেন নেই এইভাবেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মৃত্যুকে কাছে দেখা সত্ত্বেও মৃত্যুকে যদি ভুলে না থাকতে পারে তবে কোনো বিশ্বাস কোনো ব্যবস্থার উপরেই সে বাসা বাঁধতে পারে না। কিন্তু য়ুরোপে এক বৎসর ধরে এত বিরাটরূপেই মৃত্যুকে সামনে রাখতে হয়েছে যে সংসারের সমস্ত স্থিতিপ্রবণ নীতির পরেই তার আস্থা গেছে শিথিল হয়ে। এই সমস্ত কারণ জড়িয়ে মানুষ

আজ আপন অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা একেবারে মূলের থেকে পরখ করে দেখ্‌তে প্রবৃত্ত। যখন মানুষের ছিল সম্পন্ন অবস্থা, তার ভোগের অধিকার ছিল ব্যাপক, তখন পুরাতন নিয়মকে নাড়া দিতে তার ভয় ছিল, পাছে কোনো জায়গায় তার আরামে তার ঐশ্বর্য্যে ভাঙন লাগে— আজ সেই ভয়ের দশা গেছে— যার যার পুরোনো আশ্রয়ের জীর্ণ ভিত্তি থেকে সবাই বেরিয়ে পড়চে। নূতন করে পরীক্ষা করবার ভয় আর রইল না কারো।

য়ুরোপে যে তোলাপাড়া চল্‌চে সে স্বভাবের নিয়মে, বহু লোককে নিয়ে— কেবল বইপড়া কয়েকজন চষমাপরা লেখক পাঠকের সৌখীন বিচার নিয়ে নয়। ভীষণ তাদের আগ্রহ, রুশিয়ার দিকে তাকালেই তা দেখা যায়। এই আগ্রহ সম্ভবপর হোতো না যদি নূতন অবস্থায় মানুষের কাছে একান্ত-ভাবে ধরা না পড়ে থাকে যে, যে-সব বাঁধন একদা ছিল স্থিতির অনুকূলে, আজ তাতে স্থিতির সহায়তা আর করচে না কেবল তা বন্ধনরূপেই আছে। বলা বাহুল্য সেখানেও সনাতনী আছে মানব স্বভাবে। সেও রীতিমাত্রকেই পবিত্র প্রত্যাদেশ বলে মানে। তাদেরকেও সমাজে প্রয়োজন আছে। পরখ করবার দিনে তাদের বিরুদ্ধতাও সত্যের পরিচয়ে সহায়তা করে।

আজ যুগান্তরের দিনে আমরা বইপড়া পণ্ডিতরা অপেক্ষা-কৃত দূরে আছি। জিনিষটাকে কেউ বা দেখচি বন্ধমুক্ত প্রবৃত্তির দিক থেকে, কেউ বা অন্ধদৃষ্টি সনাতনের মোহের থেকে। আমার মন বল্‌চে, নিশ্চিত জানি নে মানুষ কী

করে আপন অপরিহার্য্য সমস্যার সমাধান করে— পাশ্চাত্যে সমূল সমাধানের যে প্রচণ্ড উদ্যম চলেচে সেটা শাস্ত্রিক নয়, সাহিত্যিক নয়, সেটা সামাজিক জীবন মৃত্যুর একান্ত প্রয়োজন-ঘটিত। যদি পরজন্ম থাকে তবে পৌত্র হয়ে জন্মিয়ে তখন ফলাফল দেখে বিচার করব। ইতি ২১ এপ্রেল ১৯৩৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৭

১২ জুলাই ১৯৩৩

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যখন সানফ্রান্‌সিসকোয় বক্তৃতায় আহূত হয়ে গিয়েছিলুম— বোধ হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে— একজন গুপ্তচর আমার হোটেলে এসে আমাকে খবর দিলে যে সেখানকার গদর পার্টি আমাকে হত্যা করবার চক্রান্ত করচে— তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যে এরা কয়েকজন সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করেচে। আমি বললুম, আমি বিশ্বাস করিনে।— সে বল্‌লে তুমি বিশ্বাস করো বা না করো তোমাকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, কারণ, তুমি আমাদের অতিথি। তারা হোটেলে আমার পাশের ঘরে স্থান নিলে। আমি যখন

বক্তৃতা করতে যেতেম তারা আমার সঙ্গেই যেত, বক্তৃতার সময় প্ল্যাটফরমে আমার কাছেই বসত। ইতিমধ্যে একদিন শুনতে পেলুম, হোটেলের লবিতে কয়েকজন শিখদের মধ্যে আমার সম্পর্কে মারামারি হয়ে গিয়েছিল তাই নিয়ে হোটেলের কর্তারা তাদের বের করে দেয়। ঝগড়ার কারণ সম্বন্ধে আমি এই শুনেছিলুম যে, একদল আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, কিন্তু যারা আমার প্রতিকূল তারা বাধা দিতে এসেছিল। সত্য কারণটা কী নিশ্চিত জানবার উপায় ছিল না। সহরে প্রথম যখন এলুম এরা আমাকে বক্তৃতা দিতে ডেকেছিল। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলুম, আমাকে এরা অভ্যর্থনা করে নি, এবং অপ্রসন্নভাবে বসে ছিল— আমার বক্তৃতার ভাব কিছু বুঝতে পেরেছিল কিনা জানিনে, বোধ হয় পারে নি। এদের এই অদ্ভুত আচরণ নিয়ে পিয়র্সনের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। সে-বার আমেরিকায় আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল ন্যাশনালিজম্। পাশ্চাত্যে প্রচলিত ন্যাশনালিজ্‌মের বিরুদ্ধে আমি বলেছিলুম। পিয়র্সন অনুমান করেছিলেন হয়তো সেটা গদরদলের অনুমোদিত ছিল না। যাই হোক তারপরে এদের সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নি। না হবার একটা কারণ, আমার রক্ষকদের কাছ থেকে এরা বাধা পেয়েছিল। কোনো ভারতবর্ষীয় দল আমাকে হত্যা করবার সঙ্কল্প করেছে একথা শেষ পর্য্যন্ত আমি বিশ্বাস করতে পারি নি,— যারা আমাকে রক্ষা করবার উপলক্ষ্যে সর্ব্বদা আমার অনুসরণ করত তাদের প্রতি আমি বারম্বার বিরক্তি প্রকাশ করেছি। সানফ্রান্সিস্‌কোর

কাজ শেষ করে যখন লস্ এঞ্জেলিস্-এ গেলেম তখনো এরা আমার সঙ্গে ছিল, কিন্তু আমার অগোচরে।

আমার কর্ম্মজাল আমার পক্ষে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন হয়ে উঠেচে। বিশেষত সম্প্রতি অমিয় অক্ষম হয়ে আমাব বোঝা তুর্ব্বহ করে তুলেচে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত কর্ত্তব্যের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নেবার চেষ্টায় আছি। লেখনীটাকেও তাল্লাক দেবার সময় উপস্থিত হোলো। ইতি ২৮ আষাঢ় ১৩৪০

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৩

১৬ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"তুমি আমাদের পিতা" গানটির স্বরলিপি আছে বলে জানিনে। দিনু আজকাল জোড়াসাঁকোয় থাকে কেউ গিয়ে যদি তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারে তো সহজ হয়। সুরটা শিখতে দেরি হবে না। নইলে অনাদির ঠিকানা যদি বের করতে পারেন সে শিখিয়ে দেবে। অনাদি বোধ হয় সঙ্গীত সম্মিলনীতে গান শেখায়।

আপনি উপাসনার আরম্ভে একটি কবিতা চান, গীতাঞ্জলি

বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় ৪৯ সংখ্যক কবিতাটি বোধ হয় কাজে লাগতে পারে। সেটা ছেলেদের জন্যেই লেখা।

...র কাছ থেকে ছবি উদ্ধার করা অসম্ভব হবে। আমাদের অনেক ছবি তার রসিদ সত্ত্বেও পাওয়া গেল না। চিঠি লিখ্‌লে উত্তর পাবার আশা নেই। কিশোরীকে বলে দিয়েছি কলকাতায় গিয়ে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিশোরী সম্প্রতি গিরিডিতে— তার স্ত্রী অসুস্থ। আশা করি শীঘ্রই কলকাতায় যাবে। ছবিগুলোর জন্যে উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে। অবশেষে কি আদালতের শরণ নিতে হবে?

আমরা এই মাসের শেষভাগে সিংহলে যাবার উদ্যোগ করচি। স্বদেশে অন্নসংস্থানের আশা নেই। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৯
১৯ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১৯১৬ থেকে ১৭ খৃষ্টশক পর্য্যন্ত আমেরিকায় বক্তৃতায় নিযুক্ত ছিলুম। সেই সময়ে সংবাদপত্র যোগে খবর পাওয়া যেত,— মহাত্মাজি অসহযোগ প্রচার করচেন। এ কথা স্বীকার

করব, আমার সেটা ভালো লাগে নি। তার কারণ, যেমন খিলাফতের লক্ষ্য ভারতবর্ষের বাইরে, অসহযোগের লক্ষ্য প্রায় তাই। ইংরেজরাজের সঙ্গে কোমর বেঁধে সহযোগই চালাই বা অসহযোগই জাগাই, তাতে আমাদের সাধনা কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়। ওটা কলহমাত্র, সেই কলহের পরিণামে সার্থকতা নেই। মহাত্মাজি দেশের লোকের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অতবড়ো প্রভাব অপর পক্ষকে তারস্বরে অস্বীকার করবার নঙর্থক উদ্দেশে খরচ হয়ে যাচ্চে, এই কথা কল্পনা করে আমার মন পীড়িত হয়েছিল। সেদিন আমার মনে এই একান্ত কামনা জাগছিল যে মহাত্মাজি নিজের চারদিকে দেশের বিচিত্র শক্তিকে আহ্বান করবেন দেশের বিচিত্র সেবার কাজে। কারণ, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য পূর্ত্তকার্য্য বাণিজ্য— এই কর্ত্তব্য-গুলিকে প্রবল বলে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করাই যথার্থ দেশকে লাভ করা, জয় করা। সকলে মিলে কেবল চরকায় সুতো কাটায় দেশচিত্তের সম্পূর্ণ উদ্বোধন হতে পারেই না। জানি এই সংকল্পে বাধার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল— তখন সেই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করা সার্থক হোতো। এত দিন ধরে সংগ্রাম তো যথেষ্টই হোলো, দুঃখের তো অন্ত নেই। তার পরিবর্ত্তে আজ রক্তহীন সাদা কাগজ পাওয়া গেল। সেই কাগজে শূন্যতা যথেষ্ট কিন্তু রচনা কতটুকু ?

সেই সময়ে আমি জগদানন্দকে যে চিঠি লিখেছিলুম আমাদের কোনো প্রাক্তন ছাত্র সেটি কপি করে রেখেছিল। আজ দৈবাৎ সেই কপি আমার হাতে পড়েছে। লেখাটি

আপনার কাছে পাঠালুম। প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে যদি মনে করেন তবে ছাপাবেন। সংক্ষেপে আমার বলবার ছিল এই যে পরের সঙ্গে অসহযোগ নিয়ে আন্দোলন না করে নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগের জন্যে দেশের বহুধা শক্তিকে একত্র করতে পারলে তাতে স্বরাজের যে রূপ অভিব্যক্ত হোতো, সেই রূপটি হোতো সত্য। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২০

১১ মে ১৯৩৪

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার টেলিগ্রাম পেলুম। রাশিয়ার চিঠির তর্জমা ছাপবেন, আপত্তির কোনো কারণ নেই।

এখানকার লেকচারের কথা লিখেচেন, শুনে দুঃখ বোধ হোলো। একসময় কথা মুখে বাধত না, তখনো বয়স যে বিশেষ অল্প ছিল তাও নয়, কিন্তু বুদ্ধিটা তখনো ছিল বিকেল বেলাকার পড়ন্ত রৌদ্র, কাজ চালাবার চেয়েও কিছু বেশি। অল্প দিনের মধ্যেই বেশ একটু ঝাপসা হয়ে এসেছে। নদীতে দেখা যায় এক এক সময়ে দেখতে দেখতে দীর্ঘ চর পড়ে যায়। আমার সেই অবস্থা, বাণীর ধারা অনেক দূর পিছিয়ে গেছে।

বক্তৃতা (বিশেষত ইংরেজিতে) লিখতে বসতে মন একান্ত নারাজ হয়ে ওঠে। চীনে মালয় দ্বীপে পরীক্ষা করে দেখেছি, মুখে মুখে যা বলা যেত লিখিত ভাষার সঙ্গে তার বর্ণভেদ প্রায় ছিল না। এখন প্রতিদিন দেখি বোবা মনের ডাঙাগুলিই কলকথাস্রোতের উর্দ্ধে মাথা তুলে উঠচে। তাই পুরোনো লেখা জুড়ে তেড়েই কাজ চালাই। অধিকাংশের কাছেই তা পুরোনো নয়, দৈবাৎ ধরা পড়ি। বলবার কথা তো এখন শেষ হয়ে এসেছে তাই পুনরাবৃত্তি করলে অন্যায় হয় না। সেই কাজ করেই শেষ পর্য্যন্ত কাজ চলে যাবে। এখনকার বক্তৃতা পূর্ব্বতন কালের উচ্ছিষ্ট, কোন্ লজ্জায় পাঠাব আপনার কাছে।

বিষম ব্যস্ত করে রেখেচে। এখানকার বিবরণ যদি অনিলকে দিয়ে লেখাতে পারি পাঠিয়ে দেব।

আষাঢ়ের জন্যে সময় পেলে একটা কবিতা পাঠাব। — বুবার লেখা প্রবন্ধটি (বাংলা আর্টের পরিণতি সম্বন্ধে) এখানে বিশেষ কাজে লেগেচে— লেখাটা ভালো লাগল। ইতি ১১ মে ১৯৩৪

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২১

১০ জুলাই ১৯৩৪

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে ইংরেজি কবিতাটি পাঠিয়েচেন সেটি আমারি লেখা তাতে সংশয় নেই— এক সময় ঐ রকম ইংরেজি ছন্দের পরখ করতে কৌতূহল হয়েছিল। গোটাকয়েক লিখেছি। কিন্তু পরের ভাষার কাছে অপরাধী হবার সঙ্কোচ আমার মন থেকে কিছুতেই যায় না— সেইজন্যে এগুলোকে বর্জ্জনীয় ভাবেই ফেলে রেখেচি। এই কবিতাটি আপনাদের পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হয় তো ছাপাতে পারেন। অন্যগুলো যে কোন জীর্ণ খাতায় সমাধিস্থ হয়ে আছে আমার মনেও নেই।

Supreme Man বলে একটা প্রবন্ধ আজকালের মধ্যেই পাঠাব— যদি মনঃপূত হয় Modern Reviewতে ছাপতে পারেন।

প্রবাসীর জন্যে যে কবিতা পাঠিয়েছিলুম তার প্রুফ পাই নি। ইতি ২৫ আষাঢ় ১৩৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২২

৭ জানুয়ারি ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাকে যে অনুরোধ করেছেন তা আমার পক্ষে অসাধ্য দুই কারণে। আমি প্রতিদিন অনুভব করচি যে জনসঙ্ঘের মধ্যে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করা আমার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক। এতে প্রত্যেক বারে আমার মূলধনের যে ব্যয় হয় এ বয়সে তার আর পূরণ হবার আশা থাকেনা। ইতিপূর্ব্বে কম্যুনাল এওয়ার্ড সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছি তাই আপনারা ব্যবহার করবেন, আমি কিন্তু নিষ্কৃতি চাই।

আমার দ্বিতীয় কারণটি দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক আমার পূর্ব্ব কারণের প্রতিবাদ। বহু পূর্ব্ব হতে "প্রবাসে" অর্থাৎ বাঙলার বাইরে, জড়িয়ে পড়েচি কর্ত্তব্যদাবীর জালে। ইংরেজিতে বক্তৃতা লিখ্‌তে বা সঙ্কলন করতে হবে। বর্ত্তমানে বাংলা লেখার কাজেও আমার লেখনীকে ঠেলাঠেলি করতে হয়—তার মধ্যে যে starter ছিল সেটা এখন অচলপ্রায়— তার উপরে, ইংরেজি লেখার কাজে মনকে অনেক দেলাশা দিয়ে তবে একটু নড়াতে পারি। আসলে কর্ত্তব্যটা হয় তো তত ভারি নয় যত ভারি তার দুশ্চিন্তা। এই সকল ব্যাপারে মনটা উদ্বেজিত হয়ে আছে— কাজ করতে হয় সমস্ত দিন, এমন কাজ যা নেহাৎ দায়ে পড়া।

আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না, এবং প্রসন্নমনে আমাকে ছুটি দেবেন। ইতি ২২ পৌষ ১৩৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৩

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রদর্শনী সম্বন্ধে সমালোচনাগুলি পড়ে মনে হোলো অমিয়র চিঠি না ছাপানোই ভালো। হয়তো ওতে অবিচার করা হবে, অন্তত ঝগড়ার সূত্রপাত হতে পারে। অমিয়ের পত্র অনুসারে যাঁরা কিছু বলেন না অথচ ছবিগুলিকে নিন্দনীয় মনে করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমতের মূল্য কী তা তো জানি নে। এ সকল ব্যাপারে মতবিরোধ অনিবার্য্য অতএব কোনো এক পক্ষের মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কিছু বলা ন্যায়সঙ্গত হবে না। গত মাসের প্রবাসীতে এটা ছাপা হয় নি ভালোই হয়েছে।

আমাকে সত্বর পশ্চিম প্রদেশের আমন্ত্রণে বেরতে হবে। অল্পবয়সে ভ্রমণে বের হবার জন্যেই ঔৎসুক্য ছিল, সব-সময়ে সুযোগ ঘটত না, এখন ঠিক তার বিপরীত। বড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে লিখেছিলেন— "পায়ে শিক্লী মন-উড়ুউড়ু কিন্তু

পাথেয় নাস্তি"— এখন আমার মনেই বন্ধন, পায়ে টান লেগেছে, পাথেয়ও জুটল। এবার এখানে নববসন্তের আমন্ত্রণটা ব্যর্থ হবে। ভালো লাগে না এই মনে করে যে, ঋতুরাজের প্রাঙ্গণে বার্ষিক বিদায় আর তো বড়ো বেশি জুটবে না। ইতি ১৯ মাঘ ১৩৪১

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ পর্য্যন্ত আমার বক্তৃতার রিপোর্ট ঠিকমতো হোলোই না। সভার মধ্যে রিপোর্টারকে দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। বর্ত্তমান যুগের অনেক উপদ্রবের মধ্যে এই উপদ্রবও অনিবার্য্য। নিজের গান আমাকে শুনতে হবে দলিত অবস্থায়, নিজের কথা আমাকে পড়তে হবে বিকৃত ভাষায় এ আমার ললাটের লিখন। কিছু কাল পূর্ব্বে সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেম, আমার নিজের ভালো লেগেছিল অন্য অনেকেরও। একান্ত আশা করেছিলুম, সেটার রিপোর্ট হবে না, হওয়া দুঃসাধ্য ছিল। অবশেষে কাগজে যখন দেখলুম তাকে, হাঁসপাতালে অপঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো, তার থেকে যে

আঘাত পেয়েছিলুম সামলে উঠ্‌তে সময় লেগেছিল। এই সব ক্ষত বিক্ষত পদার্থকে সংশোধন করা আমার মতো কুঁড়ে লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমি জানি এ সম্বন্ধে আমার নিজের বিশেষ ভাষা ও ভঙ্গীই আমার প্রধান শত্রু। রিপোর্টের ছাঁচের মধ্যে তাদের শোচনীয়তা ঘটে। যত ভালোই হোক্ সব কথাই যে ধরে রাখতে হবে এমন অত্যন্ত গরজ নেই— কিন্তু যে কটা কথা থাকে সুস্থ অবস্থায় থাকলেই বাঁচি।

কলম্বোর কলাসদনে যখন বক্তৃতা দিয়েছিলেম তখন রিপোর্টার ছিল এবং যে রিপোর্ট তারা বানিয়েছিল সেটা তাদেবি যোগ্য। এটাকে আমি বর্জ্জন করেছিলুম কিন্তু আমাকে অপদস্থ করবার জন্যে কে এই ছেঁড়া জিনিষ আমার অগোচরে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। ওটা নিতান্তই অপ্রকাশ্য— ওকে জাতে তুল্‌তে গেলে যে শুদ্ধির প্রয়োজন তৎপরিমাণ ধৈর্য্য আমার নেই। আপনার সম্পাদকীয় নিমতলার ঘাটে ওটাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেবেন। জিনিষটার ভিতর এমন কিছুই নেই যাতে করে ওর অবলুপ্তিতে কোনো অনু-শোচনার কারণ ঘটতে পারে।

সম্প্রতি লেখনীর কাজে আমার নিরতিশয় বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে। হয় তো আমার শেষ আশ্রম এইরকম লেখাবিরল অবস্থাতেই কাটবে। কবিতার তহবিল শূন্য হয়ে গেছে। ফসলের শেষ কুড়ানি একটা বইয়ের মধ্যে মরাইজাৎ হয়েছে— আমার জন্মদিনের মধ্যে সেটা বেরবার কথা। অনেকগুলি চিঠি আমার দপ্তরে জমা হয়েছে, তার মধ্যে আত্ম্য অনাত্ম্য

নানা কথারই আলোচনা আছে। যদি সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন তবে তার থেকে অনেক কালের রসদ জোগাতে পারব— কিন্তু নতুন লেখার দিকে মন একটুও ঝুঁকচে না, ছুটির জন্যে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছি।

আশ্রমের বন্ধুরা জন্মোৎসবের আয়োজন করচেন। সেটা তাঁদেরই কৃত্য, আমার তাতে কোনো হাত নেই। ইতি ১৩ই বৈশাখ ১৩৪২

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৫

২০ জুন ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি প্রবাসীতে যে লেখার কথা উল্লেখ করেছেন তাতে বিশেষ কিছু ক্ষোভের বিষয় আছে বলে লক্ষ্য করি নি। কোনো লেখকের কোনো বক্তব্য বিষয় অপ্রিয় হলেও সেটা যদি অন্যায় না হয় তবে তা নিয়ে বিচলিত হওয়া উচিত বোধ করিনে। সাহিত্যে অসৌজন্য ও বিদ্বেষবুদ্ধি বা অসরলতাই নিন্দনীয়।

অনিল কাল কলকাতায় যাচ্চে সেখানে আপনার হাতে একটা কোনো তর্জ্জমা হয় তো দিতে পারবে। ইতি ২০ জুন ১৯৩৫

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৬

২৬ জুন ১৯৩৫

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে কবিতাগুলিব ইংরেজি তর্জ্জমা পাঠিয়েছিলেন তার অধিকাংশই আমার Fugitive বইয়ে আছে। ওর মধ্যে একটি ছিল যেটি ব্যবহারে লাগানো চলে। আপনি জানেন নিজের ইংরেজি বিদ্যের উপরে আজও আমার শ্রদ্ধা জন্মায় নি— সেই জন্যে সেটা তর্জ্জমার জন্যে সুরেনকে দিয়েছিলুম। কাজের ভিড়ে করে উঠতে পারি নি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে তখনি একটা অনুবাদ লিখে আপনাকে পাঠিয়েছি— চলনসই হোলো কিনা বিচার করবার যোগ্যতা আমার নেই। দেরি হয়ে গেল বলে লজ্জিত আছি।— আপনি সুরেনকে যদি একখানি চিঠি দেন তাহলে নিঃসন্দেহই তার কাছ থেকে অনুবাদটি পাবেন। ইতি ২৬ জুন ১৯৩৫

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৭

৮ জুলাই ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জর্ম্মনিতে আমার বই বিক্রি সুরু হয়েছিল প্রবল বেগে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অবশেষে যখন হিসাব মেটাবার সময় এল তখন মার্কের এমন অধঃপতন হোলো যে তাকে টাকায় পরিণত করতে গেলে এক আঁজলাও ভরে না। সমস্ত আয় জর্ম্মনিকেই দান করে এলুম। তার মূল্য যদি হ্রাস না হোতো তাহলে বিশ্বভারতীর জন্যে আজ আমাকে ভিক্ষের ঝুলি বয়ে বেড়াতে হোতো না। আজ আমার বই সেখানে কী পরিমাণে বিক্রি হয়, এবং তার গতি কোন্ পথে আমি কিছুই জানি নে। এইটুকু জানি আমার তহবিলে এসে পৌঁছয় না। সেজন্য দুঃখ করে ফল নেই, কেননা লাভের অঙ্ক বেশি হবার প্রত্যাশা করি নে,— বস্তুত য়ুরোপের হাটে আমার বই বিক্রির মুনফা তর্কের অতীত, হিসাবের খাতাটা দর্শন শ্রবণের অগোচরে। আমার পক্ষে হিট্‌লারের প্রয়োজনই হয় না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে একদা এমন দিন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞমহলে তাঁদের কাব্যের প্রচার হলেই খুসি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তখন একজন কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল সর্ব্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করা। পাই কোথায় তেমন রাজা। এমন যদি হোতো সাধারণের মধ্যেই

শক্তি ও ভক্তি অনুসারে যাঁর যখন খুসি পরিতোষ প্রকাশের জন্যে কবিকে পারিতোষিক পাঠাতেন তাহলে কপিরাইট আগলানোর মতো বণিগ্‌বৃত্তি সরস্বতীর মন্দিরে অশুচিতা বিস্তার করত না। রুচিও আছে রৌপ্যও আছে জনসমাজে এমন সমাবেশ দুর্লভ নয় অথচ তাঁরা দুটাকা পাঁচশিকার পরিমাণেই তাঁদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেন— তার ফলে যাঁদের রুচি আছে অথচ সামর্থ্য নেই দণ্ডটা তাঁদেরই নিষ্ঠুরভাবে ভোগ করতে হয়। বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্ব্বরতা এ কথা মানতেই হবে।

অন্তরতর শব্দের প্রয়োগ বেদে পাওয়া যায়, যথা,

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

জ্যোতিদাদার গানেও এই অন্তরতর শব্দের প্রয়োগ আছে, প্রয়োজন অনুসারে আর একটু সুর চড়িয়ে এই তরকেই আমি তম করেছি। ইতি ৮ জুলাই ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৮

২৯ অগস্ট ১৯৩৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সাদর নমস্কার সম্ভাষণ

এখানকার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ-চেষ্টায় ছিলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমারও দুঃসময়। কিছু দিতে পারছিলুম না বলে মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ছিল। এমন সময় দেশ ও আনন্দবাজারের দুই সম্পাদক পূজার সংখ্যার দুটি কবিতার জন্যে একশো টাকা বায়না দিয়ে যান, সেই টাকাটা বন্যার তহবিলে গিয়েছে। আগেকার মতো অনায়াসে লেখবার ক্ষমতা এখন নেই। সেইজন্যে বিস্ময় কবিতাটা দিয়ে ওদের ঋণশোধ করব বলে স্থির করেছি। ক্লান্ত কলম নতুন লেখায় প্রবৃত্ত হতে অসম্মত। কার্ত্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে একটি কবিতা দিয়ে অন্যটি হস্তান্তর করা ছাড়া আমার উপায় নেই। কিছুদিন থেকে শরীর বিশেষভাবেই অসুস্থ হয়েছে সাধারণ ক্লান্তির চেয়ে অনেক বেশি।

শান্তি একটি গানের স্বরলিপি আপনাকে পাঠিয়েছে— সেটার সংশোধন আবশ্যক। শান্তিকে বলে দিয়েছি সংশোধিত স্বরলিপি অবিলম্বে আপনাকে পাঠাতে।

আপনার শরীর এখন সুস্থ হয়েছে আশা করি। ইতি

২৯ অগস্ট ১৯৩৫

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৯

১০ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

আমার মনে হয় চিরকুমারসভার ইংরেজি করা অসম্ভব। তার ব্যঙ্গ, তার শ্লেষ, তার সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত বেশি বাঙালি। বাংলা দেশে শ্যালী ভগ্নীপতির সম্বন্ধ অনন্যসাধারণ, এমন কি, ভারতের অন্যত্রও নেই। অন্য প্রদেশের পাঠক এই ব্যাপারকে আপত্তিজনক বলে মনে করতে পারে। তা হোক, সুরেন যদি তর্জ্জমা করে তুলতে পারে আমি তাতে কোনো আপত্তি করবনা। আমি তাকে চিঠিও লিখে দিচ্চি। আমার বিশ্বাস "শেষের কবিতা" যদিও দুরূহ তবু সেটার তর্জ্জমা একেবারে অসম্ভব না হতে পারে— ইংরেজি জানা পাঠকের কাছে এর রস অধিগম্য হতেও পারে— কিন্তু চিরকুমার সভার গোড়াকার কথাটাতেই ওরা হুঁচট খাবে। হয় তো এ সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করে দিলে জিনিষটা কৌতুকাবহ হতেও পারে।— আমাদের দেশের একজন সাহিত্য অধ্যাপক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আমার লেখায় যথার্থ হাস্যরস নেই, দৃষ্টান্তস্থলে চিরকুমার সভারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গীতিকাব্য লেখকদের কলম হাসতে ও হাসাতে পারেনা— অতএব সাবধান হবেন। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩০

১৪ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ও আমার অনুরোধ জানিয়ে সুরেনকে পত্র লিখেছি— তার জবাব পাই নি। সম্প্রতি সুরেনের বৈষয়িক অবস্থা অত্যন্তই কঠিন হয়ে উঠেছে, খুব সম্ভব সেইজন্যে অন্য কিছুতে সে মন দিতে পারচে না।

কৃপালানি "শেষের কবিতা" তর্জ্জমায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। প্রথম অংশ কতকটা করেছে, মনে হয় তো ভালোই হয়েছে। তার কবিতা তর্জ্জমার ভার আমাকেই নিতে হয়েছিল। গোটা তুয়েক করেও দিয়েছি। এ কাজ তাকে খুব ধীরে ধীরে করতে হয়, প্রথম কারণ তর্জ্জমা করা সহজ নয়, দ্বিতীয় কারণ বাংলা ভাষায় তার দখল কাঁচা। এক সুবিধে ইংরেজি ভাষায় তার কলম চলে সহজে— অমিত রায়ের মতোই সে অক্সোনিয়ন। আপনি তাকে অনুরোধ করলে হয় ত সে কাজটা সম্পন্ন করতেও পারে— বলতে পারিনে। এখন সে ছুটিতে আছে।

আজকাল আমার মন সকল প্রকার কর্ম্মধারা থেকে সরে এসেছে— ডাঙায় তোলা জীর্ণ নৌকোর মতো, অতি লঘু দায়িত্বও স্বীকার করতে সে নারাজ— দিনাবসানের ম্লায়মান আলোটুকুকে রেখেছি নিষ্কৃতির সন্ধানে। ইতি ১৪ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১

১৭ অক্টোবর ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একটা কবিতা এলো মাথায় এবং মাথা থেকে কলমের মুখে— গভীর জল থেকে হঠাৎ যেমন মাছ ধরা পড়ে বঁড়শিতে —পাঠাই প্রবাসীর দরবারে।

সুরেন লিখেছে, চিরকুমার সভায় পদে পদে গান এবং শ্লোক, অনুবাদের পক্ষে ওগুলো সহজসাধ্য নয়। "শেষের কবিতা" তর্জ্জমা করতে সুরেন রাজি ছিল কিন্তু সেটা আমার সম্মতিক্রমে কৃপালানি অনেকটা সেরে ফেলেছে। আপনি অনুরোধ করলে সুরেন হয় তো দুই বোন, মালঞ্চ অনুবাদ করতে পারে— ওর দ্রুত কলমে বেশি সময়ও লাগবেনা। তর্জ্জমা করতে নিজেই কোমর বাঁধব এমন পালোয়ানি আমার কাছ থেকে এখন আর আশা করবেন না। গ্রীষ্মে কুয়োর জল অনেক নিচে নেবে গেলে টেনে টেনে জল তুলতে যেমন দম নিক্‌লিয়ে যায়— লেখার প্রয়োজনে কথার জোগান দেওয়া আমার পক্ষে তেমনি দুঃসাধ্য হয়েছে। ইংরেজি কথার তো কথাই নেই। বাল্যকালে ইংরেজি শিক্ষায় অবহেলা করেছি এ কথাটা মাঝে মাঝে ভুলতে বসেছিলুম— কিন্তু সেই অবহেলিত অশিক্ষিত ইস্কুলপালানে বাল্যবয়স গোপনে লুকিয়ে ছিল, প্রাচীন বয়সের শিথিল শাসনের দিনে বেরিয়ে পড়েছে। যদি কিছু দিনের জন্যে য়ুরোপে যাই তাহলে এই ছেলেটাই কোথা থেকে হঠাৎ

আপন বিলিতি মুহুরিআনা প্রকাশ করবে। হয়ত জাহাজ থেকেই সুরু হবে তার বাহাদুরি। বারবার দেখেছি আমার মনের মধ্যে হাওয়ায়-বাজা একটা যন্ত্র আছে, হাওয়ার হাতে তার সুরের বৈচিত্র্য জাগে। ইতি ১৭ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭২

২ জানুয়ারি ১৯৩৬

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সুরেন অল্প একটু অবকাশ সম্প্রতি পেয়েছে। তাকে মডার্‌ন্ রিভিয়ুর জন্যে অনুরোধ করলে শিক্ষা বা অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করতে দ্বিধা করবে না। এখানে এমন কোনো অধ্যাপককে জানি নে যাঁর লেখনীতে তৎপরতা আছে।

কর্ম্ম এখন আমার পক্ষে বোঝা অথচ তাকে কাঁধের থেকে নামানো অসম্ভব হয়েছে— এদিকে শরীর অপটু, মনও বাহিরের দিকে নেই। ইতি ২২ জানুয়ারি ১৯৩৬

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৩

৪ মার্চ ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একটা কবিতা তর্জ্জমা করে পাঠাচ্ছি। আশা করি এটা গ্রহণীয় হবে।

আপনাদের কাগজে দেখা গেল তদীয় উত্তুঙ্গতা আগা খাঁয়ের আচরণে পূর্ব্বাপরের যথেষ্ট সামঞ্জস্য নেই বলে আভাস দেওয়া হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে এ রকম নিন্দাবাদের কারণ আছে বলে আমি মনে করিনে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সাধনকে পুণ্যকর্ম্মই বলা যায়। বিশ্বমুসলমানীর প্রচেষ্টাও সেই লক্ষ্য অভিমুখে। প্যান ইসলামীয় প্রচেষ্টা ভারত সাম্রাজ্যের অনুকূল নয়। তার অর্ঘ্য রাজদ্বার পেরিয়ে চলে যায়। ইতি ৪ মার্চ্চ ১৯৩৬

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৪

২২ মে ১৯৩৬

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একটা জরুরী কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলে আপনার অনুরোধ রাখতে পারি নি। শুধু তাই নয়, তর্জ্জমা করতে বসেছিলেম কলম গেল ঠেকে। আজকাল প্রায় এমন হয়। বৃহস্পতিবারে কলকাতায় যাব। স্থান পরিবর্ত্তনে যদি বুদ্ধির উদ্যম বাড়ে চেষ্টা করে দেখব। ইংরেজি লেখাটা স্বাভাবিক নয়— বয়স যত বাড়চে এই কথাটা ততই স্পষ্টতর হচ্চে। ইতি ২২ মে ১৯৩৬

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৫

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহিলাদের সম্মেলনে উদ্বোধনের ভার নিতে যদি অনুরোধ করেন তবে আমি প্রস্তুত হব। বড়ো জনতায় সভার কার্য্য পরিচালনা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিকর।

অক্টোবরের ৪।৫ তারিখে কলকাতায় আমার কাজ আছে।

তার দু-চার দিন পূর্ব্বে বা পরে যদি সভার দিন স্থির করেন এবং যদি নিতান্ত অক্ষম না হই, তবে কর্ত্তব্য পালন করব।

কাহিনীতে পরিশোধ বলে যে কবিতা আছে তা গানের সুরে নাট্যীকৃত করেছি। সেটি কপি করে প্রবাসীর জন্যে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সেটি ৪।৫ অক্টোবরে নাট্যসূচিরূপে প্রকাশিত হবে। অন্য সমস্ত কবিতা সম্প্রতি নিঃশেষিত। কবে নূতন লেখার অঙ্কুরোদ্গম হবে বলতে পারি নে। ইতি ১ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৬

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শরীর ভালো ঠেকচে না। টৌন হলে যে দুর্গতি হয়েছিল সে কথা মনে করে উদ্বিগ্ন আছি— মহিলা সম্মেলনের ভিড় এবং কর্ত্তব্যের পেষণ জীর্ণ শরীরে সইবে কী? এখন শরীরে যে ব্যয় ঘটে তা আর পূরণ হবার আশা নেই। মেয়েরা কি আমার পরে দয়া করবেন না। বিশ্বভারতীর অবশ্যসম্পাদনীয় কাজ নিয়ে আমাকে অগত্যা কলকাতায় যেতে হবে, সে কাজের পীড়নটাও কম হবে না কিন্তু এ দায়িত্ব এড়াবার উপায় নেই:

অভাবের দুশ্চিন্তার ভারও যে দুর্ব্বহ। আমার অবস্থার কথা চিন্তা করে আপনি যথোচিত পরামর্শ দেবেন। দোতলায় ওঠানামার কথাটাও বিচার্য্য। শান্তা আমাকে একখানি স্বরচিত গল্পের বই পাঠিয়েছিলেন, সেখানি আমার অগোচরে কোনো সাহিত্যরসলোলুপ কর্ত্তৃক আমার টেবিল থেকে অন্তরায়িত হয়েছে। আমার সেই অনবধানতার জন্যে লজ্জিত আছি। আজকাল আমার ঘরে এ রকম ঘটনা বিরল নয়। জরায় দেহটাও যেমন, মনোযোগটাও তেমনি শিথিল হয়ে যায়। ইতি ৮ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৭

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনাদের অনুরোধ অস্বীকার করা আমার সাধ্য নয়। কলিকাতায় বিচিত্রায় সঙ্গীতভবনের সাহায্যকল্পে পরিশোধ অভিনয় করাতে যাব। আট নয় দশ তারিখ স্থির হয়েছে। তার পরে কোনো একটা দিন আমাকে ডাকবেন। লিখ্‌তে বলেছেন, সময় করে উঠতে পারচিনে, মনও ক্লান্ত। যদি

না লেখা হয় তবে মুখে কিছু বলব, বেশি নয়। ইতি ১১ই আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৮

৫ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অগ্রাণের প্রবাসীর জন্য আমার কবিতার একটি কাটাকুটি-চিত্রিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি। তার সঙ্গে যদিও পূর্ব্বপ্রকাশিত কোনো কবিতার সম্পর্ক আছে তবুও তাকে নূতন বলেই গণ্য করা উচিত। আপনি সেটি বোধ হয় এখনো দেখেন নি।

মহিলা সম্মেলনীর অধিনেত্রীদের দয়া করে জানাবেন তাঁদের সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে মারাত্মক হবে। কারণ বলি। আপনি আমাদের অর্থ দৈন্যের কথা জানেন। এখানে সঙ্গীতবিভাগ আছে, বৎসরে আড়াই হাজার টাকা খরচ লাগে—সেই টাকার সংস্থান করবার জন্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গীতাভিযানে যাত্রা করে থাকি। এবার নানা কারণে বিলম্ব হয়ে গেছে। কোনোমতে ছুটির পূর্ব্বে কলিকাতায় শনি রবি দুটি দিনের ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে স্বয়ং আমাকে আবৃত্তি

প্রভৃতি শ্রমসাধ্য নানা কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে। তার উপরে রবিবারে সভানায়কতা আমার জীর্ণ দেহের পক্ষে অসাধ্য।

আমার অভিভাষণ লিখ্‌তে আরম্ভ করলেম। ভেবেছিলেম মুখে মুখেই বলব— কারণ রিহর্সল প্রভৃতি নানা ব্যাপার নিয়ে সময়ের অত্যন্ত টানাটানি। কিন্তু সভায় যখন উপস্থিত থাকতে পারব না তখন না লিখে উপায় নেই। শাস্তা যদি আমার হয়ে লেখাটি পড়ে দেন তাহলে এবারকার মত প্রাণ নিয়ে নিষ্কৃতি পাই। নিজের অপরিহার্য্য দায় নিয়ে শরীরের উপর যে পীড়ন চল্‌চে তাই আমার পক্ষে দুঃসহ।

যাই হোক যথাস্থানে আপনি আমার আর্ত্তি জানিয়ে ক্ষমা সংগ্রহ করে দেবেন— আমি আর পেরে উঠ্‌চি নে। ইতি ১৯ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৯

৬ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি সীতার ইংরেজি লেখা পড়ি নি। ইংরেজি লেখাকেই আমি ভয় করি। আধুনিক ইংরেজি গল্পরচনার ভাষা আমাদের কাছে দুর্গম— আমরা যে ইংরেজি শিখেছি তার আদর্শ বিস্তর

বদলে গেছে। আমি সেই জন্যে এই দুঃসাধ্য কাজে সহজে হাত দিতে চাই নে। যদি এই সময়ে থাকতুম ইংলণ্ডে, হয়তো ওদের আধুনিক ভাষার ছাঁচটা অলক্ষ্যে মনের ভিতর জমে উঠত। কিন্তু ওদের এখনকার সাহিত্যিক ইংরেজি দূরে থেকে আয়ত্ত করা অসম্ভব। মোটের উপর আমার এই বক্তব্য। বস্তুত আজকাল আমার লেখার ইংরেজি তর্জ্জমার উপর আমার কিছুই আসক্তি নেই— জানি প্রত্যেক ভাষা আপন সাহিত্য-সম্পদ কৃপণের মতো বন্ধ করে বেখে দেয়, ভাষান্তরে তার রস পৌঁছতে দেয় না। দেবেন সীতাকে তর্জ্জমা করতে। আমার আপত্তি নেই।

নারীসম্মেলনে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হবে সে কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি। আমি এখন কৃপার যোগ্য। ইতি ২০ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪০

২০ জানুয়ারি ১৯৩৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজকাল লেখা আমার পক্ষে সহজসাধ্য না হওয়াতে যথাসম্ভব কলম বন্ধ করে আছি। শুধু যে শরীর অপটু তা নয় মনও বিমুখ। লেখার স্রোত ভিতরের থেকে বন্ধ হয়ে আসচে। ভাষার ক্ষীণতায় আমার চিন্তার ধারা এখন আর নৌবাহ্য নয়।

ললিত চাটুয্যে মশায় আমার কবিতা তর্জ্জমা করে থাকেন আমি জানি। বই আকারে সেগুলি প্রকাশ করবার ইচ্ছা জানিয়ে আমার সম্মতি চেয়েছিলেন। না দেবার কারণটা আপনাকে বলি। ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র গুপ্ত আমার কবিতার অনুবাদ ছাপিয়েছিলেন। অসম্মতি দিয়ে তাঁকে ক্ষুন্ন করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলুম। সেটা আমার দুর্ব্বলতা। এ নিয়ে ম্যাক-মিলানরা বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করে পত্র লেখেন— বলেন এর দ্বারা আমার যে অখ্যাতি হয় তাতে আর্থিক দিকেও আমার ক্ষতি ঘটে। আমি নিশ্চিত জানি আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত যাঁরা তাঁদের কাব্যরচনার ভাষা ও রীতি মধ্যভিক্টোরীয় যুগের, এখনকার সাহিত্যবাজারে সে অচল হয়ে এসেছে। মডারন কালের যোগ্যতা পাকা হয়ে উঠতে যথেষ্ট সময় নেবে। আমি নিজে অনুবাদ করতে সাহস এবং উৎসাহ হারিয়েছি। ললিত-বাবুর তর্জ্জমা আপনি মডারন্ রিভিয়ুতে যদি ছাপান আমার আপত্তি নেই— কিন্তু সেগুলি নিয়ে তিনি বই ছাপাবেন এতে

আমি সম্মত হতে পারি নে। তাঁর অনুবাদগুলি তিনি ম্যাক-মিলানকে পাঠিয়ে দিলে তাদের বিচারে যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে কোনো কথাই থাকে না। ইতি ২০।১।৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪২
২৬ জানুয়ারি ১৯৩৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১০ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় যাব, ১৩ই কনভোকেশন। আমার বক্তৃতা বাংলা ভাষায় লেখা। ইতিমধ্যে আপনি এলে দেখা হবে।

বোষ্টমী স্নান করে যখন সিক্ত বস্ত্রে চলে আসছে তার গুরু বল্‌লে, তোমার দেহখানি সুন্দর। সে সময়ে তার কণ্ঠস্বরে ও মুখভাবে যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছিল সেটাতে বোষ্টমীর নিজের মনের প্রচ্ছন্ন আবেগকে জাগিয়ে দিয়েছিল। তাই সে পালিয়ে গিয়ে আপনাকে বাঁচায়। আমার বিশ্বাস গল্পের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি বুঝতে বাধা ঘটে না। ইংরেজি তর্জ্জমায় কথাটা স্পষ্ট হয়েছে কি না জানি নে। ইতি ১৩ মাঘ

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪২
১৯ মার্চ ১৯৩৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অরবিন্দের তিনটে তর্জ্জমার মধ্যে একটা প্রকাশযোগ্য। সেটা অনিল কাল আপনার কাছে রওনা করে দিয়েছে। suggestion শব্দের তর্জ্জমা নিয়ে একদা তখনকার শান্তিনিকেতন পত্রে আলোচনা করেছিলুম। "সঙ্কেত" "ইঙ্গিত"-জাতীয় শব্দের আভাস তাতে ছিল। সুধীর কর কলকাতা থেকে ফিরলে খুজে বের করব। ইতি ১৯।৩।৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৩
২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সিটি কলেজের বিরুদ্ধে সুভাষ বসুর অন্যায় আক্রমণের প্রসঙ্গে তাঁর আচরণের নিন্দা করার অনুরোধ আপনাকে জানিয়েছিলুম কিন্তু তার পরেই মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা সঙ্গত নয়। বিশেষত সুভাষ আগামী কনগ্রেস অধিবেশনে যে পদ

পেয়েছেন তার সম্মান কোনো আলোচনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হবে না। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও অন্যায়কে আমি ক্ষমা করতে পারি নে এ আমার দুর্বলতা। বিধাতা আমাকে ভোলবার অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন কেবল এই ক্ষেত্রেই আমার স্মরণশক্তি কাঁটা গাছ রোপণ করতে ছাড়ে না এটা আমার পক্ষে না আরামের না কল্যাণের। আপনি আমাকে অনুতাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ইতি ২৫।১।৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৪
৯ মে ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্প্রতি আমার নববর্ষের বাচন ও জন্মদিনের কবিতা নিয়ে যে অন্যায় হয়ে গেছে সেটা আমার অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত। যখনি প্রথমে আমার নজরে পড়ল আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম, কিন্তু আকস্মিক দুর্যোগের ত্রুটি সংশোধনের সময় থাকে না। কবিতাটি অল্প পরিমাণে সংশোধিত হয়ে প্রবাসীতে গেছে— সেইটিকেই আমার অনুমোদিত পাঠ বলে গণ্য করবেন। এই সকল কারণেই মাঝে মাঝে আমার খ্যাতি

নিয়ে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখলে আমি নিরতিশয় কুণ্ঠা বোধ করি। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৫

১৬ মে ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রবিরশ্মি বইটা সম্বন্ধে চারুকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে করেছেন তাঁকে নিন্দাই করেছি। ওটা ছাপাবেন না। আমার কৈফিয়তে চারুকে যে চিঠি লিখেছি তার নকল পাঠাই। তাঁর বইটা ক্লাস বইয়েরই মতো হয়েছে, ছাত্রাবস্থা ছাড়িয়েছে যারা এটা তাদের উপযোগী নয় অথচ সেই রকম বইয়ের দরকার আছে। অতিশয় বেশি দিতে গেলে কম দেওয়া হয়। বোধ হয় চারু ক্লাস পড়াবার উপলক্ষ্যেই এটা লিখেছেন সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও থাকলে ভালো হোত। যদি থাকত তা হলে বইটা প্রশংসারই যোগ্য হত।

ঠাণ্ডায় আছি, লোক কম গরমও নেই। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

আপনার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৬

১৮ জুন ১৯৩৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণ

শরীরে মনে শক্তির উদ্‌বৃত্ত দিনে দিনেই ক্ষয় হয়ে আসচে— এই জন্যে দিনকৃত্যের বাইরে এমন কোনো কাজ করতে উৎসাহ পাই নে যা আমার অভ্যস্ত পথের বাইরে পড়ে। আমার মনে ইংরেজি ভাষার শিকড় শিথিল হয়ে গেছে, বাংলা রচনার রাস্তাতেও রথের চাকা বারবার বেধে যায়। ক্লান্ত মনকে তাড়া লাগালে হয়তো কাজ চালাবার মতো খানিকটা পথ এগোতে পারে কিন্তু অত্যন্ত বেশি আপত্তি করে— কোন্‌দিন ধর্মঘট করে বসে এ আশঙ্কা করি। কিছুদিন পূর্বেও আমি জরাকে বিশ্বাস করতুম না, অপটুতার একটু আভাস পেলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতুম। এখন শেষ বয়সের ডিক্টেটরের শাসন মানতে বাধ্য হয়েছি— হাতখরচের মতো সামান্য কিছু রেখে আমার তহবিলে সে শিলমোহর এঁটে দিচ্চে— অত্যাচারটা স্বীকার করতে লজ্জা হয় বলেই কলম চালাতে যাই কিন্তু স্পিংহীন চাকার মতো তার আর্তনাদ উঠতে থাকে।

এখানে শরীর কিছু ভালো হয়েচে কিন্তু প্রাণের উদ্যম এখনো অজয় নদের মতো তটের তলায় তলিয়ে আছে— বর্ষায় ধারায় কিছু স্রোত বাড়ে কিন্তু পণ্য চালাবার মতো নয়।

উপস্থিত কিছু কাজ শেষ করে ছুটির চর্চাতে লাগব ভাবচি অর্থাৎ ছবি আঁকতে বসব— সেখানে আমার খ্যাতির জোয়ার ভাঁটা খেলে না— তাই আরাম পাই। ইতি ১৮।৬।৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৭

২৯ জুন ১৯৩৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণ

আমি তিন চার দিনের মধ্যে নেমে যাব— যথাস্থানে গিয়ে ঝুলি ঝেড়ে দেখব— যদি দেবার যোগ্য কিছু পাই পাঠিয়ে দেব। এখানে পাহাড়ি আষাঢ় জাপানী চালে নির্মম ভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করচে রাস্তা ঘাট দিচ্চে ধ্বসিয়ে— মার এড়িয়ে যাত্রা করতে পারলে নিশ্চিন্ত হব। ইতি ২৯।৬।৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৮

৩০ অগস্ট ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কিছুদিন থেকে নানা কাজে ও অকাজে নিরতিশয় ব্যস্ত ছিলুম এবং এখনো আছি— সেই জন্যেই নোগুচির চিঠির উত্তর এখনো দিতে পারি নি— যত শীঘ্র পারি দেব— ক্লান্তির জন্যে কিছু লেখবার উৎসাহ বোধ করি নে। এদিকে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে হলকর্ষণ বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের জন্যে প্রস্তুত হতে হচ্চে। ইতি ৩০।৮।৩৮

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৯

৯ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে আমার সঙ্কোচ হয় তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে— আটকাবে কে?

৯।৭।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার চিঠি ছাপতে পারেন, আপত্তি নেই। জানাতে পারেন শরৎ কখনো কোনো বিষয়েই আমার পরামর্শ চান নি, আমিও তাঁকে উপদেশ দিই নি। ইতি ১১।৭।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫১

১৭ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শরতের সম্বন্ধে আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা পড়ে অনিল বললেন, যখন এই ঘটনা প্রসঙ্গে কোনো তারিখের উল্লেখ নেই তখন সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল না এ কথা কী করে বলা চলে। আন্দাজে বলেছি বটে কিন্তু এ কথা সত্য যে শরতের খ্যাতি যখন চারিদিকে ব্যাপ্ত তার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। যে ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা চলচে সে যদি তাঁর যশোবিস্তারের পূর্বকার হয় তাহলে এ নিয়ে সন্দেহ করবার দবকার নেই। ইতি ১৭।৭।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫২

১ অগস্ট ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের এখানে হিন্দিভাষী ছেলেমেয়েরা হিন্দি শিক্ষার সুযোগ পায় কিন্তু নিয়ম করেছি তাদের পরীক্ষা দিতে হবে

বাংলা ভাষায়। তাতে ওদের হিন্দি শিক্ষায় শৈথিল্য হচ্চে না অথচ তারা বাংলা শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পাবে না। উত্তর-পশ্চিমে বাঙালী ছেলেদের জন্যে যদি এই নিয়ম চালানো হয় তাহলে আমার তরফ থেকে আপত্তি শোভা পাবে না। আশা করি এই বাধাটুকুতে বাঙালি ছেলেদের পরাভব হবে না। ইতি ১।৮।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৩
৪ অগস্ট ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যাঁদের কাছ থেকে খবর নিতে গিয়েছিলুম তাঁরা আমাকে অসম্পূর্ণ সংবাদ দিয়েছিলেন, অন্তত তাঁদের কথা থেকে আমি এই বুঝেছিলুম যে উত্তরপশ্চিমের বিদ্যালয়ে বাঙালী ছেলেদের জন্য বাংলা শিক্ষার সুযোগ আছে কেবলমাত্র সেখানকার পরীক্ষার ভাষা হিন্দি বা উর্দু। আপনার পত্রে জানা গেল কথাটা বিশুদ্ধ সত্য নয়। অতএব এ সম্বন্ধে মহাত্মাজি বা জহরলালকে কিছু লেখবার দায়িত্ব আমার আছে সে কথা স্বীকার করি। অবসর পেলেই চেষ্টা করে দেখব। ইতি ৪।৮।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৪

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

সেণ্টজেভিয়র্সের রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আপনার সুগ্রথিত অভিভাষণটি পড়ে বিশেষ আনন্দলাভ করেছি। আমার উদ্দেশে আপনাদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধার বাণী আমার জীবনে বিধাতার প্রসন্নতাকে সার্থক করে। ইতি ৪।৯।৪০

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৫

২৯ মার্চ ১৯৪১

২৯।৩।৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিলাত থেকে আপনাকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলুম তাদের মধ্যে অতর্কিতে অহমিকা এসে পড়েছে। সেজন্যে লজ্জিত আছি। যদি আমার পক্ষে তখন চিত্তসংযম সম্ভবপর হোতো, যদি এ সকল পত্রে নিজের অগোচরে অনেক অত্যুক্তি প্রবেশ না করত তাহলে ইতিহাস হিসাবে এর মূল্য বিশুদ্ধ হতে পারত। অপর পক্ষে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারে অভাবনীয় প্রশংসা লাভে নূতন যশস্বীর অনিবার্য চিত্তচাঞ্চল্য মনস্তত্ত্বের ইতিহাস হিসাবে

উপাদেয় হতেও পারে। এইজন্য স্বকৃত কর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিনি।

পাঠকেরা এই চিঠিগুলির মধ্য থেকে] অহঙ্কারের প্রচ্ছন্ন স্বাদ মার্জনা করে নেবেন এই আশা করি।

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৬

৬ এপ্রিল ১৯৪১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

একদা য়ুরোপ থেকে আপনাকে যে সমস্ত পত্র লিখেছিলেম সে সম্বন্ধে সেদিনকার চিঠিতে আমার মন্তব্য কিছু বলেছি, সেটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করে না বললে ভুল ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে। সেই একটি সময় গিয়েছে যখন য়ুরোপের উত্তর প্রান্ত থেকে পূর্বতম প্রান্ত পর্যন্ত জন-মনে আমাকে উপলক্ষ্য করে যে একটি বিস্ময় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তা অভাবনীয়, বোধ হয় ঐ মহাদেশে সে যুগে কোনো কৃতী পুরুষ এমন প্রভূত সমাদরের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন নি। তখনকার মহাযুদ্ধে[র] পরবর্তী য়ুরোপে মনোবৃত্তির মধ্যে যে একটি সর্বজনীন আলোড়ন উপস্থিত

হয়েছিল প্রাচ্য দেশের এই কবির অভ্যর্থনার ভূমিকা ছিল তাই, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ যাই হোক ঘটনাটা ছিল অচিন্তনীয় সুতরাং নিজের মুখে তার আভাসমাত্র দেওয়া অত্যন্ত সংকোচ-জনক। এই আশ্চর্য ইতিহাসটিকে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে বাইরের সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে। মনে আছে এই সময় কৌতূহল-বশত লর্ড সিংহ একবার আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন, জানি তিনি বলেছিলেন যদি তাঁর এ রকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না ঘটত তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রথীন্দ্রনাথ বার্লিনে আরোগ্যশালায় শয্যাগত ছিলেন তাই এত বড় দুর্লভ অভিজ্ঞতার সুযোগ থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে রইলেন। এ দুঃখ আমি কখনো ভুলতে পারব না। আর আমার অন্য স্বদেশ-বাসী যাঁরা সঙ্গে ছিলেন একমাত্র যাঁরাই সাক্ষ্য দিতে পারতেন তাঁরা তখনো নীরব ছিলেন এবং এখনো নীরব আছেন। এমন কি আমার সঙ্গে থাকায় তাঁরাও উন্মুক্ত হৃদয়ের যে অভ্যর্থনা য়ুরোপের সর্বত্র লাভ করেছিলেন তাও আর কোনো ভারত-বাসী এত অন্তরঙ্গভাবে [লাভ] করতে পারে নি। আমি কখনো তাঁদের মুখ খোলবার জন্যে কিছুমাত্র তাগিদ করিনি এবং সাক্ষ্য সমর্থনের অভাবের মধ্যে চুপ করে থাকাই বরাবর শোভন মনে করেছি। এই রকম নীরবতার জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ সেদিন আমার যাত্রাপথে পদে পদে যে প্রবল উত্তেজনা জাগ্রত হয়ে উঠছিল তার মধ্যে সমগ্র

ব্যাপারের একটা স্পষ্ট দৃশ্য দেখতে পাওয়া এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে বলা দুঃসাধ্য ছিল।

আমার জীবনের সেদিনকার এই যে আশ্চর্য ঘটনা সহসা অত্যুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলবার আমি কে? আমিই তো ছিলেম সেই ব্যাপারের উপলক্ষ্য, আমিই তো ছিলেম তার কেন্দ্রস্থলে। যাঁরা অনতিদূরে থেকে সেই দৃশ্য দেখেছেন তাঁরা সে সম্বন্ধে ইচ্ছে করলে বলতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা বলেন নি, অথচ য়ুরোপের সেই বিপুল সমাদর ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্তরঙ্গভাবে তাঁদের [যুক্ত] করে নিয়েছিল। এস্থলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ইতিহাসের কিছুমাত্র আভাস আমার তরফ থেকে দেওয়ায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ হবার আশঙ্কা আছে। অতএব একদিন কোনো মহালগ্নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই যে মিলন ঘটেছিল তার ইতিহাস বা বিবরণ অকথিত থেকে গেল। হয়তো তাই থাকাই ভালো। আমি এ সম্বন্ধে কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করতে একান্ত অনিচ্ছা বোধ করি। কেননা সেদিনকার সেই ভ্রমণ ব্যাপারে যাঁদের সঙ্গ সহায়তা পেয়েছিলুম তাঁদের অক্লান্ত সেবা ও সতর্কতা নিরন্তর না পেলে আমার পক্ষে এক পা চলা অসম্ভব হোতো। তাঁদের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম স্নেহ ও শুশ্রূষা পেয়েছিলুম তা অত্যন্ত মূল্যবান, তারা যদি য়ুরোপের রাস্তাঘাট থেকে আমার খ্যাতির ছিন্ন চিহ্নগুলো কুড়িয়ে নিয়ে না সংগ্রহ করে থাকেন তবে সেজন্য অনুশোচনা প্রকাশ করতে আমি নিরতিশয় লজ্জা বোধ করি। বস্তুত আমি জানি সেদিনকার সেই খ্যাতির কোনো

স্থায়ী মূল্য নেই কারণ সম্পূর্ণ জানার মধ্যে তার মূল ছিল না। এখনি তা অনুজ্জ্বল এবং লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে কিছু দিন পরে তা সুদূর স্মৃতিরূপে হয়তো অস্পষ্ট থেকে যাবে। কিন্তু যত্ন ও ভালোবাসা সত্যকার জিনিস অন্তরের ভিতর থেকে জীবনকে তা পূর্ণতা দান করে, কোনো কালে তার ক্ষয় নেই। সেদিন য়ুরোপও আমার বাহিরের সংস্রব থেকে জানি না কী কারণে আমাকে প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছিল সেই অহৈতুক মানব প্রেম আমার জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে অভূতপূর্ব সার্থকতা দান করেছে। বাহিরের কোনো বিস্মৃতি আর তাকে অপহরণ করতে পারবে না। আমার সৌভাগ্য এবং আমার গৌরব এই প্রীতিতেই, খ্যাতিতে কদাচিৎ নয়। সেই জন্য আমার সেই ভ্রমণ ব্যাপারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এই দৈনন্দিন সেবার ধারাসূত্র সকলের চেয়ে সত্য হয়ে আমার মনের মধ্যে আজো রয়ে গেছে আর বাকি বাহিরের সমস্ত দান প্রতিদান আমার মন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেজন্য আক্ষেপ না করাই আমি শ্রেয় মনে করি। ঈশোপনিষৎ মানুষকে তার জীবনান্ত-কালের এই মন্ত্র দিয়েছেন "ওম্ কৃতং স্মর", নিজে যা করেছ তাই স্মরণ কর, আর সমস্ত কথা নিয়ে যেন চিত্তবিক্ষেপ না ঘটে, লোকের মুখের কথা লোকের মুখেই রইল। কিন্তু অন্তরের সম্পদ জীবনের কর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে তার শেষ পুরস্কার অর্পণ করবে সেই পুরস্কারকেই আমি বলি শান্তি।

আমাদের দেশে সামান্য কারণেই লোকে আধ্যাত্মিক শক্তির অতিমানবিক প্রভাব কল্পনা করে থাকেন, আপনি

জানেন এই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমার নিজের মধ্যে কোনো ঘোষণা কোনো দিন প্রকাশ পায় নি কারণ আমি তা বিশ্বাস করি না। এ জীবনে যে মূলধনটুকু নিয়ে জনতার হাটে প্রতিপত্তির কারবার করে এসেছি সে আমার কবিত্বশক্তি মাত্র। সেই দান যে আমি ভাগ্যের হাত থেকে গ্রহণ করে জন্ম নিয়েছিলেম একথা অস্বীকার করলে কিংবা কম করে বললে যে কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করা হবে সেটা মিথ্যে অহংকারের চেয়েও ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু আমার এই কবিত্বের পরিমাণ বা গুণ যতই হোক এবং যাই হোক তা যথার্থ ভাবে জানবার কোনো সুযোগ য়ুরোপীয়ের ঘটে নি, তাঁরা সেটা হয়তো আন্দাজে ধরে নিয়ে থাকবেন। এই আন্দাজের মধ্যে সহজেই অতিকৃতি এসে পড়ে সুতরাং যে আদর্শে তাঁরা সেদিন আমাকে বিচার করেছিলেন সে ছিল তাঁদের নিজেরই অন্তরের সৃষ্টি তাতে তাঁরা আনন্দ পেয়েছিলেন এবং আমাকে উপলক্ষ্য করে সেই আনন্দ সম্ভোগ করেছিলেন এজন্য নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। আপনারা শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন এমন কি বিরক্ত হোতেও পারেন যে সেদিন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ আমাকে যে সমাদরের আসন দিয়েছিলেন তা তৎপূর্বে আমার দেশে আমার জন্য তেমন প্রশস্তভাবে কখনো পেতে দেওয়া হয় নি।

আমার বয়েস হয়ে গিয়েছে। খ্যাতি সম্বন্ধে আমার কোনো মোহ নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রীতির সঙ্গে সেদিন য়ুরোপ আমাকে যে সম্মান দান করেছিলেন তা আমি সবিনয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি এবং আমার অন্তরের মধ্যে সেই সৌভাগ্যের স্মৃতি

আজ পর্যন্ত সাদরে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই খ্যাতির স্থায়িত্বের মূল্য সম্বন্ধে আমার কোনো অত্যাশা নেই, অথচ এই প্রীতির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ মাত্র করি নে।

আর বেশি বলবার শক্তি আমার নেই, লোকালয়ের রাস্তা থেকে কিছু খ্যাতি কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলুম কি না যার মূল্য আছে, বলতে পারি নে। কিন্তু মানুষের প্রীতিলাভ করেছি অজস্র এবং যেহেতুক সে প্রীতি অধিকাংশ পরিমাণে অপরিচিত অনাত্মীয়দের কাছ থেকে পেয়েছি এই জন্যে তাকে আমি সর্বমানবের দান বলে নতশিরে গ্রহণ করি।

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ

১৫৭

১০ এপ্রিল ১৯৪১

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

সেদিন আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলুম সে আমার অপটুতাবশত বোধ হয় স্পষ্ট হয় নি এবং সমস্ত চিঠিখানি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় তার মর্মকথা প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সেই জন্যেই জানি না কি কারণে আমার সেই পত্র আপনাকে বেদনা দিয়েছে। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কেবলমাত্র এই ছিল যে একদিন সমস্ত য়ুরোপের কাছ থেকে আমি যে সম্মান পেয়েছিলুম তা অভাবনীয়, তা বিশ্বাস করা সহজ নয়, সেই জন্য কোনো দিন আমি নিজের মুখে এর কোনো বর্ণনা করি নি। এই ভ্রমণব্যাপারে আমার সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারতেন এবং দিলে সেটা শোভনও হোতো। আজ পর্যন্ত দেন নি। কিন্তু আমি অনুশোচনা করতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। কারণ আমার বয়সে এ অভিজ্ঞতাটুকু পেয়েছি লোকখ্যাতির কোনো স্থায়ী মর্যাদা নেই। অদৃষ্টের একমাত্র মূল্যবান দান ভালোবাসা। তা যেহেতু অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলে এই জন্যে বাহির থেকে কাল তাকে অপহরণ করতে পারে না। এই যথার্থ ভালোবাসা আমি সমস্ত য়ুরোপ থেকে এবং আমার ভ্রমণসঙ্গীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত লাভ করেছি। এই কৃতজ্ঞতা স্থায়ী ভাবে আমার মনে রয়ে গেল।

সাধারণভাবে এই কথাটুকু আপনাকে জানাতে চেয়েছিলুম এবং একথা আজ আমি সকলকেই জানাতে পারি।

নিজের অঙ্গুলি চালনা করতে অত্যন্ত কষ্ট হয় এই জন্য আজ দৈবক্রমে কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীকে নিকটে পেয়ে তার হাত দিয়ে আমার যা জানাবার কথা আপনাকে জানালুম। নিশ্চয় জানবেন এর মধ্যে আমার কোনোখানে কোনো ক্ষোভ মাত্র নেই। আমি যা পেয়েছি তা প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার করলুম এবং যা পাই নি তার জন্যে কারো কাছে কোনো নালিশ জানাব না। ইতি ১০ই এপ্রিল ১৯৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৮

২৫ এপ্রিল [১৯৪১]

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

সেই চিঠিখানা যদি ছাপানো শ্রেয় মনে করেন একবার আমাকে দেখতে পাঠাবেন কারো মনে কিছুমাত্র আঘাত দিতে ইচ্ছে করিনে— ইতি ২৫ এপ্রেল

আপনার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৯
২৬ এপ্রিল ১৯৪১

ওঁ

২৬।৪।৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শ্রীমৎ পরমহংসের সঙ্গে আমার পিতৃদেবের সাক্ষাৎকারের বিবরণ কিছুমাত্র আপত্তিজনক বলে আমি মনে করিনে। কিন্তু বর্তমানে তা অত্যন্ত অসময়োচিত তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আমার স্বদেশবাসীরা আমার অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আজ আনন্দ করছেন, এই সময়ে অশোভন ও ক্ষোভজনক এক আন্দোলনের সৃষ্টি করতে আমি চাইনে। এই কারণে আমি মনে করি পরে কোনো এক শান্ত সময়ে ছাপালেই চলবে। এমন কি আমার অবর্তমানে আরো উপযোগী হবে, অতএব আমার মনে হয় এই লেখাটি ভাবী ঐতিহাসিকের জিম্মায় থাকলেই নিরাপদ হবে। তখন এর প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলে এই চিঠিখানি ঐ পত্রের সাক্ষ্য দান করতে পারবে। ইতি

আপনার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬০

৬ মে ১৯৪১

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

পুরস্কার অনেক সময় সম্মুখে আসে, কিন্তু হাতে পৌঁছয় না। কিন্তু সে পুরস্কার প্রায়ই বাইরের দান। য়ুরোপে যে সম্মান আমাকে আনন্দ দিয়েছিল বস্তুত সে সম্মান নয়, সে অকৃত্রিম প্রীতি। আমার সঙ্গে য়ুরোপীয় মনের যে সংযোগ ঘটেছিল সে কোন্ সূক্ষ্ম প্রভাবের পথ দিয়ে তা বলা শক্ত। এই জন্যই সে অহৈতুক হৃদয়ের দান আমাকে পদে পদে এতো তৃপ্তি দিয়েছিল নরওয়ে থেকে আরম্ভ করে প্রাচ্য য়ুরোপ পর্যন্ত। কারণ আমি বার বাব আপনাদেব বলেছি যে সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সম্মান আমি তাব স্থায়িত্বকে বিশ্বাস করি না। ইংলণ্ডে আমার রচনার ভাষা তাদের পরিচিত ভাষা। এই জন্য তার সমাদর প্রথম বিস্ময়ের পর ক্রমেই অনুজ্জ্বল হবার কথা। সেখানে সাহিত্যের ভাষা মূলতই তলিয়ে যাচ্ছে। আমার হাতের ইংরেজী ক্ষণকালের জন্য যতই বিস্ময়কর হোক চিরকালের বন্ধনে তার নোঙর আঁকড়ে থাকতে পারবে না, সে আমার জানা কথা। সেইজন্য এই সত্তপাতি সম্মান নিয়ে গর্ব করতে আমার লজ্জা করে। আমার স্বদেশীয়রা যাঁরা ইতিমধ্যে ইংরেজ সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তাঁরা আমার এই আশঙ্কার কথা আপনাকে জানাতে পারবেন। এমন কি এই অশ্রদ্ধায় তাঁরাও

হয়ত মনে মনে কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন। আমি তো বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে কখনো অঞ্জলি পেতে দাঁড়াই নি। আমি যে তাঁদের সাহিত্যিক মণ্ডলের মধ্যে স্থান নিতে পারি তা আমি কল্পনাও করিনি, প্রত্যাশাও করিনি। সুতরাং এ ব্যাপারটা সব শুদ্ধ একটা দৈবাগত অপঘাত বললেই হয়। কিন্তু য়ুরোপের অন্যত্র আমি যে সমাদর পেয়েছি— সে হৃদয়ের। সে অলক্ষিত পথে আপন রহস্যজালে আকর্ষণ করে, বাহ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যিক নিক্তি দিয়ে তারা স্যাঁকরার দোকানে দাম যাচাই করে না। দাম তাদের হৃদয়ের নিগূঢ় কক্ষে, এ আমি পদে পদে অনুভব করেছি, ক'রে যেমন বিস্মিত হয়েছি তেমনি আনন্দ পেয়েছি। বস্তুত এই দানের একমাত্র সাক্ষী আমি নিজে— আমার অন্তরাত্মা। দ্বিতীয় বার য়ুরোপে গিয়ে এই স্নেহলিপির উপরে পুনর্বার যে দাগা বুলোতে পারবো তার সুদূর সম্ভাবনা রইলো না। কারণ য়ুরোপ আজ বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। অতএব এ নিয়ে এখন আক্ষেপ করা মিথ্যে এবং পুনর্বার এর সমর্থনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ ছেলেমানুষী। যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন ঘটনাবলীর কোনো উল্লেখ না করেও তাঁরা এই আশ্চর্য মানবহৃদয়ের সম্বন্ধ রহস্য অনুভব করে থাকবেন এবং সেইটুকুই জানবার ও জানাবার কথা। তার বেশী কিছু তন্ন তন্ন করে বিবরণ বলবার ও লিখবার আজ আর কোনও মূল্য নেই। আপনি নেপথ্যে থেকে অল্প যেটুকু আভাস পেয়েছেন সেও এই অকৃত্রিম মানব প্রীতির। এই প্রীতি এতটা বিস্তারিত হয়েছিল যে আমার

সঙ্গীরাও পূর্ণ স্বাদ পেয়েছেন এবং আজও তা তাঁরা ভোগ করে থাকেন। এইটিই আমার জীবনের ইতিহাসে সব চেয়ে বড়ো কথা। এতে আমার হৃদয়ের যে প্রসার ঘটেছে সে একটি অপূর্ব শিক্ষা এবং তার জন্য আমি য়ুরোপীয় মহাদেশের কাছে সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ। আমার হৃদয় দিয়ে আমি সেখানে মানবহৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছি। এই হৃদয়ের সংস্পর্শ কখনো বিলুপ্ত হবার নয়। জানবেন এর সমর্থন আমার চিত্তের মধ্যে মানবপ্রেমের উদ্বোধনে। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন না। দুঃখ করবার কারণ বাইরে পড়ে থাক। আনন্দের ভোজ মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইতি ৬ মে ১৯৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৬১

১৪ মে ১৯৪১

নমস্কার নিবেদন

আমার নিজের স্মরণশক্তির উপর আর নির্ভর করতে পারা যায় না। হয়তো কোনো এক সময় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্বে আমাকে আহ্বান করা হয়েছিল এবং সে প্রস্তাব যদি গ্রহণ না করে থাকি তাহলে তা গ্রহণ করবার মতো

দুঃসাহসিকতা আমার ছিল না। এপর্যন্ত অনুমান করতে পারি, কিন্তু নিশ্চিত কোনো তথ্য আপনাকে জানাতে পারি না। ইতি ৩১ বৈশাখ ১৩৪৮ সন

রবীন্দ্রনাথ

১৬২

২৭ মে ১৯৪১

২৭।৫।৪১

প্রীতিভাজনেষু

আমার গল্পটা সম্বন্ধে অনেকেব মনে দ্বিধা জন্মেছে। অর্থাৎ এর মধ্যে আক্রমণ করা হয়েছে স্থানে স্থানে, কেউ কেউ একথা মনে করেন। আমার রচনা বলেই নিষ্কৃতি পাবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু বারংবার এ রকম খোঁচা দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। সেইজন্য আমার অনুরোধ এই,— এই লেখার যে সকল জায়গায় কোনো উত্তেজনার কারণ আছে সেখানে যথোচিত পরিবর্তন কবাই উচিত। আপনি যদি এই সংশোধনে মনোযোগ কবেন তবে আমি নিশ্চিন্ত হই। বারংবার আক্রমণের মধ্যে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। বিশেষত যখন তার শাস্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। আপনি এ বিষয়ে বিচার করে দেখবেন।

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ

১৬৩

৩১ মে ১৯৪১

ওঁ ৩১।৫।৪১

নমস্কার নিবেদন

আমার শরীর মনের বর্তমান অক্ষম অবস্থায় কোনো প্রকাশযোগ্য গল্প লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার ভালোমন্দ বিচার করাও দুঃসাধ্য, সেইজন্য এই গল্পটি এখনকার মত বন্ধ রাখাই ভালো মনে করি। যদি কখনো সুস্থ হয়ে উঠতে পারি তাহলে আরেকবার চেষ্টা করে দেখব। এখন এটি প্রচ্ছন্ন থাকলে কোনো ক্ষতি হবে না। ইতি

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৬৪

২ জুন ১৯৪১

শান্তিনিকেতন

ওঁ ২।৬।৪১

প্রীতিভাজনেষু

এবারে কয়দিন ধরে বুদ্ধদেব নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। আমার স্বভাবের দোষ এই কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলে উত্তর না দিয়ে থাকতে পারি নে। কিন্তু এই দুর্বল শরীরে তার যথেষ্ট দাম দিতে হয়। এবারে নিরতিশয় ক্লান্তিতে আমাকে অভিভূত করেছে। মুখে মুখে লেখাগুলি যা বলেছি জানি নে তা কতদূর সমাদর যোগ্য। বুদ্ধদেব

ওগুলি স্বভাবতই প্রকাশ করতে ইচ্ছে করেছেন কিন্তু সেজন্য আপনি বেশি ব্যস্ত হবেন না। বিচার পূর্বক যখন খুসি প্রকাশ করবেন, এ সম্বন্ধে কোনো তাড়া নেই। আমার মনের যন্ত্র এখন ভালো করে চলচে না সেইজন্যে গল্পটা সম্বন্ধে দ্বিধা রয়ে গেছে। যদি কখনো সুস্থ হই তবে ওটার সম্বন্ধে যথোচিত বিধান করা যাবে। এখন আর আমার শক্তি নেই।

আপনার

রবীন্দ্রনাথ

১৩৫

৪ জুন ১৯৪১

৪।৬।৪১

নমস্কার নিবেদন

আপনাকে যে গল্পটা পাঠিয়েছি আমার বর্তমান দুর্বল বিচার বুদ্ধিতে তার ভালো মন্দ কিছুই ঠিক করতে পারি নি। ভেবেছিলাম আপনি সম্পাদকরূপে একটা কোনো মন্তব্য স্থির করে দেবেন, আপনার কাছ থেকে সেই নির্ভর না পাওয়াতে গল্পটা একরকম শূন্য আশ্রয় করেই রয়েছে। কোথাও এক জায়গায় ঠাঁই পেলেই ভালো হয়। আপনার উপরে নির্ভর করে আছি। ইতি

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

অন্য যাঁদের পরামর্শ নিয়েছি তাঁরা ভালোই বলেছেন তাই আশ্বস্ত হয়েছি।

১৩৩

৬ জুন ১৯৪১

৬/৬/৪১

প্রীতিভাজনেষু

কিছুদিন থেকে আমার ক্লান্তি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। স্পষ্ট করে কিছুতে মন দিতে পারি নে। এই অবস্থায় রোগশয্যায় আমি বুদ্ধদেবদের কিসব বলেছিলুম তার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। কিন্তু সেগুলি ধরতে পারে নি।* আপনি তার বর্জনীয় অংশ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করবেন অসঙ্কোচে। ওর মধ্যে যে অংশটুকু প্রকাশযোগ্য তাই রাখবেন। বোধহয় সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা আছে সেগুলি রক্ষণীয়। কিন্তু আপনি নিঃসঙ্কোচে এই বকুনিগুলিকে মেজে ঘষে নেবেন। আমার দিকে তাকাবেন না। আমি ভাবতেই পারি নে। গল্পটি যদি শ্রাবণ মাসের পূর্বে বের হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাতে আমি কোনো ক্ষতি দেখি নে। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো তাড়া নেই। মিস্ র‍্যাথবোনকে যে চিঠি লিখেছি তার তর্জমা বোধ হয় হাবুলকে দিলে তিনি ভালো রকমে করতে পারবেন। আমাব পক্ষে মন দেওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। আমার প্রতি কিছুমাত্র নির্ভর না করে আমার লেখার দায় আপনি যদি অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারেন তবে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হই। আপনাদের উপরে নির্ভর করা ছাড়া আমার কোনো গতি নেই। ইতি

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

যা বলেছিলুম তাকে সম্পূর্ণ কানে নিতে পারে নি। তাকে সম্পূর্ণতা দেওয়া এখন আমার পক্ষে অসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ

* এই পত্র শ্রুতলিপিরূপে অপরের হস্তাক্ষরে লিখিত। লেখার সময়ে সম্ভবত কবি কথিত কয়েকটি কথা মূল চিঠির তারকা চিহ্নিত অংশে বাদ পড়ে যায়। পরে কবি স্বাক্ষরের পর যে মন্তব্য করেন সেটি কবির হস্তাক্ষরেই পত্রের প্রান্তে লিখিত আছে।

-৬৭

৮ জুন ১৯৪১

৮.৬।৪১

প্রীতিভাজনেষু

এবারে বিস্তারিত ভাবে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে বুদ্ধদেব আমার মাথা ঘুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আজও সুস্থ হতে পারি নি। এটা দেখা গেল আমি যা বলেছি এবং যা লেখা হয়েছে এ দুয়ের মধ্যে ঠিক মিল পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তখন অসুস্থ ছিলুম বলে দেখে দিতে পারি নি— এখন দেখছি ভুল করেছি। তাই চিত্র এবং সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কোনো মতে পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করে আপনাকে পাঠিয়েছি। এরকম করে মুখে মুখে বকুনি প্রকাশ অন্যায়। এতে নিজের মান হানি হয়, এবার তা খুব বুঝেছি। যা হোক আপনি যথোচিত বিধান করবেন। ইতি

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ

২৪।৬।৪১

১৬৮

২৪ জুন ১৯৪১

প্রীতিভাজনেষু

আমার পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে ভ্রমণকালে যাঁরা আমার সঙ্গী ও সাঙ্গনী ছিলেন তাঁদের অনবধান বা ঔদাসীন্যবশত সাধারণের অবগতির জন্য আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও রক্ষা করেন নি এমন একটি অন্যায় অপবাদ প্রবাসীতে আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে— এ আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের বিষয়। আমি আবিষ্কার করলাম তাঁরা সমস্ত বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু যে কোনো কারণে হোক এতদিন পর্যন্ত সেই বিস্তারিত রিপোর্ট অগোচরে রয়ে গেছে। আজ তার আবিষ্কার হওয়াতে আমি আমার ভ্রমণ সহচরদের নিকটে আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখন তাঁদের এই সংগৃহীত বিবরণের যথোচিত ব্যবহার হোতে কোনো বাধা ঘটবে না। ইতি

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৬৯

৭ জুলাই ১৯৪১

শান্তিনিকেতন

৭।৭।৪১

প্রিয়বরেষু

শ্রীমান সুধীরচন্দ্র কর "সাহিত্যে সমসাময়িকতা" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশার্থে আপনাকে পাঠিয়েছেন সেটা কিছুতেই আমার নামের সংস্রবে প্রকাশের যোগ্য নয়। ভাব এবং ভাষায় তিনি সঠিক আমার উক্তি ধরতে পারেন নি। অতএব আপনি ঐ প্রবন্ধটি ছাপাবেন না। ইতি ৭।৭।৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

সংযোজন

১

[১৩১২ ?]

আপনার সম্পাদিত বাংলা আরব্য উপন্যাস উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি পূর্বেই ইহা ক্রয় করিয়া আমার পরিবারস্থ বালক বালিকা ও বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবকাশ কালে পড়িবার জন্য দিয়াছি— ইহা হইতেই এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার মত বুঝিতে পারিবেন। জগতে কথা-গ্রন্থের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের তুলনা পাওয়া যায় না— অথচ নানা কারণে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি গৃহস্থ ঘরে রাখা যায় না। আপনি সংশোধিত আকারে বাংলায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শিশুপাঠ্য সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থ শিশুসম্প্রদায়ের পিতামাতারও মনোরঞ্জন করিবার যোগ্য।

২

২৫ জুলাই ১৯২৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভালোই হয়েছে। আমার বিশ্বাস দেবীর হাতে ছবি আরো ভালো হবে। ওর তুলিতে রস আছে শুধু রূপ নয়। আপনি নির্ভয়ে ওর পরে ভার অর্পণ করতে পারবেন।

ঘন বর্ষা নেমেচে। মাঝে মাঝে তার ফাঁকে ফাঁকে রোদ্দ র উঁকি মারে। হাওয়া দিচ্ছে বেগে— গাছপালার মধ্যে মাতামাতি

লেগেচে। এমন সময়টাতে কলকাতায় যেতে মন সরচে না। ওদিকে প্রশান্ত তার-যোগে ডাক্তারের দোহাই পাড়চে। দ্বিধার মধ্যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। খুব বেশি বিলম্ব করতে পারব না। এই সপ্তাহটা পেরবে বলে মনে ভরসা নেই। ইতি ৮ শ্রাবণ ১৩৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
২১ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কৃপালানি শেষের কবিতার এক অংশ তর্জ্জমার পর অনেকদিন চুপচাপ আছেন। আমার বিশ্বাস তাঁকে অনুরোধ করলে সুরেনের হাতে এই কর্ত্তব্য চালান করে দিতে তিনি অসম্মত হবেন না। একাজ তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। ইতি ২১ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র : ১-২
অরুন্ধতী দেবীকে : ১-৬
রমা দেবীকে : ১
ইষিতা দেবীকে : ১

১

৮ মে ১৯২৫

তেহারান

কল্যাণীয় শ্রীমান কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়,

তোমরা পথের সাথী,
দিবসে এনেছ পিপাসার জল
রাত্রে জ্বেলেছ বাতি।
আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনায়
পথ হয় অবসান,
তোমাদের তরে রেখে যাই মোর
শুভ কামনার দান :—
তোমাদের পথ হোক অবারিত
নিয়ে যাক্ কল্যাণে,
নব নব ঐশ্বর্য আসুক
গানে কর্ম্মে ও ধ্যানে।
মোর স্মৃতি যদি মনে রাখ কভু
এই বলে রেখো মনে,
ফুল ফুটায়েছি, ফল যদিও বা
ধরে নাই এ জীবনে॥

২৫ বৈশাখ ১৩৩২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৮ জুন ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

দেশে ফিরে এসে দেখলুম আমাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। জমিদারীর আয় বন্ধ, দেনার সুদ বাড়ছে, জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি করবার বা ভাড়া দেবার চেষ্টায় রথী প্রবৃত্ত, দিন খরচের মার্জ্জিন ছাঁটা চল্‌চে। এই অবস্থায় পারস্য ভ্রমণের লেখাটা "বিচিত্রা" হাজার টাকা দিয়ে কিনতে চাচ্চে। আমাদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি তাই ধরা দিতেই হবে।

তোমার বাবার জন্যে দেনা পাওনার সম্পর্ক রাখতে চাই নে সে কথা তাঁকে বারবার বলেচি—প্রবাসীতে মাঝে মাঝে কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি যদি পাঠাই সেজন্যে আমাকে কিছু দেবার প্রস্তাব কোরো না। একেবারেই সে আমার ভালো লাগে না। বড়ো কোনো লেখা যার বড়ো দাম আছে সে আমাকে বিক্রি করতেই হবে। বিশ্বভারতীর জন্যে লিখে উপার্জ্জনের পথ করব এমন কথা মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কিন্তু নিজের সংসারের জন্যে জীবিকার সন্ধান করতে হবে এই পরিণামে আজ এসে ঠেকেছি। লেখা ছাড়া আর কোনো রাস্তা আমার নেই তাই কোমর বাঁধতে হোলো।

আশাকরি তোমরা ভালো আছে [আছ]। দার্জ্জিলিং [থেকে] যখন নামবে একবার দেখা যেন হয়—কেন না

ছবিগুলোর একটা গতি করতে হবে। দার্জ্জিলিঙে রথীর ঘরে আমার যে ছবি ঝোলানো আছে সেগুলো তো দেখেচ?

এখানে সম্প্রতি গরমটা কেটে গেছে। ইতি ৪ আষাঢ় ১৩৩৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

২৬ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

অত্যন্ত উদ্বেগ এবং ক্লান্তির পরে এখানে এসে গভীর আরাম পেয়েচি। এখানকার শিউলিতলা যেরকম সুগন্ধ শুভ্র ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তেমনি এখানকার শরতের দিনের সূর্য্যালোকশুভ্র মুহূর্ত্তগুলি আমার মনের উপর ঝরে পড়ে আমার মনকে একেবারে ঢেকে দিচ্চে। কাল রাত্রিটি জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত হয়ে গিয়েছিল—বিদ্যালয়ের ছেলেরা মাঠে মাঠে "জগৎ জুড়ে উদার সুরে" "মহারাজ একি সাজে" প্রভৃতি গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—কিছুতে যেন থামতে পারছিল না। আমি আমার সেই খোলা ছাতের উপর একলা বসে শুনছিলুম—আমার ভারি ভাল লাগছিল। এইগানগুলি যে কত সত্য তা যখন এই মাঠে ঐ ছেলেদের মুখ থেকে শুনি

তখন হৃদয় ভরে বুঝতে পারি। বিশ্বের সৌন্দর্য্যের মাঝখানে সুন্দর আছেন, কলকাতার ট্র্যামের রাস্তার ধারে সে কথা সুস্পষ্ট মনে আনা বড় শক্ত। জীবনটা সেখানে অনন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জল থেকে তোলা মাছের মত কেবল ধড়ফড় করতে থাকে।

আমার কোনো একটা manuscript চেয়েচ, দেব এখন। স্মৃতি যেটা চেয়েছিল সেটা ছাপাখানার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারি নি বলে তাকে দিতে পারি নি। তার জন্যেও একটা সংগ্রহ করতে হবে। তাহলে বেবিকেও একটা না দিলে ভাল লাগবে না।

তোমরা আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি
৯ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজ কোনোমতে সময় করতে পারলুম না—সমস্ত দিন লোক এবং কাজের ভিড় গেচে। এখন চল্লুম। আবার কোনো একদিন হঠাৎ এসে জুটব।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। যদি বোলপুরে গিয়ে গান শিখে আস্‌তে পার তাহলে খুব আনন্দের বিষয় হবে—বেবিকেও তাহলে তার বাজনাটা নিয়ে যেতে বোলো। গাড়ি প্রস্তুত।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
২১ অক্টোবর ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

M. Dubois কি এখন ভারতবর্ষে? তিনি এখানে যদি আস্‌তে চান ত নিশ্চয়ই তাঁকে আস্‌তে বোলো। না হয় কিছুদিন থাক্‌বেন তাতেই বা দোষ কি?

আমি নানা কাজে ও ভাবনায় ব্যস্ত ও ক্লান্ত আছি। ইতি
৪ কার্ত্তিক ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার জন্মদিনের চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম। আমি কিছুদিন থেকে কলকাতায় আছি। আরো কিছুদিন থাকতে হবে।

আমাদের সকলেরই জীবনে নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রামের কিছু না কিছু কারণ আছে। সেটা থাকা দরকার—তাতে আমাদের বাড়িয়ে তোলে। নিরতিশয় শান্তি এবং স্তব্ধতা মনের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নয়। সেই জন্যেই দুঃখকে কোনো মোহ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখলে আমাদের কল্যাণ নেই—তাকে স্বীকার করে নিয়ে তার উপরে উঠ্‌তে হবে। মানুষের আত্মা যে তার বাইরের সমস্ত অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র এবং বড় এই কথাটা বারবার প্রতিদিন মনে করতে করতে নিজের সমস্ত বাইরের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে আমরা মুক্ত করতে পারি। নিজের সেই বন্ধনমুক্ত বিজয়ী আত্মাকে বড় করে উপলব্ধি করবার শক্তি ঈশ্বর তোমাকে দিন এই আমার আশীর্ব্বাদ।

আমার আরো অনেক নতুন গান জমে উঠ্‌চে যখন দেখা হবে শিখিয়ে দেব।

বেবিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী কল্যাণীয়াসু

তোমাদের
মিলন হউক ধ্রুব,
জীবন শোভন শুভ
ভুবন আনন্দ সুধাময়,
লাভ কর নিত্য নিত্য
পুণ্য অমৃতের বিত্ত,
হোক সত্য সুন্দরের জয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৬ ফাল্গুন ১৩২৮

৬
১০ মার্চ ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি ত জান তোমাদের আমি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি। তোমাদের বিবাহ প্রেমে ও কল্যাণে সুন্দর ও সার্থক হোক এই আমার সর্ব্বান্তঃকরণের কামনা।

আজকাল রেলপথের বিঘ্ন ঘটাতে তোমাদের বিবাহে উপস্থিত থাক্‌তে পারি নি। সে বিঘ্ন এখনো ঘোচে নি, কিন্তু খুব সম্ভব বুধবারে এখান থেকে রাত্রে রওনা হয়ে বৃহস্পতিবারে কলকাতায় পৌঁছব—কেন না ১৮ই তারিখে লেভি সাহেবের সঙ্গে আমাকে নেপাল যাত্রা করতে হবে। তোমাকে যে গ্রন্থাবলী দিয়েচি তাতে আমার নাম লিখে দেব সে কথা আমার মনে আছে। এখানে সোমবারে ফাল্গুন পূর্ণিমায় সন্ধ্যার সময় গান বাজনা হবে, যদি তোমরা কোনো সুযোগে আস্‌তে পার তাহলে খুব খুসি হব—অনেক নতুন গান শুন্‌তে পাবে। কিছু নতুন গান এইবার তোমার সঞ্চয় করা উচিত হবে। সেই বীণকারও এখানে আছে, তার বীণা শুন্‌লে তুমি নিশ্চয় খুসি হবে। ইতি ২৬ ফাল্গুন ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১
২৯ মে ১৯৩৩

ওঁ

শ্রীমতী রমা কল্যাণীয়াসু

যে আশীর্ব্বাদ তোমাকে পাঠালুম এখনি তার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারবে না, তাতে ক্ষতি নেই, রইল তোমার কাছে। এর মধ্যে যে কথাটি আছে সংক্ষেপে তার অর্থ এই, ঈশ্বরের কাছ

থেকে দানরূপে পেয়েছি আমাদের এই জীবন, এ'কে যদি হেলা করে নষ্ট না করি, নিজের চেষ্টায় এ'কে যদি ভালো করতে পারি, সুন্দর করতে পারি, তাহলেই এই দান সার্থক হবে—নইলে এত বড়ো ঐশ্বর্য্য পেয়েও হারানো হবে। "উত্তিষ্ঠত নিবোধত" এই মন্ত্রের অর্থ এই— "ওঠো, জাগো।" জীবনকে সত্য করে তুলতে হলে সচেতন থেকে তার সাধন করতে হয়। ইতি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Glen Eden
Darjeeling

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা দেবী,

আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে ; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান
নিত্য তব নির্ম্মল নিষ্ঠায়। নহে ভোগ, নহে খেলা
এ জীবন, নহে ইহা কাল স্রোতে ভাসাইতে ভেলা
খেয়ালের পাল তুলে। আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো,
সত্য লক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর,
দুঃখেরে স্বীকার করি ; অনিত্যের যত আবর্জ্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করিবে মার্জ্জনা
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্ম্মে তব—উত্তিষ্ঠত নিবোধত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০ জুন ১৯৩৩]

আশীর্ব্বাদ

[শ্রীমতী ইষিতা দেবী কল্যাণীয়াসু]

Glen Eden
Darjeeling

আলোর আশীর্ব্বাদ জাগিল
তোমার সকল বেলায়,
ধরার আশীর্ব্বাদ লাগিল
তোমার সকল খেলায়।
বায়ুর আশীর্ব্বাদ রহিল
তোমার আয়ুর সনে,
কবির আশীর্ব্বাদ রহিল
তোমার বাক্যে মনে॥

অশোক চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১-২

১

১৪ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

খুকু, তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড় বড় মহা-মোহোপাধ্যায়দের পণ্ডপাণ্ডিত্যের বর্ম্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখ্‌তে পাই—তাতে খুসি হই—কিন্তু তোমাদের শনিবারের চিঠির সমরাঙ্গনে আহতদের মধ্যে কোনো নারীকে ধরাশায়িনী দেখ্‌লে আমার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত না হয়ে থাক্‌তে পারে না—তারা অপরাধিনী হলেও। নারীদের প্রতি পুরুষস্বভাবের অন্তর্গূঢ় করুণাই তার একমাত্র কারণ নয়—আরো একটা কারণ আছে। তোমাদের হাতে মার খেয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের যে লজ্জা সেটা সাহিত্যিক লজ্জা,—কিন্তু মেয়েদের লজ্জা তার উপরে আরো বেশি, সেটা সামাজিক। সিভিল ক্রিমিনাল দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে "ছায়েবানুগতা" ওরা যদি দোষ করে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্ত্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত করে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তাহলে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময়ে মূলবস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখ্‌তে হয়, মেয়েদের অপরাধও তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো বলে মনে

হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্ম্মিণীর সহধর্ম্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্ম্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা করে দেখো। ইতি ২৮ কার্ত্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অক্টোবরের The Living Age কাগজে "Apostles of Utopia : Lenin and Gandhi in Silhouette" নামক প্রবন্ধে গান্ধির যে চিত্রটি দিয়েচে সে খুব সুন্দর, মডারন্ রিভিয়ুতে উদ্ধৃত করবার যোগ্য। তোমাদের সম্পাদকী টেবিল-ক্ষেত্রে এ কাগজের নিশ্চয় আনাগোনা আছে—যদি হাতের কাছে না থাকে আমাদের কাগজখানা তোমার কাছে পাঠাতে পারি।

এমেরিকার The Nation কাগজে Mother India সম্বন্ধে যে চিঠি পাঠিয়েছি সেটা ডিসেম্বরে তোমাদের কাগজের নোটের মধ্যে কি কোনো কাজে লাগবে?

১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তাদেবী ও কালিদাস নাগকে লিখিত

পত্র ১-২১ ও ১-৩২

[শান্তিনিকেতন] ১১ মে ১৯১৯

শ্রীমতী সংযুক্তা দেবী কল্যাণীয়াসু

প্রবাসীর জন্য প্রান্তরবাসীর উপহার

গান

এই বুঝি মোর ভোরের তারা
এল সাঁঝের তারার বেশে।
অবাক্ চোখে ঐ চেয়ে রয়
চিরদিনের হাসি হেসে।
সারা বেলা পাইনি দেখা,
পাড়ি দিল কখন একা,
নাম্‌ল আলোক-সাগর-পারে
অন্ধকারের ঘাটে এসে॥

সকাল বেলায় আমার হৃদয়
ভরিয়েছিল পথের গানে।
সন্ধ্যাবেলা বাজায় বীণা
কোন্ সুরে যে কেই বা জানে
পরিচয়ের রসের ধারা
কিছুতে আর হয় না সারা,
বারে বারে নতুন করে
চিত্ত আমার ভুলাবে সে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২১ জানুয়ারি ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, জেনোয়াতে এসে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। তুমি আমার ডায়ারির কথা লিখেছ—কিন্তু সেই ডায়ারিতে কি যে বকেচি তার প্রায় কিছুই মনে নেই। তাতে মেয়েদের কথা লিখেছিলুম তা মনে আছে, কিন্তু কিভাবে তা মনে নেই। ও সম্বন্ধে যা বলবার আছে সব যে সম্পূর্ণ করে বলেছিলুম তা সম্ভব নয়। কেন না ডায়ারি জিনিষটা মনের ক্ষণিক মেজাজের প্রতিবিম্ব—ওতে কেবল এক পাশের ছবি ওঠে—চারপাশ ঘুরিয়ে ত ছবি তোলা যায় না।

এতদিনে খবর পেয়ে থাকবে দক্ষিণ আমেরিকার পথে আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল, পেরু যাওয়া হল না, আর্জেন্টিনায় ডাক্তারের হাতে প্রায় দু'মাস বন্ধ হয়ে চুপচাপ পড়েছিলুম। ছুটি পেয়েই ইটালিতে এসেছি। এখানকার কাজ সেরে ভারতযাত্রা করতে আর দিন পঁচিশেক দেরি আছে। অর্থাৎ জেনোয়া থেকে যে জাহাজ ১৫ ফেব্রুয়ারিতে ছাড়বে সেইটেতে যাওয়া স্থির করেছি। আশা করি কোনো কারণে আর তারিখ বদল হবে না। কেননা এ শরীর নিয়ে বিদেশে ঘুরতে আর ইচ্ছে করচে না। অতএব যখন এই চিঠি পাবে তার এক মাসের মধ্যেই দেখা হবে। বড় গল্প লিখতে বলেছ। সে কি সম্ভব? চল্‌তে চল্‌তে গলাবন্ধ বোনা যায়

কিন্তু চল্‌তে চল্‌তে কি ষোলো হাত বহরের সাড়ি বোনা সহজ? আজ সকালে মিলানে যাচ্চি। সাম্‌নে অনেক ঘোরাঘুরি অনেক বকাবকি আছে। ইতি ২১ জানুয়ারি ১৯২৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯২৫ ?]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

প্রবাসী পেয়ে খুসি হলুম। কাজে লাগবে।

কালিদাসের সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে শুনে খুব খুসি হয়েছি, তোমাদের মিলন শুভ হোক্ এই আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২২ এপ্রিল ১৯২৫ ৯ বৈশাখ ১৩৩২

শ্রীমতী শান্তা দেবী
ও
শ্রীমান কালিদাস নাগ

আশীর্ব্বাদ

দুইয়ের মিলনে রচিয়া পাত্রখানি,
ভরি রাখো তাহে একের অমৃত আনি
সে অমৃত করি পান
জীবন হইবে গান,
চিত্ত হইবে চির-কল্যাণবাণী ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২৫ নভেম্বর ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার আশা ত্যাগ কর—যুগলক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্যে আমার খেয়ালে ভর করেছিলেন, সম্প্রতি তাঁর ঠিকানা কোথায় কেউ জানে না। এখানে এসে অবধি নিজের শরীরের দুঃখটা নিয়েও যে একটু বেশ আরাম করে তাকে লালন করব তারও সময় পাই নি। কাল গবর্ণর দেখা দিয়ে চলে গেছেন—কিন্তু অবকাশের ফাঁকা কোথাও নেই, সমস্ত নিরেট করে কাজে অকাজে ঠাসা। এর উপরে ইংরেজি লেকচারটা যেমন করে হোক্ যত শীঘ্র পারি শেষ করে দিতে হবে। সবচেয়ে মুস্কিল

হচ্চে লেখায় অরুচি। নানা দিকের দাবীতে নানা দিকে আমাকে যতই টান্‌চে আমার মন ততই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠ্‌চে।

ক্ষুন্থর বিয়ের ত আর দেরি নেই— এর মধ্যে কলকাতায় যাওয়া আসা আমার হাড়ে সইবে না। বিবাহ আসরে সশরীরে থাকতে পারব না— আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ পৌঁছবে। ইতি ৯ অগ্রাণ ১৩৩২

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[মার্চ ১৯২৬ ?]

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, প্রুফ কাল প্রশান্তর হাতে দিয়েছিলুম, সে নিশ্চয় হারিয়ে ফেলেচে। “ভুবন” শব্দে দীর্ঘ উকার ছিল এ ছাড়া আর ভুল ছিল না।

ঢাকায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলুম তারই একটা তোমাদের দেব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু সেগুলো খবরের কাগজে একবার মোটামুটি বেরিয়ে গেছে। তার পরে আবার বই আকারে সেগুলো ছাপা আরম্ভ হয়েছে— প্রবাসী বেরিয়ে যাবার যথেষ্ট আগেই ছাপা হয়ে যাবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। কোনো কাজ অত্যল্পমাত্রও করা

আমার পক্ষে একান্ত অরুচিকর ও শ্রান্তিজনক হয়েছে। দুই একদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে পালাবার ইচ্ছা। আজ বৌমা ও পুপেকে দেখতে এখানে জোড়াসাঁকোয় এসেছি—রাত্রে আলিপুরে ফিরব।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

[এপ্রিল ?, ১৯২৬]

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, লেখাটা দুই একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাত ওল্টাও

[পরের পাতায়]

শেষ শ্লোকটি

বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে তবে
ঘর তব আপনার হবে।
তুফান তুলিবে কূলে,
কাঁটাও ভরিবে ফুলে,
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে॥

[জানুয়ারি ১৯২৭ ?]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। এবার কলকাতায় গেলে তোমার মেয়ের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করব—কিন্তু কবে যেতে পারব এখনো ঠিক করি নি। যেতে একটুও ইচ্ছে নেই। আগেকার মতই একটা ক্লান্তি আমাকে ক্রমে ক্রমে পেয়ে বস্‌চে— কলকাতায় গেলে নানা উপদ্রবের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে এই আশঙ্কা। এ ছাড়া রেলযানে ভ্রমণটা আমাকে অল্পেই কাবু করে তোলে। তোমার বাবা আসবেন লিখেছেন— তাঁর মুখে তাঁর নবতমা নাৎনির কথা শুনতে পাব। আমার আশঙ্কা হচ্চে পাছে আমার নন্দিনীর নামে আমি যেসব গান রচনা করেছি পাছে সেগুলি তিনি নিজের ব্যবহারে বাজেয়াপ্ত করেন। নিজের কাব্য সম্বন্ধে কবিদের ঐ এক মস্ত বিপদ— Tresspassers will be prosecuted এই নুটিস দরজায় লটকে দেবার জো নেই। ইতি

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

[৯ জানুয়ারি ১৯২৭]

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, কথা ছিল মঙ্গলবারে শান্তিনিকেতনে যাব— আর আজ তোমাদের ওখানে গিয়ে তোমার কন্যাকে আর কন্যার মাকে দেখে আসব। কিন্তু দুর্দিনের উপদ্রবে শরীর আজ একেবারে ভেঙে পড়েছে— তাই আজ বিকেলের গাড়িতেই পালাতে বাধ্য হলুম। ইতিমধ্যে চুপচাপ করে থাকব। ইতি রবিবার

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

২৫ মার্চ ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তোমার চিঠি পড়ে মনে হয়েছিল আমার "বুদ্ধ-জন্মে"র কবিতাটি প্রবাসীর বৈশাখী নৈবেদ্যরূপে তোমরা গ্রহণ করতে পার নি। তাই "বৃক্ষবন্দনা" বলে আর একটি কবিতা কাল পাঠিয়েছি। আমার ইচ্ছা আমার এইরকম কবিতাগুলি প্রবাসীতে দ্বিধাবিভক্ত পাতায় ছাপা না হয়। অন্য নানা জাতের নানা লেখার সঙ্গে কবিতা মিশে গেলে হোয়াইট্‌য়াবে লেড্‌লর দোকানের শেলফ্‌ মনে পড়ে। এইজন্যে কবিস্বভাবসুলভ অভিমানবশত আমি আমার

কবিতাগুলির জন্যে স্বতন্ত্র পংক্তি ও আসন দাবী করি। তোমাদের সাময়িক পত্রের সাম্যতন্ত্রে যদি তা বাধে তাহলে আমরা নাচার।

ভিয়েনা থেকে তেজেশকে যে একটি পত্র লিখেছিলুম আমার গাছের কবিতার ভূমিকাস্বরূপ সেটি দিতে হবে। পত্রের কাপি এই সঙ্গে পাঠাই। ইতি ১১ চৈত্র ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

২২ মে ১৯২৭

Uplands
Shillong

কল্যাণীয়াসু

কাল তোমাদের প্রবাসী আপিসের ঠিকানায় আমার নববর্ষের বক্তৃতাটা পাঠিয়েছি-এতদিনে পেয়ে থাকবে। তোমাদের আধুনিক ঠিকানা না জানা থাকাতে তোমাদের স্বহস্তে পৌঁছিয়ে দিতে পারি নি। এখানে এসে প্রথম কয় দিন অসুখে পড়েছিলাম—আমি যদি বা সেরে উঠলুম পুপে পড়েচে। এই শিক্ষা হয়েছে যে পরিবর্ত্তন হলেই পরিশোধন হয় না। এখানে আর কিছু না হোক ঠাণ্ডা পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখরতা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল সেটা সম্বন্ধে মত বদলানো

উচিত বোধ করি। স্থানভেদে জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্যবহারের অন্যথা হয়— ইংলণ্ডে যার মধুর স্বভাব ভারতবর্ষে তারই রুদ্রমূর্ত্তি। এইটে নিয়ে যদি পোলিটিকাল আন্দোলন করা যায় তাহলে জ্যৈষ্ঠ মাসের পক্ষপাত দোষের শোধন হবে বলে কি মনে কর? এ বছরে আমি অপার্ব্বত্য বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের সঙ্গে নন্-কোঅপরেশন জাহির করে চলে এসেছি, তাতে নিজেকে খুবই উন্নত বলে বোধ করচি— কিন্তু হায়, জ্যৈষ্ঠ অপেক্ষা করতে জানে— যেমনি নেমে পড়ব অমনি চেপে ধরবে। ইতি

৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

১২ অগস্ট ১৯২৭

ওঁ

মেডান

সুমাত্রা

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, সেদিন লিখলুম প্রবাসী পাইনি আজ লিখ্‌তে বসেচি প্রবাসী পেয়েচি। হয়ত দুটো চিঠি এক সঙ্গেই পাবে। এবারকার প্রবাসী দেখে খুসি হলুম—ফজ্‌লি আমের মতো,

শাঁস অনেকখানি। বিপরীত ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্চি। ইংরেজি ভাষায় বলে "গড়িয়ে-যাওয়া পাথর শ্যাওলা জমাতে পারে না।" কোথাও এবং কোনো সময়ে একটুখানি বসে যে লিখ্‌ব সে আশঙ্কা মাত্র নেই। যদি বা দুদশ মিনিট বসবার সময় পাই, দেহমনে ঘূর্ণি হাওয়ার দম শীঘ্র বন্ধ হতে চায় না। সেই ঘুর্ বন্ধ না হলে সামান্য একখানা চিঠি জমানোও শক্ত হয়, "প্রবন্ধ পরে কা কথা"— পাক-খাওয়া মন বাক্যগুলোকে যেন তুলো ধুনে নয়-ছয় করতে থাকে। কাল ছিলেম মালয় উপদ্বীপে, আজ এসেছি সুমাত্রায়— আজ বিকেলে এখান থেকে পাড়ি দেব যবদ্বীপে। সেখানে গিয়েও ঘুর্ ঘুর ঘুর্। তার উপরে বক্ বক্ বক্।

তোমার কন্যার নামের ফর্দ্দ সেদিন তাড়াহুড়ো করে পাঠিয়েছি— কারণ এখানে সব কাজই তাড়াহুড়োর ঝাঁপ-তালে— দিনগুলো মোটরগাড়ি চড়ে ছোটে, স্বপ্ন দেখি দ্রুতলয়ে। পছন্দসই কিছু জুটল কি? চারুশ্রী, সৌম্যশ্রী, সোমশ্রী, শান্তিশ্রী, স্বচ্ছশ্রী, স্নিগ্ধশ্রী, রম্যশ্রী কিন্তু ওদিকে তোমার নামকরণের দিন বোধ হয় চুকে গেছে। তোমার চিঠি যখন আমার হাতে পৌঁছল তখন সে চিঠি তোমার শুভদিনের পঞ্জিকা হিসাব করে পৌঁছয় নি— তখনি দেরি হয়ে গিয়েছিল।

এই চিঠিটা তোমাকে লিখচি, কেবলমাত্র চিঠি লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন এই খবরটি দেবার জন্যে। কিন্তু সেই খবর দিতে গিয়ে যদি লম্বা চিঠি লিখি তাহলে চিঠির দৈর্ঘ্য আমার কথার প্রতিবাদ করবে। এইজন্যে নীচের ক'টা

লাইন বাদ দিতে হল। বাদ দেবার আর একটা কারণ আছে। সকালে এই হোটেলে এসে পৌঁচেছি এখনো স্নান হয় নি। বলা বাহুল্য স্নান হলে তবে আহার হবে। শরীর রক্ষার জন্যে আহারের কত প্রয়োজন সেকথা তোমার মত বিদুষীকে বলা অনাবশ্যক তবু কথাটার প্রসঙ্গ যে এখানে তুল্‌লুম সে কেবলমাত্র আরো দুটো লাইন পূরিয়ে দেবার জন্যে। এর থেকেই বুঝবে ক্রমাগত নাড়া খেয়ে খেয়ে মগজ থেকে সমস্ত স্বাধীন চিন্তা কিরকম ঝরে পড়েচে। যে কথাগুলো না লিখ্‌লে চলে [না] সেকথা ছাড়া আর কিছুই লেখবার শক্তি নেই। চিঠির কাগজের রেখাগুলো দেখ্‌চি ভর্ত্তি হয়ে গেল— যে দুটো বাকি আছে সে দুটোতে নামজারি করব— নামের দ্বারা মানুষ কাল দখল করতে চায় আমি চিঠির কাগজের স্থান দখল করব। ইতি ১৭ অগস্ট ১৯২৭

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

[নভে / ডিসেম্বর ১৯২৭]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

গোটাকতক বেশ প্রমাণসই ভুল এবারকার আলাপ আলোচনায় দেখা গেল। "অসীম"কে "সসীম" করে অর্থটাকে

এক মেরু থেকে আর এক মেরুতে চালান করে দেওয়া হয়েচে। ১৬১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের এক জায়গায় হওয়া উচিত ছিল "সেই বিশেষ রকম করে দেখাশোনা জানার সুযোগ আমার ও আমার প্রিয়জনের দেহমনের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে সেই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হলে সেই অভিজ্ঞতার সুখ থাকে না।" চিহ্নিত অংশটি লুপ্ত হওয়াতে তাৎপর্য্যটা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েচে, এই সমস্ত বাক্যবিকারে তোমাদের কোনো দোষ নেই— এ সমস্ত এখানকার লিপিকারের স্বরচিত। যা হোক্ ভাবীকালে একবার আমার লেখার প্রুফ আমার হাত দিয়ে গেলে রচনা হয়তো নিরাপদ হতে পারে— আমি যে খুব পয়লা নম্বরের প্রুফ-দেখিয়ে এমন অহঙ্কার নেই— তবে কিনা স্বকৃত পাপের জন্যে স্বয়ং শাস্তি পাওয়ার মধ্যে একটা নৈতিক তত্ত্ব পাওয়া যায়— প্রুফ দেখা ব্যাপারে পরকীয় পাপের সমস্ত শাস্তিই নিজেকেই পেতে হয় অপরাধকারীর গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে না। বিশ্ববিধানে প্রুফ দেখা ব্যাপারে ন্যায়নীতির একটা মূলগত ব্যত্যয় আছে একথা অতি বড় আস্তিককেও মান্‌তে হবে। যদি বলো এতে লেখকের ধৈর্য্যচর্চ্চার সহায়তা করে আজ পর্য্যন্ত তার প্রমাণ পাই নি— বরঞ্চ প্রত্যেকবারের আঘাতেই অধৈর্য্যের পরিমাণ বাড়ে বই কমে না। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি ১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"যা ইচ্ছা করি তাই যদি অসীম হয়ে দাঁড়ায় তবে যা অনিচ্ছা করি তারও অসীম হতে বাধা কি?" এইটেই হচ্ছে ভদ্র পাঠ।

১৪

১ ডিসেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

একটি মেয়েকে চিঠিগুলি লিখেছিলুম, তিনি নাম দিতে চান না। এর মধ্যে আমার অনেক মনের কথা আছে হয় ত সেগুলি অপাঠ্য হবে না। মেয়েটি আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী অথচ স্বভাবতই ভক্তি নম্র, এই জন্যেই তাঁকে বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি চিঠি লিখেছিলুম। তোমার সম্পাদকীয় বিচারে এগুলি যদি প্রবাসীতে গ্রহণীয় মনে করো তবে ছাপিয়ো। যদি না মনে করো লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। একটা কথা নিশ্চিত মনে রেখো যদি আমার কোনো লেখা কোনো কারণে তোমাদের ভালো না লাগে আমি বিরক্ত হই নে। হয়ত তার একটা কারণ, নিজের উপর আমার বিশ্বাস আছে, আর একটা কারণ মানব চিত্তে অপরিহার্য্য রুচি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমার ধৈর্য্য আছে—পূর্ব্বে এতটা ছিল না। আমাকে গাল দিলে এখনো লাগে কিন্তু অকপট ভাবে অপ্রশংসা করলে সেটাকে সহজে মন থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে পারি।

এই মেয়েটির কাছে আমার আরো অনেক চিঠি আছে— পরে দেবেন বলেচেন। যদি উৎসাহ পাই তবে সেগুলিও কপি করে তোমার দপ্তরে উপহার পাঠাব।

৪ তারিখে কলকাতায় যাচ্চি তার পরে কোনোদিন প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের আশা রইল। ইতি ১ ডিসেম্বর ১৯২৭

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫
১৬ মে ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ভিন্ন মোড়কে "সংস্কার" নামে একটি ছোট্ট গল্প পাঠালুম। দুর্ভাগ্যক্রমে আলস্যবশত প্রশান্তকে দিয়ে কপি করিয়েছি— আশা করি তাতে তোমাদের বা ছাপাওয়ালার গুরুতর পীড়ার কারণ হবে না।

জাহাজে উপযুক্ত জায়গা এখনো পাই নি। জুনের শেষাশেষি পাব এমন আশা পাওয়া যাচ্চে। ইতিমধ্যে নীলগিরি অঞ্চলে কুন্নুর পাহাড়ে অবস্থান করা স্থির করেচি। এবারকার প্রবাসী যদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাও তাহলে বিদেশে পাড়ি দেবার পূর্ব্বে হস্তগত হবে। আপাতত আছি আডিয়ারে,

সহর থেকে দূরে নির্জ্জনে। সেই সুযোগে গল্পটা লিখেচি— এটা তোমাদের পক্ষে উপাদেয় হবে কিনা জানি নে— একদল পাঠক ভ্রূকুটি করবে বলে আশঙ্কা করি। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার ঠিকানা :—

C/o Maharajah Bahadur
Pithapuram
Coonoor, Nilgiri Hills
Madras

১৬

৭ মার্চ ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড়ো খুসি হলুম। আমি কলকাতায় পৌঁছিয়েই জনতার তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি— নইলে তোমাকে খবর পাঠিয়ে দেখা করতুম। আমি যে জীবনের চতুর্থ প্রহরের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছি প্রতিদিন সে সম্বন্ধে আমার সংশয় দূরে যাচ্চে। প্রাণযাত্রার গোড়াতেই উদ্ভিদের পালা— চক্রপথ ঘুরে এসে

সেইখানেই লীলা সাঙ্গ করতে হয়— আমার এখন সেই উদ্ভিদের দশা— সচলতা ক্রমেই হ্রাস হয়ে আসচে। তা নিয়ে মনে কোনো পরিতাপ নেই— কেবল মুস্কিল এই যে চারদিকে আর সকলে চঞ্চল— তারা আমাকে নিয়তই দলে টানতে চায়, স্থির থাকতে দেয় না— মনে ভয় হয় যে শেষদিনেও তারা ঘনঘন স্ট্রিকনীন ইনজেক্ট করে আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবে।

কালিদাসের সঙ্গে আমেরিকায় অনেকবার দেখা হয়েচে। সেখানে সে খুব আসর জমিয়েচে— খুসি হয়েচি। ভেবেছিলুম কলকাতায় শীঘ্র যাব না। কিন্তু সেখানে একটা বসন্ত উৎসবের পালা হবে, আমি উপস্থিত না থাকলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না তাই জনসাধারণের দরবারে হাজিরা দেওয়া চাই অতএব সেখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ইতি ৭ মার্চ ১৯৩১

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

১৭ জুন ১৯৩৫

ওঁ চন্দননগর

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, নিশ্চয় পড়ে দেখব তোমাদের বই,— অনেকদিন এ কাজ করি নি। নদীর জল শুকিয়ে এলে তার ক্ষীণাবশেষ

প্রবাহের সঙ্গে ডাঙার সম্বন্ধ যেমন দূরে পড়ে যায়, ভয় হয় পাছে এখনকার কালের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের তেমনি দূরত্ব ঘটে থাকে। আয়ুর জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে রুচির এবং ঔৎসুক্যের ওঠা পড়া চলে— তাই বর্ত্তমানকে বিচার করা ব্যাপারে নিজের যোগ্যতাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নে— সেইজন্যে আমি এখনকার বাণী থেকে আমার কানটাকে সরিয়ে রাখি। তাহোক, পড়ে দেখব তোমাদের বই, তারপরে বোঝাপড়া হবে। ইতি ১৭ জুন ১৯৩৫

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

১৮ জুলাই ১৯৩৫

কল্যাণীয়া শান্তা ও সীতা

তোমা[দে]র মায়ের মৃত্যু সংবাদ দুদিন হোলো পেয়েছি। যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখন তাঁর প্রতি সেবাই ছিল তোমাদের ভালবাসার দান— আজ তোমাদের একমাত্র অর্ঘ্য তাঁর জন্যে শোক। সেই শোক তোমাদের চিত্তকে পবিত্র করুক, দুঃখের গভীরতা থেকে উৎসারিত হোক নির্ম্মল শান্তি ও সান্ত্বনা,

তাঁর স্মৃতি কল্যাণ বর্ষণ করুক তোমাদের জীবনে। ইতি
১৮ জুলাই ১৯৩৫

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজকাল আমি শরীর মনের অবসাদের জন্যে পড়াশুনোয় বিমুখ হয়েছি। ইজি-চেয়ারাসনে নৈষ্কর্ম্ম্য সাধনাতেই আমি নিযুক্ত। সেইজন্যে, তুমি আমাকে যে বই পাঠিয়েছিলে সেটা আমার অগোচরে কোনো গল্পপাঠপিপাসু অধিকার করেছে, আমিও সতর্ক ছিলুম না। আজকাল লঘু দায়িত্বও আমার পক্ষে গুরুভার। তাই কাজে ফাঁকি দিতে পারলে আমি ছাড়ি নে, কিন্তু নির্ম্মম কাজ এই পলাতকার পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্চে। তোমাদের রচনা আমার ভালোই লাগবে, কিন্তু ভালো করে বলবার মতো বেগ কলমে নেই। ইতি
৬ আশ্বিন ১৩৪৩

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তুমি ভুল করেছ। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে Mrs Woodrowর নিমন্ত্রণে আতিথ্য বিভ্রাটের বিবরণ প্রকাশিত হয় নি। ওটা বেরিয়েছিল জীবনস্মৃতিতে।

কালিদাস দিগ্বিজয় করে দেশে ফিরেছেন। যদি দেখা হয় তার ইতিহাস শোনা যাবে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো এবং সম্পাদকের বৈঠকে বসে এ কথা মনে রেখো যে-সাহিত্যের তটভূমিতে দীর্ঘকাল ফসল ফলিয়ে এসেছি তাতে জীর্ণ আয়ুর ভাঙন ধরেছে। যে তটে নতুন জমির উদ্ভব হচ্চে তোমাদের দূত পাঠিয়ো সেই ক্ষেত্রেই। ইতি ৯ পৌষ ১৩৪৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

[সেপ্টেম্বর অক্টোবর ? ১৯৩৭]

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, ডুবুডুবু দেহটাকে পাঁচদশটা ডাক্তার জাল ফেলে অতলের থেকে টেনে তুলেছে। বোধ হচ্চে মনটা এখনো

সম্পূর্ণ ডাঙায় ওঠে নি, তার কাজ চলচে না পূরো পরিমাণে, থাক্ কিছুদিন জলে স্থলে বন্যা নেমে যাওয়া ঘাটের কাছটায়। পশু দিন এক জ্যোতিষী গণনা করে লিখেছেন যে ৯২ বছর আমার আয়ু। শুনে অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। কিছুদিন দেহটার উপর কড়া চিকিৎসা চালালে গ্রহ নক্ষত্ররা আশা করি হঠে যাবে। মিসেস ওয়াডাকে ছবি অনেকদিন হোলো পাঠিয়েছি— কোনো খবর মেলে নি। সমুদ্রের কোন পারে তার গয়া প্রাপ্তি হোলো কী জানি। ছবিটা ভালো আঁকা হয়েছিল।

কলমটা খোঁড়াচ্চে অতএব তাকে ছুটি দেওয়া যাক্। ইতি তারিখ ? আশ্বিন ১৩৪৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ মার্চ ১৯১৭ ?]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সাহিত্যমণ্ডলীতে আমি ত আজকাল একঘরে', তুমি বুঝি আমাকে জাতে তোলবার চেষ্টায় আছ ? যারা আমাকে একঘরে' করেছে তারা আমাকে না জেনে সম্মান করেছে, আমাকে স্বতন্ত্র আসন দিয়েছে, তাতে ক্ষতি কি ? আর কিছু না হোক্ নিরালা পাওয়া যায়। ভক্তমালে কবিরের গল্প পড়েচ ত ?

যাই হোক্ যুবকদের আহ্বান আমি কখনো অনাদর করিনে। ঐ বয়সের সঙ্গেই আমার মিল হয় ওটা যারা পেরিয়েচে যাদের চাল্‌শে ধরেছে তাদের চষমায় আমার চেহারা বীভৎস হয়ে ওঠে। আমি যৌবনের কবি, তাই জরা আমাকে পরিহার করে। তোমরা আমাকে লুটপাট করে যদি দখল করে নেও তাতে আমার আনন্দ আছে—আমার পাকাচুল দেখে ভয় কোরো না, ওটা আমার অদৃষ্ট পিতামহীর পরিহাসের হাস্যে শুভ্র হয়ে উঠেছে।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

৩ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সাহিত্য পরিষদের একটা বিভাগ তোমরা দখল করে বসেচ এই খবরটা যখন তোমার কাছে পেলুম তখন মনে বড় সন্দেহ হল। তারপরে যখন শুনলুম এই বিভাগে আমাকে তোমরা স্থান দিয়েচ তখন সন্দেহ আরো বাড়ল। আজ তোমার চিঠি পেয়ে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। আসল কথা তোমাদের জিতটাও ভুল, আমার স্থানটাও তথৈবচ। মায়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই মুক্তি। এখন তুমি মুক্ত পুরুষ। এখন যদি কোনো কাজে হাত দাও সেটা ছোট হলেও সত্য হবে। যে ছাত্ররা idea-পিপাসু তাদের নিয়ে একটা ছাত্র-বৈঠক গড়তে কতক্ষণ লাগে?

আমাকে চাও ? আমাকে পাবে। কিন্তু আমি ত এখন বেকার নই। বাংলাদেশের বয়স্কদের কাছ থেকে তাড়া খেয়েচি কিন্তু ছোটদের এখনো বিচারবুদ্ধি হয় নি তাই আমার নিরাপদ আশ্রয় তারাই। বিধাতার আশীর্ব্বাদে বাংলাদেশেও মানুষ কিছুদিন শিশু থাকে, তাদেরই ভুলিয়ে ভালিয়ে আমি কোনো-রকমে রক্ষা পাব। এদের নিয়ে আমি আছি। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর জাল আরো নিবিড় হয়েচে। আমার ক্লাস আছে এইজন্যে ছুটি পাইনে, আমার মত ঢিলে লোকের পক্ষে সেটা ভাল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা প্রতিদিন স্পষ্ট করে বুঝতে পারচি যে, নিজেকে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে কোনো লাভ নেই। যেখানে আছি সেইখানটুকুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এরই কূলকিনারা পাইনে। ক্ষেত্রের পরিধি বাড়ালেই যে ক্ষেত্র সত্যই বড় হয় তা নয়। তাই আমার এই শিশুদেবতার অর্ঘ্য জোগাতেই আমি লেগে আছি—অন্য কাজের তাড়ায় পূজায় ত্রুটি ঘটাতে আর সাহস হয় না। ত্রুটি অমনিতেই যথেষ্ট আছে।

অতএব আগামী শনিবারে যদি তুমি আসতে পার ত তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারি, বাক্যসংযোগে এবং সুরসংযোগে। দুই একটি ছাত্রও সঙ্গে আন্‌তে পার।

কিছুতে বিচলিত হোয়োনা, মনটাকে খুসি রাখ। ইতি ৩রা এপ্রেল, ১৯১৭

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[শান্তিনিকেতন *] ১০ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

পালিয়ে বেড়াচ্চ কেন? তুমিও অটল থাকবে আমিও নড়ব না এমন অবস্থায় যে ব্যবধান ঘুচ্‌তে পারেনা জিওমেট্রি না জানলেও একথা নিশ্চয় বলা যায়। বর্ষশেষের দিনে যদি এখানে উপস্থিত হতে পার তাহলে সকলে মিলে বর্ষারম্ভের উৎসব করা যায়। আজ ডাক্তার বেণ্ট্‌লি এইমাত্র চলে গেলেন—বেশ জমেছিল—ডাক্তার মৈত্র না আসাতে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া জমিয়ে রেখেচি—তাঁকে এই খবর দিয়ো। যদি ভাল চান ত নববর্ষের উৎসবে আস্‌তে যেন চেষ্টা করেন—এখানে তাঁর কাজের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ আছে। ইতি

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

[শান্তিনিকেতন *] এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, আজ বিকালের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। দুইএক দিন থাকব। শরীর ক্লান্ত আছে। ইতি শুক্রবার

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা * ২৬ জুন ১৯১৭

ওঁ

কাল বুধবারে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় বিচিত্রা সভায় বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থপ্রকাশের নিয়মালোচনার জন্যে ব্রজেন্দ্রবাবু যদু সরকার প্রভৃতি অনেকে মিলিত হবেন। অতএব তুমি তোমার সিংহদের সঙ্গত্যাগ করে কিছুক্ষণ নরসিংহ নরশার্দূলদের সালোক্য ও সামীপ্য উপভোগ করতে এস। আমার বর্ত্তমান ঠিকানা ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ট্রীট। মঙ্গলবার।

২৮ অক্টোবর ১৯১৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনে আমার সেই কোণ আশ্রয় করেছি। এখানে চারিদিকেই ছুটির হাওয়া, কেবল আমারই ছুটি নেই। দেশবিদেশের এত চিঠি জমেছে যে সমস্ত দিন ধরে উত্তর লিখ্চি; উত্তরে বাতাসের ঝড়ে আমার ছুটি থেকে কেবলি পত্র খস্‌চে। এর উপরে বিদ্যালয়ের কাজও আছে।

অরুণদের সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। আশা-করি সে সুস্থ আছে, শান্তিতে আছে এবং যথাসম্ভব বিনাবাক্যে কালাতিপাত করচে। শুনছিলুম তার প্রিন্সিপালকে নিয়ে

কাগজে গোলমাল চলছিল, ভরসা করি অরুণ তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নি। ইতি ১১ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ অক্টোবর ১৯১৯

Shillong

কল্যাণীয়েষু

এখন ছুটি। তাই শিলঙ পাহাড়ে বিশ্রাম অনুসন্ধানে এসেছি। কিন্তু একাদশীর দিনে কেউ কেউ যেমন ভাত খায় না বলেই গুরুপাক সামগ্রী বিস্তর খেয়ে বসে, আমার ছুটিও সেই রকমের। নিয়মিত কাজ বন্ধ থাকে বলেই অনিয়মিত কাজের চাপ অপরিমিত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে একটু আধটু সৌখীন ধরণের যে বাংলা লেখা চল্‌ছিল তাকে আমি ডরাইনে কিন্তু ইংরেজি ভাষায় আনমনে লেখা চলে না। মোটর গাড়ির রাস্তা বেয়ে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণে যাবার সময় শ্বশুরবাড়ির সুখস্মৃতিতে যেমন মন উতলা করলে চলে না, সর্ব্বদাই হাওয়াগাড়ির শিঙে ফোঁকার প্রতিই কান রাখতে হয় তেমনি ইংরেজি লেখবার সময় কলমটাকে বেশ আরামে পায়চারি করাবার জো নেই—সর্ব্বদাই মাষ্টার মশায়ের হুঙ্‌কারের প্রতি কান পেতে থাক্‌তে হয়। এই ভূমিকার থেকে বুঝবে ছুটির ক'টা দিন ইংরেজি লিখে কাটাচ্চি—সুতরাং

এ'কে ছুটি বলা চল্‌বে না। অষ্ট্রেলিয়ায় যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবগুলির কাছ থেকেই নিমন্ত্রণ পেয়েচি। বাঙালীর মনের কথা যদি বাংলা ভাষায় বল্‌লে চল্‌ত তাহলে ভাবনা ছিলনা—কিন্তু মন সহজে যে ভাষায় কথা কয় ঠিক তার উল্টো ধরণের ভাষার লাইনে কলম চালাতে হবে—এই অত্যন্ত বোয়াড়া রকমের সার্কাস প্র্যাক্‌টিস করতে আমার শারদীয় অবকাশ কাটাতে হবে।

এবারে আশ্রমে ছুটি হবার আগের দিনে শারদোৎসব অভিনয় হয়ে গেচে। তোমাদের দলের মধ্যে প্রশান্ত এবং সিদ্ধান্ত এসেছিলেন। এঁরা বলেন এবারকার অভিনয়টা সকল বারের সেরা হয়েছিল। এ খবরটা যে আত্মশ্লাঘার জন্যেই তোমাকে দিলুম তা নয়—লঙ্কাদ্বীপে তোমার কিঞ্চিৎ চিত্তদাহ হবে সে অভিপ্রায়ও আছে।

তোমাদের কলেজের যে বর্ণনা করেচ তা পড়ে খুসি হলুম। এই বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌বার ভার তুমি গ্রহণ কর। আপনাকে হারিয়ে ফেলা যে কি সর্বনাশ সেটা এদের বুঝিয়ে দিয়ো—নিজের দেহটাকে বিক্রি করে অন্যের পুরোনো কাপড় কেনার মত এত বড় ঠকা আর কিছু হতে পারে না সেটা যেন ওরা উপলব্ধি করে। সিংহলে একবার বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবার বাঙালীর মানসিক উপনিবেশ ওখানে স্থাপিত কর। যদি দুই এক জনকে বাংলা ভাষা শিখিয়ে দিতে পার তাহলে বাংলার সঙ্গে সিংহলের আর একবার নাড়ীর যোগ হতে পারবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় যাবার পথে একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে। ইতি ৩ কার্ত্তিক ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ রথী বল্‌চেন তুমি তাঁকে কোন্ চিঠি কপি করে দেবে এবং তার বদলে তিনি তোমাকে ছবি দেবেন এই কথা ছিল।

৮

৩ ডিসেম্বর ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আশ্রমে ফিরে এসেচি। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পথে গৌহাটি, শিলেট ও আগরতলা ঘুরে এলুম। বলা বাহুল্য বক্তৃতার ত্রুটি হয়নি। দিনে চারটে করে বেশ প্রমাণসই বক্তৃতা দিয়েছি এমন দুর্ঘটনাও ঘটেচে। এমনতর রসনার অমিতাচারে আমি যে রাজি হয়েচি তার কারণ ওখানকার লোকেরা এখনও আমাকে হৃদয় দিয়ে আদর করে থাকে এটা দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম। বুঝলুম কলকাতা অঞ্চলের লোকের মত ওরা এখনো আমাকে এত বেশি চেনেনি—ওরা আমাকে যা-তা একটা কিছু মনে করে। তাই সেই সুযোগ পেয়ে খুব কষে ওদের আমার মনের কথা শুনিয়ে দিয়ে এলুম। একটা

গল্প আছে—একটি ছোট মেয়ে পশুশালা দেখতে এসেছিল। জিরাফের খাঁচাটার সাম্‌নে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তার পরে মুখ ফিরিয়ে এই বলে চলে এল— I simply don't believe it. খুব বেশি সমাদর পেলে আমারও ঠিক ঐ রকম মনের ভাবটা হয়। ভাবি, এ কখনো সম্ভব হতে পারে? কিন্তু এবারে এখানকার মানুষের কাছ থেকে যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলুম সেটা বিশ্বাস হল। ওরা সরল। ভাবলুম ওদের বোধ হয় বুদ্ধি কম, নইলে ভক্তি বেশি হবে কেন? যাহোক্, যখন কিছু বলবার ইচ্ছে হবে (বয়স বেশি হলে বাচালতা বাড়ে) তখন একদম শিলেট চাটগাঁ আসাম প্রভৃতি প্রদেশে গিয়ে হাজির হব, এইরকম স্থির করেচি। তুমি যে লঙ্কাদ্বীপে গিয়েচ সে জায়গাটাও বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হবেনা—অগ্নিকাণ্ড করবার পক্ষে, তা আমি বলচিনে। ওরা বোধহয় অনেক খ্যাতনামাদের সম্পর্কে আসে নি, আর অনেক বক্তার অনেক বক্তৃতা শোনে নি, তাই ওদের মন তাজা আছে, কথার ভিতর দিকে যদি কোনো স্বাদ থাকে সেটা বোধহয় এখনো পায়— অতএব তুমি ওদের জন্যে কিছু কাজ করতে পারবে বলে আশা হয়। বিদেশের ধূলায় ওরা চাপা পড়ে গেছে, তুমি কোদাল হাতে ওদের বের করে তোল— ওরা নিজেদের নিজেরা আবিষ্কার করুক— ওদের মধ্যে কি লিপি লেখা ছিল, সেটা পড়ুক, তার মানে বোঝবার চেষ্টা করুক। তুমি ঐতিহাসিক,— ইতিহাসের সজীবক্ষেত্রে এদের দাঁড় করাও, বুঝিয়ে দাও ইতিহাসের

প্রত্যেক অধ্যায়ের চরম কথাটা হচ্চে, "আত্মানং বিদ্ধি"।

ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জানুয়ারি ? ১৯২১]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আর ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যে রেলগাড়িতে উঠ্‌তে হবে। তার পরে কাল চড়ব জাহাজে। নিজেকে যেন একটা মালের বস্তা বলে মনে হচ্চে। যদি তোমাদের বয়স থাক্‌ত তা'হলে ভাবী আশার নেশায় এতক্ষণে ভোর হয়ে থাক্‌তুম— কিন্তু যৌবন যে গেছে তার প্রমাণ এই যে, নড়াচড়া ভাল লাগ্‌চে না— স্থবিরত্ব হচ্চে স্থাবরত্ব।

সুকুমারের দিদির বই এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে ছিল— অতি সত্বর সেটা আদায় করবার পরামর্শ দিয়ো— কেননা তার জিনিষপত্রের মধ্যে নশ্বর জগতের নশ্বরতা যত সপ্রমাণ হয় এমন আর কোথাও না।

হার্ভার্ডে লানমানের সঙ্গে দেখা হলে তোমার সম্বন্ধে আলোচনা করব— যদি কোনো সুবিধা করতে পারি চেষ্টার ত্রুটি হবেনা। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিয়ো।

আবার বসন্তে দেখা হবে—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[ফেব্রুয়ারি—মার্চ ? ১৯২১]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার এখানকার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এল। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি আটলান্টিক পাড়ি দেবার ইচ্ছে। য়ুরোপে ফেরবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে আছে। এ দেশটা য়ুরোপের উপগ্রহ; তার সঙ্গে বাঁধা কিন্তু মস্ত একটা তফাৎ আছে— য়ুরোপের চারদিকে যে প্রাণময় বায়ুমণ্ডলী আছে এদেশের তা নেই— ভারি শুক্‌নো। বাতাস থাক্‌লে আলোতে ছায়াতে যে গলাগলি হয় এখানে তা নেই— সব যেন কাটা-কাটা ছাটা-ছাটা। আমার ত এখানে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌চে। আমি এ দেশকে এত কম জানি যে, বিচার করতে পারিনে, কিন্তু তবু আমার মনে হয় এখানে যেটা আমাকে পীড়ন করে সে হচ্চে এখানে বেশি জান্‌বার নেই;— যেন আমাদের কোপাই নদীতে ডুবসাঁতার কাট্‌বার চেষ্টা— আর সব আছে, পাঁক আছে, বালী আছে, গর্ত্ত আছে, জল এক হাঁটুর বেশি নয়।

Dr. Woods কে তোমার কথা বলেছিলুম তিনি বলেছিলেন মার্চ্চ মাসের মধ্যে দরখাস্ত করলে তোমার পক্ষে স্কলারশিপ পাওয়া শক্ত হবেনা। তাতে যেন উল্লেখ থাকে যে তুমি কলেজের প্রিন্সিপাল ছুটিতে আছ। আমি রথীকে বলেছিলুম তোমাকে জানাতে— সে বোধহয় ভুলে গেছে।

যাহোক তুমি অধ্যাপক লেভির certificateসহ দরখাস্ত কোরো।

আমার গানের তর্জ্জমা পেয়ে আমি বড় খুসি হয়েছি অধ্যাপককে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ো—শীঘ্রই তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় এখানকার প্রবাস দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করচি। একটা জিনিশ এখানে দেখা গেল—বর্ত্তমানে সমস্ত United States ইংলণ্ডের হাতে—তারাই এখানকার মন ধন এবং রাজসিংহাসন অধিকার করেচে। এখানে ভারতবর্ষের স্থান সঙ্কীর্ণ হয়েচে—ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও এখানকার মন উত্তেজিত। তোমরা যখন এদেশে আসবে সুখী হবেনা।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

১৯ এপ্রিল ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্যারিসে এসে দেখি, তুমি নেই। ফাঁকা বোধ হচ্চে। এখানে সেই আমার জানলার কোণে লেখবার ডেস্কের কাছে চুপচাপ বসে আছি। আলোচনা করবার মত কথা অনেক

জমে উঠেচে—তুমি থাকলে বসে বসে সেগুলি খালাস করবার চেষ্টা করা যেত। যা হোক্ স্ট্রাসবুর্গে যাব। প্রথমে যাচ্চি স্পেনে— আগামী মঙ্গলবারে যাত্রা করব। সেখান থেকে কোথা দিয়ে কোথায় যাওয়া সহজ সেটা হিসেব করে দেখতে হবে। ইটালি স্থইজারলাণ্ড, জার্ম্মানি, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড স্থইডেন এবং নরোয়ে— এই কটা দেশ দেখ্‌তে হবে। তোমরা কেউ সঙ্গে থাকলে বেশ হত। যাহোক এই ঘুরপাকের মধ্যে কোনো একটা ভাগে স্ট্রাসবুর্গে যেতে পারব।

দেশে ফিরব জুনের শেষে। তখন আকাশের পূর্ব্ব দিগন্তে নবমেঘের ভ্রূকুটী অন্তরালে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখা যাচ্চে। তুমি কি ভাবচ আমি তখন দেশে রাষ্ট্রনায়কের পদ গ্রহণ করে চরকার চক্রান্তে যোগ দেব? আমাকে তুমি কাজের লোক মনে করচ? আমি যদি জগতের উপকার করবার লোভে পড়ে বিধাতার খাতাঞ্চিখানায় গিয়ে কাজের মজুরী নিয়ে আসি তা হলে আমার জাত যাবে যে,— বেকার কুলীনদের পংক্তিতে আমার স্থান হবে না। তাহলে আকাশের মেঘ যখন তার বার্ত্তা পাঠাবে তখন ধরণীর মেঘমল্লারে তার জবাব দেবে কে? আমি দক্ষিণ হাওয়ার পথের পথিক, আমাদের চাল হচ্চে এলোমেলো চাল, আমাদের কাজ হচ্চে কাজে ফাঁকি দেওয়া— আমরা সভাসদদের দলের লোক নই— দরবার ভাঙলে তবে আমাদের ডাক পড়ে। এতদিনে এটুকু তোমার বোঝা উচিত

ছিল যে আমি মহাযান সম্প্রদায়ের। যাহোক, দেখা হলে বোঝাপড়া হবে। ইতি ১৯ এপ্রেল ১৯২১

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য্য লেভীকে আমার নমস্কার দিয়ো— এ সময়ে তিনি প্যারিসে নেই এ আমার দুর্ভাগ্য।

১২

২৮ অক্টোবর ১৯২১

Shantiniketan
Oct. 20, 1921

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, তোমার এবারকার চিঠিখানি পড়ে বড় খুসি হলুম। কাল যে নিরবধি এবং পৃথিবী যে বিপুলা আমাদের এ দেশে সে কথা বারবার ভুলে যেতে হয়। তুমি ইটালিতে দান্তে-উৎসব থেকে আহরণ করে সেই নিরবধি কালের হাওয়া তোমার চিঠিতে এখানে পাঠিয়ে দিয়েচ— এতে আমার হৃদয় যেন অনেকদিন পরে খানিকটা হাঁফ ছেড়ে নিতে পারল। আমাদের দেশে লোকসমাজে জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিত যে কত সঙ্কীর্ণ তা য়ুরোপে থাকতে একেবারে ভুলে যেতে হয়, তাই সেখানে যেসব সঙ্কল্প করেছিলেম এখানে দেখি তার প্রশস্ত

স্থান নেই। এখানে যে ভাষা সে গ্রাম্যভাষা, এবং তার মধ্যে দিয়ে যে বার্ত্তা দেওয়া যায় তা বিশ্বের বার্ত্তা নয়— তাতে কলহ করা চলে এবং খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখা যায়। কোনো বড় সঙ্কল্প যখন মনের মধ্যে বহন করা যায় তখনি নিজের পরিবেষ্টনের যে অনৌদার্য্য সেটা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে থাকে। এতদিন শান্তিনিকেতনের সৃষ্টিকার্য্য আমার একলার হাতেই ছিল-- এর দ্বারা মস্ত কোনো লোকহিত করচি সে কথা ভাবিও নি— কেবলমাত্র একলা মাঠের মধ্যে বসে অন্তরের ভাবনাকে বাহিরের সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড় করাচ্ছিলেম। কিন্তু বিশ্বভারতী ত লিরিক জাতীয় কর্ম্ম নয়, এ হচ্চে এপিক জাতীয়। আমার দেশ যদি এ কাজ গ্রহণ না করে তবে আমার পক্ষে এ একটা বিষয় বোঝা হয়ে উঠবে। আমি কিন্তু বোঝা বইবার মজুরী করব বলে' বিধাতার হুকুম পাইনি— আমাকে স্বাধীন থাক্‌তে হবে। য়ুরোপে আমি এত বেশি আদর পেয়ে এসেচি, আমার দেশের কাছে সেইটেই আমার পক্ষে লাঞ্ছনার কারণ হয়ে উঠেচে। সবাই বল্‌তে চায় যে, যে-হেতু আমি অন্তরে অন্তরে বিজাতীয় ভাবাপন্ন সেই জন্যেই বিদেশীর কাছে আমার সম্মান। যেন ভারতবর্ষের যে আলো সে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের চক্ষুকেই দৃষ্টি দেয় অন্য দেশের পক্ষে তা অন্ধকার— যেন ভারতবর্ষের ক্ষেতে যে-ফসল ফলে বিদেশের কাছে তা অন্নই নয়। অথচ এইসব অত্যুচ্চ স্বাজাতিকরাই, উড্রফ সাহেব যখন তন্ত্রশাস্ত্রের গুণগান করেন, তখন বলেন না, অতএব তন্ত্রশাস্ত্রে ভারতীয়তার অভাব আছে।

যাই হোক এইসব নানা দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি জানকীর মতই আমার বর্ত্তমান অবস্থাকে বলচি তুমি দ্বিধা হও আমি অন্তর্ধান করি। সে আমার অনুরোধমত দ্বিধা হল। একদিকে কাব্য, আরেক দিকে গান। আমি এরই মধ্যে তলিয়ে গেছি। আমি প্রায় রোজই একটি দুটি করে বাল্যকালের কবিতা লিখ্‌চি। এই বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমানদের জগৎ থেকে আমি যেন পলাতকা। আমার আরেকবার বোঝা দরকার হয়েচে যে এই জগৎটা খেলারই ধারা— আর যিনি এই নিয়ে আছেন তিনি নিত্য কালেরই ছেলেমানুষ। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারার কোনো ব্যবহারিক অর্থ ই নেই, তাদের পারমার্থিক অর্থ— তারা হ'চ্চে, তারা হ'ল, আর কিছুই না। তারা রূপ, তারা কথা, তারা রূপকথা। এইজন্যই যখন আমরা রূপ দিচ্চি, কথা গড়চি, রূপকথা বলচি তখনই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে আমাদের সুর মিল্‌চে। তাই যেদিন সকালে ছোট্ট একটুখানি গান তৈরি করি সেদিন প্রকাণ্ড এই কর্ত্তব্য জগতের ভারাকর্ষণটা একেবারে শূন্য হয়ে যায়, সেদিন ইণ্টারন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির গাম্ভীর্য্য দেখে হাসি পেতে থাকে। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি— হায়রে হায়, জীর্ণ কীর্ত্তির ধূলিস্তূপের নীচে কত অসংখ্য নাম আজ চাপা পড়ে আছে। কিন্তু আমার আজ সকালের গান! মানুষ ওকে ভুলে গেলেও ও চলে' যেতে যেতে অন্য গানকে জাগিয়ে দিয়ে যাবে— জগতের সেই গানের চির ধারার মধ্যে ওর গতিবেগ মরবে না— বিশ্বসৃষ্টির ছন্দদোলার মধ্যে ওর দোলনটুকু রইল। তাই

বারবার মনে ভাবি আমি আমার খেলার দোসরকে তাঁর চন্দ্রসূর্য্য পুষ্পপল্লবের মধ্যে একা বসিয়ে রেখে আজ কার বোঝা ঘাড়ে করে কোন্ চুলোয় চলেচি। সমস্তই ধুলোর মধ্যে ধপাস্ করে ফেলে দিয়ে দৌড় মারতে ইচ্ছে করচে। ইস্কুলে পড়তে গিয়েছিলেম পারিনি, সম্পাদকী করতে গেলেম ছেড়ে দিলেম, পলিটিক্সে টানে যখন, বাঁধন কেটে পালাই। অতএব আমার নির্ব্বাসন সমস্ত জবাবদিহি থেকে ;—আর আমি আমার যে দোসরের কথা পূর্ব্বেই বলেচি তাঁরও সেই অবস্থা।

সকালে যে দুটো গান তৈরি করেচি লিখে পাঠালুম। ইতি ৩রা কার্ত্তিক ১৩২৮

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২১ জুন ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ঘোর বাদল নেমেচে। তাই আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দী-চিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশ-রঙ্গভূমিতে জলবাতাসের মাতনের যুগযুগান্তর-বাহিত

স্মৃতি-স্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্তব্যবুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল,— সম্প্রতি আমি আমার সাম্‌নেকার ঐ সারবন্দী শালতালমহুয়া-ছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণরাজ্যে ওদের হ'ল বনেদি বংশ, ওরা কোন্ আদিকালের রৌদ্রবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ ক'রে চলেচে। ওরা মানুষের মত আধুনিক নয়, সেইজন্যে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসে নি। তাই তরুলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ বলে অবজ্ঞা করে না। এই জন্যেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উতলা করে' দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিবাগী করে' প্রাণের খেলা-ঘরে ডাক্‌তে থাকে— আমাদের মর্মের মধ্যে যে ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্চে আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন পূর্বজ, সেই আমার কর্মশালাটি দখল করে বসে। সেইজন্যেই বর্ষা পড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি, কাজকর্ম ছেড়ে গান তৈরি করচি— সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সবচেয়ে কম মানুষ হয়েচি— আমার মন ঘাসের মত কাঁপচে, পাতার মত ঝিল্‌মিল্ করচে। কালিদাস এই উপলক্ষ্যেই বলেছিলেন, "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।" অন্যথাবৃত্তি হচ্চে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি। এই বৃত্তি আমাদের সেই সুদূরকালে নিয়ে যায় যখন প্রাণের খেলা চল্‌চে, মনের মাস্টারী সুরু হয় নি—

আজ যেখানে ইস্কুলের মোটা থাম উঠেচে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে। যাই হোক, এই সময়টাতে ঘন মেঘে মধ্যাহ্ন ছায়াবৃত, মাঠে মাঠে বাদল হাওয়া ভেঁপু বাজিয়ে চলেচে, আর ছোট ছোট চঞ্চল জলধারা ইস্কুল-ছাড়া ছাত্রীদের অকারণ হাসির মত চারদিকে খিল্‌খিল্‌ করচে। আজ ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি, আজ অম্বুবাচী আরম্ভ হল। নামটা সার্থক হয়েচে, সমস্ত প্রকৃতি আজ জলের ভাষায় মুখর হয়ে উঠ্‌ল। ঘন মেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেচে— তৃণসভার গায়েনের দল ঝিল্লিরাও নিমন্ত্রণ পেয়েচে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েচে "মত্ত দাত্বরী।" এ আসরে আমার আসন পড়ে নি যে তা মনেও কোরো না। মেঘের ডাকের জবাব না দিয়ে চুপ করে' যাব, আমি এমন পাত্র নই। মেঘের পর মেঘের মত আমারো গান চলেচে দিনের পর দিন— তার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই— মেঘ যেমন "ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" সেও তেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি। ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জন ধ্বনিতে গান ধরেচি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেচে
আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হ'ল
অকারণে—

ঠিক এমন সময়ে সমুদ্রপার হ'তে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান কি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল

মানবসংসারে আমার কাজ আছে,— শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চল্‌বে না, মানব-ইতিহাসের যে সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীব আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আস্‌তে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র :— সে হচ্চে খৃষ্টান আর মুসলমান-ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃষ্টান-ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে ধর্ম্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃষ্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। "য়ুরোপীয় বৌদ্ধ" বা "য়ুরোপীয় মুসলমান" শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে যে-জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। "মুসলমান বৌদ্ধ" বা "মুসলমান খৃষ্টান" শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপরপক্ষে হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মত। অর্থাৎ তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্চে এই যে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়,— অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-co-operation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক

হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে' মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মস্‌জিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেচে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টান্‌তে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেচে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারী-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বস্‌তে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে' গণ্য করার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই।— ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মত দুই জাত, একত্র হয়েছে ;— ধর্ম্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয় আচারে প্রবল,— আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্ম্মমতে প্রবল,— এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এ'রা কি করে মিল্‌বে ? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো সে "হিন্দু" যুগের পূর্ববর্ত্তীকালে। হিন্দুযুগ হচ্চে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ,— এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে এ'কে

দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না,
কোনো প্রাণবান জিনিষকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে
সাম্‌লাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক্ মোট
কথা হচ্চে, বিশেষ একসময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি
বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে
পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই
আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মত
করেই গড়ে তুলেছিল— এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং
প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ
কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্ট হয় নি। এই
বাধা কেবল হিন্দু মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মত
মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক,
বাধাগ্রস্ত। সমস্যা ত এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের
পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের
ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে' মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক
যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দু মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে
যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মত তৈরি করে তারই মধ্যে
সমগ্র জাতিকে ভূতলোকের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে
রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো
মেল্‌বার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে
অবরোধ রয়েচে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো
রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা
মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে— ডানার চেয়ে খাঁচা বড় এই

সংস্কারটাকেই বদ্‌লে ফেল্‌তে হবে তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু মুসলমানের মিলন, যুগ পরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্যদেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়েচে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেচে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আস্‌ব; যদি না আসি তবে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২৯

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

১৪ নভেম্বর ১৯২২

ওঁ

ত্রিবিন্দ্রম

কল্যাণীয়েষু

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। সম্প্রতি আছি ত্রিবঙ্কুরে। এখনি বেরতে হবে। বিশ্বভারতী প্রচারের ভার নিয়েচি। ভাবটা লোকের মনে প্রবেশ করেচে। যেখানে কিছু বলেচি সেখানেই লোকের মনে লেগেচে। আশা করচি ভারতবর্ষের সর্বত্র থেকে সভা পাওয়া যাবে। আমি চাই বিশ্বভারতী বিশ্বভারতের হৃদয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হয়। তুমি যখন আস্‌বে দেখবে অনেক দূর কাজ এগিয়েচে। শান্তিনিকেতন এখন আর

বোলপুরের কোণে নেই— বেরিয়ে পড়েচে— এখন তার রথ-যাত্রা। আমি এতদূর আশা করি নি— কারণ গান্ধি তাঁর সন্ন্যাসীর কম্বল দিয়ে ভারতবর্ষকে বিশ্বের কাছ থেকে ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন। প্রথম যখন দেশে ফিরে এলুম তখন দেখতে পেলুম বিশ্বমণ্ডলী থেকে ভারতবর্ষ দূরে চলে গেছে। ভারি উদ্বেগ মনে জেগেছিল। আজকের দিনে যখন সমস্ত জগতে একটি মহান্ ভাবী যুগের সাড়া এসেছে, অতিথি বল্‌চেন অয়মহং ভোঃ, তখন ভারতবর্ষই বধির হয়ে তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলে তার অভিসম্পাৎ দুঃসহ হবে। যাই হোক্ এখন দেখ্‌তে পাচ্চি, মাঝে ভারতবর্ষের বিশ্বচৈতন্যকে জোর করে চাপা দেওয়া হয়েছিল বলেই সে নিজের বিরাট্‌কে ফিরে পাবার দিকে উন্মুখ হয়ে উঠেচে। আশ্চর্য্য এই যে, আমি কোথাও এবার বাধা পাই নি। পথ এখন প্রতিদিন সুগম হয়ে আস্‌চে এখন কেবল সহকারী সুহৃদবৃন্দের দরকার। এ পর্যন্ত পশ্চিম মহাদেশ থেকেই আনুকূল্যের প্রস্তাব এসেচে। এখন দেশের লোকের সহযোগিতার প্রতীক্ষায় আছি। প্রশান্ত খুব কাজ করচে। তুমি ফিরে আসচ এতে আমার মন খুব আশান্বিত হয়ে উঠেচে। মনে রেখো তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। বিশ্বভারতীতে তুমি তোমার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাবে। তুমি বিশ্বভারতীর জন্যেই যথাযথভাবে প্রস্তুত হয়ে আস্‌চ— আমি তাই তোমার প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।

আমার নিজের হাতে আর বেশি সময় নেই— অস্তগমনের কাল কাছে আস্‌চে— আমার শেষ দান তোমাদের হাতে দিয়ে

যেতে পারলে আমার মন প্রসন্ন হবে।

রথীকে বলেচি বিশ্বভারতীর সংস্থানপত্র প্রভৃতি প্যারিসে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। সেখানকার ভারতবাসীদের সভ্য করবার চেষ্টা কোরো।— এখন তবে চলি। রথ প্রস্তুত— সহযাত্রীরা তাড়া লাগিয়েচে। ইতি ১৪ই নবেম্বর ১৯২২

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১ জানুয়ারি ১৯২৪]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

হিন্দু য়ুনিভর্সিটি কন্‌ভোকেশনে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। প্রথমে টেলিগ্রাফ করেছিলুম যাব না। মনে করেছিলুম আমার বদলে রথীরা গিয়ে বরোদার মহারাজকে চেপে ধরবে। কিন্তু রথীরা দিল্লির সপ্তভূপতিসঙ্গমে যাচ্চে— তারা যখন দিল্লিতে রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী ঠিক সেই সময়েই বরোদা বারাণসীতে। আমি চীনে চলে যাব, রাজা যাবেন য়ুরোপে— মাঝের থেকে বিশ্বভারতীর ঝুলি ধনাধ্যক্ষের হাতে শূন্য ফিরে আসবে। তাই রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাতে যেতে হবে। সেখানে বিজয়-নগরমের ভূতপূর্ব মহারাণীও যাচ্চেন। তাঁর সঙ্গেও দেখা করা

দরকার হবে। তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই, তুমি সেখানে একটা লেকচার দেবে, সেটাতে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থান তোমাকে নির্দেশ করতে হবে। বৃহস্পতিবার রাত্রে ছাড়ব রবিবার রাত্রে প্রত্যাবর্ত্তনের যাত্রা করব। ঐ কয়দিন যদি কলেজে কাজ থাকে ছুটি নিয়ো। আসলে কেবল শুক্রবারটা তোমাকে হয়ত কাজ কামাই করতে হবে— শনিরবি ত তোমাদের প্রায়ই ছুটি থাকে। অতএব এতে তোমার কর্ত্তব্যের বিশেষ ত্রুটি হবে না। অথচ কবিসঙ্গমে তীর্থদর্শনও হতে পারবে। পথিমধ্যে নানা আলোচনার অবকাশও পাওয়া যাবে। ইতি ১১ জানুয়ারি ১৯২৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

ওঁ Feb. 26. 1924

কল্যাণীয়েষু

Romain Rollandকে যে চিঠি লিখেচি তার কপি তোমাকে পাঠাই। কাগজে ছাপাবার জন্যে নয়, তোমার দেখবার জন্যে।

ভারতীকে যে কবিতা দিতে বলেছিলুম সেটা মণিলালকে এখনো দিলে না কেন?

একটা সনেট লিখেচি। কপি ক'রে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দিয়ো।

যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষ বেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে; নিখিলের আনন্দ মেলায়
স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি কম্পিত পরশে
চম্পক অঙ্গুলিপাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা,
এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

১৭

২২ ডিসেম্বর ১৯২৪

ওঁ　　　　বুয়েনোস্ আইরিস্

কল্যাণীয়েষু

আজ ৭ই পৌষ। মন আজ তোমাদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে। এবারকার যাত্রাটা ঠিক শুভলগ্নে আরম্ভ হয় নি। শরীরটা বিগড়ে বসে আছে। পেরু যাওয়া বন্ধ। কিন্তু কিছুই না করেও এখানকার লোকের প্রচুর আদর পাচ্চি। এদের দেশে আছি এতেই এরা খুসি। আগামী ৩রা জানুয়ারি ইটালিতে যাত্রা করব। আশাকরি সেখানকার কাজে বাধা হবে না।

শরীর মন যখন পীড়িত হয় তখন আমি কবিতা লিখি। জলকে পীড়া দিলে তবে সঙ্কীর্ণ ছিদ্র দিয়ে ফোয়ারা ছোটে। প্রশান্তকে কিস্তি কিস্তি কবিতা পাঠিয়েছি, নিশ্চয় দেখেচ, ২৪ অক্টোবরে "ঝড়" বলে যে কবিতা লিখেছিলুম তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারচি যে, সেই সময়ে হাওয়া বেয়ে একটা নিবিড় ব্যথা আমার মনকে প্রবল ঝাপটা দিয়ে গিয়েছিল। তার ইংরেজিটা তোমাকে পাঠাচ্চি। আরো গোটাকতক কবিতা পাঠালুম—প্রশান্তদের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ কোরো। এবার-কার কবিতাগুলো যেন স্বপ্নে লেখা—ভালো কি মন্দ তা বুঝতেই পারি নে— যখন খুসি তখন, যেমন খুসি তেমন করে লিখেই গেছি। আমার কবিত্বশক্তির মাপকাঠিহাতে যারা গম্ভীর হয়ে বসে থাকে তারা যে এই বিশ্বের কোনোখানে

আছে তা একেবারেই মনে ছিল না। মাঝখানে দীর্ঘ কিছুকাল ভোলবার সময় না দিলে এ কবিতাগুলো সম্বন্ধে আমি নিজেই বিচার করতে পারব না। হারুনা মারু থেকে তোমাদের যে কবিতা ইত্যাদি পাঠিয়েছিলুম তার এক বর্ণ আজ আমার মনে নেই। সেগুলো সব উড়ো কাগজে লেখা, বাঁধা খাতায় লেখা নয়। প্রশান্তকে যে কবিতাগুলো পাঠাই তাতে অনেক বদল থাকে যা আমার খাতায় নেই অতএব সেগুলো যেন নষ্ট না হয়। এত নানা জায়গা থেকে ডাকে পাঠিয়েছি যে সবগুলো সে পেয়েছে কিনা তাও জানি নে। কি রকম অস্বাস্থ্যের ক্লান্তিতে হিজিবিজিলেখার মেজাজে আজকাল কবিতা লিখি তার একটা ডাকে-মারা-যাওয়া নমুনা তোমাকে নিম্নে লিখে পাঠাই :—

অস্তিত্বের বোঝা
বহন করা ত নয় সোজা।
পাঠশালে কতকাল পুঁথিদানবের সাথে যোঝা।
ছেঁড়া ছাতা কক্ষে নিয়ে অহোরাত্র পথে পথে খোঁজা
ডালভাত বধূ বন্ধু চাকুরি-বাকুরি জুতো মোজা।
কোনো মাসে জোটে রুজি, কোনো মাসে রুটিশূন্য রোজা।
নানা সুরে হাসি কান্না, বোঝা ও না-বোঝা, ভুল বোঝা।
সভাতলে ছুটোছুটি ঝুটোপুটি রাজা আর প্রজা।
একদিন নাড়ী ক্ষীণ বালিসে আলসে মাথা গোঁজা,
ভিটেমাটি বাঁধা রেখে বহু দুঃখে ডেকে আনা ওঝা,—
তহবিল ফঁকি bill-এ সবশেষে শেষ চক্ষু বোজা॥

বলা বাহুল্য এটা পুনশ্চ ডাকে মারা যাবার অভিপ্রায়েই তোমাকে লিখে পাঠালুম; এটাতে পস্টারিটির ঠিকানার টিকিট মারা হয় নি। তিন সমুদ্র পারে আছি— ভারতসাগর, মধ্য-ধরণী সাগর আর অতলান্তিক— তোমাদের সদ্য খবর পাবার আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেচি। য়ুরোপে পৌঁছে তাজা খবর পাব বলে ভরসা করে আছি— কিন্তু যে রকম আভাস পাওয়া যাচ্চে তাতে বোধ হচ্চে ভারতের খবরের পনেরো আনাই shoe-খবর। "গোরু মেরে জুতোদান" বলে একটা প্রবাদ আছে; কর্ত্তারা আমাদের গোরুও মারচে, আমাদের জুতোও দান করচে; এ'কে বলে শূ-শাসন। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

১৮

৯ জানুয়ারি ১৯২৫

ওঁ ৯ জানুয়ারি ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

ইটালি অভিমুখে চলেচি। কিন্তু মনে উৎসাহ পাচ্চি নে, মনে হচ্চে এবার অযাত্রায় বেরিয়েছি। আসল কথা, প্রাণের শিখা ম্লান হয়ে এসেচে। বুয়েনোস্ আইরেস্-এর বড় দুজন ডাক্তার আমাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে পরীক্ষা করে শেষকালে রায় দিয়েচেন, যে, দেহের কল আর বল এই দুটো পদার্থের

মধ্যে কলটা আছে ঠিক, বলটা নেই। তার মানে হচ্চে এই যে প্রদীপটা ফুটো হয় নি, শিখাটা ম্লান হয়ে এসেচে। তেলটাকে কেবলি ক্ষয় করে' এসেছি ভর্ত্তি করবার সময় দিই নি। পেরুতে যাবার জন্যে দু'বার চেষ্টা করেচি, ডাক্তারের নিষেধ দু'বার দ্বার রোধ করে দাঁড়ালো। অবশেষে এবার ফিরে চলেচি। আর্জেন্টিনাতে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিইনি, কিন্তু শেষাশেষি আমার নিভৃতনিবাসের দরজা খুলে দিয়েছিলুম। প্রায়ই এক এক দল করে নরনারী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন, তার জবাবে পূরো বক্তৃতা দিত হত। এই উপলক্ষ্যে আর্জেন্টিনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েচে। এখানকার লোকে আমাকে খুবই ভালোবাসে, এ আমি একেবারেই প্রত্যাশা করি নি। আমি যে তাদের দেশে এতদিন ছিলুম এতেই তারা আনন্দিত।

শিখা যখন ম্লান হয়, যখন সাম্‌নের পথের দিকে মন চল্‌তে চায় না তখন সুদূরের পিছনের কথাই মনকে প্রদোষের ছায়ায় ঘনিয়ে ধরে। মৃত্যুর কালো পটের উপর দূরস্মৃতির ছবি স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে। তাই আজকাল আমার মনে আমার কিশোরের সেই সব কালের কথা ঘুরে বেড়াচ্চে যে সব কাল দিগন্তের সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেছে। সামনের দিকে তাদের কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমার কবিতার মধ্যে তাদের আশ্রয়ের জন্যে স্বপ্নলোক বানিয়েছি। এই এক খেলা। এ খেলার ঠিক মানে তোমরা অনেকে বুঝতে পারবে না, কেননা প্রভাতের সূর্য্য তোমাদের চোখের সামনে,

তোমাদের ছায়া পিছনের দিকে, সেদিকে তোমাদের ঔৎসুক্য নেই। আমার আলো পিছনের দিকে, ছায়া আমার সম্মুখের পথে। সেইজন্যে আমার গান, হাওয়ায় পিছনের দিকে উড়ে যাচ্চে, তার সব সুর তোমাদের কানে স্পষ্ট করে পৌঁছবে না। এ কবিতাগুলো এখন ছাপবার দরকার নেই, আমার মৃত্যুর পরে ছাপিয়ো। তা ছাড়া এগুলো নিয়ে কাগজে কাগজে হরির লুঠ দিয়ো না।

ইটালিতে যাচ্চি কিন্তু নতুন পরিচয়ের শক্তি আছে বলে বোধ হচ্চে না। নতুন দেশে যেতে হলে কিছু উদ্‌বৃত্ত হাতে নিয়ে যেতে হয়, সেই উদ্‌বৃত্তের অভাব বোধ করচি। মনের সাম্‌নে শিলাইদহের নদীর চর ভাস্‌চে, ইটালির মানচিত্রে তার স্থান নেই। এমন কি, আমার বিশ্বাস কোনো সমুদ্র পার হয়ে আজ সেখানে পৌঁছন যাবে না। সব মানচিত্র থেকেই সে সরে গেছে, সে কেবল আমার মানসচিত্রেই আঁকা রয়ে গেল।

কবে ভারতবর্ষে গিয়ে উত্তীর্ণ হব ইটালিতে না পৌঁছে এখান থেকে তা স্থির করতে পারচি নে। খুব সম্ভব, রথী জেনোয়াতে আস্‌বে এবং তার কাছ থেকে তোমাদের সকলের এবং দেশের লোকের আধুনিক বিবরণ পাওয়া যাবে। তার পরে সকল দিক বিবেচনা করে যা হয় ঠিক করা যাবে। এতদূরে ছিলুম যে, দেশ ঝাপসা হয়ে গেছে। সেখানকার খবরের কাগজে ভারতবর্ষের স্থান নেই। সেখানকার সব চেয়ে বড় ও ভালো কাগজে অল্পদিন আগে Tower of Silence এর একটা ছবি বেরিয়েছিল, তার নীচে বর্ণনাচ্ছলে লেখা ছিল যে, এখানে

ধর্ম্মবিদ্রোহীদের জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়— ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এই প্রথা নিবারণের চেষ্টা করচে। এই রকম খবরের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটে থাকে। যাই হোক্ ভারতবর্ষ থেকে আমার এতদিনকার অতিদূরত্ব আমার মনকে যেন উপবাসী করে তুলেচে। যখন চীনে জাপানে ছিলুম তখন নির্বাসনবোধ এমন সুতীব্র ছিল না। তার প্রধান কারণ বর্ত্তমান চীন জাপানের ভিতরে অতীত ভারতবর্ষের স্পর্শ পদে পদে পাওয়া যাচ্ছিল; যাই হোক্ ভারতবর্ষের নিকটের দিকে এগিয়ে চলেছি বলে মনটা আরাম বোধ করচে।

ইটালিতে তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে পার্‌তে কাজে লাগ্‌ত। তুমি এদের সবাইকে জানো, ভালো করে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারতে, আমাকে হাৎড়িয়ে বেড়াতে হ'ত না। যাই হোক্ সেখানে যাঁরা তোমার বন্ধু আছেন তাঁরা বোধ হয় আমার দায়িত্ব নিতে পারবেন। কিন্তু এবারে গোড়া থেকেই সব উল্‌টে পাল্‌টে যাওয়াতে মনে হচ্চে যেন বিশেষ সুবিধে হবেনা।

একটা কথা প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলো না। তুমি ত জানই সাঙ্‌ঘাইয়েতে কাতুরির কাছ থেকে কূপখনন উপলক্ষ্যে আট হাজার টাকা নিয়েছিলুম। কথা ছিল এই শীতেই কাজ আরম্ভ হবে। আমি শান্তিকেতন থেকে যত চিঠি পেয়েচি তাতে এ ব্যাপারের কোনো উল্লেখমাত্রই নেই। ভয় হচ্চে পাছে আট হাজার টাকা বিশ্বভারতীর অভাবের অন্ধকূপে

তলিয়ে গিয়ে থাকে। তাহলে নিতান্ত অন্যায় হবে। আমার নাম করে এ সম্বন্ধে গোরাকেও সতর্ক করে দিয়ো। জরুরি প্রয়োজনের কথা জানিয়েই এ টাকা কাতুরির কাছ থেকে পেয়েছিলুম।

প্রবাসীতে নিশ্চয়ই আমার ডায়ারি বেরিয়েচে; এতদিনে একখণ্ড আমার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারত— কিন্তু এখনো পাইনি— শেষ মডার‍্ন্ রিভিয়ু অনেক দিন হল হাতে এসেছিল, তার পনেরো দিন পরে প্রবাসী আসবার কথা, কিন্তু কি কারণে পাওয়া গেল না।

আজ একটা কবিতা লিখেচি তোমাকে পাঠাই। ১৯শে তারিখে জেনোয়াতে পৌঁছব। সেখানে পৌঁছিয়ে এই চিঠি ডাকে দেব। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

৩০ অক্টোবর ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রোগের নির্জ্জন দুঃখের মধ্যে মাঝে মাঝে তোমাকে পেয়ে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেছি। রবি যখন মধ্যাহ্ন আকাশে ছিল তখন দিক্‌চক্র থেকে দূরে দূরেই কাটিয়েছে— এখন অপরাহ্ণ, এখন নেমে এসেছে দিগন্তে, এখন মেঘমণ্ডল নিয়ে

পৃথিবীর স্পর্শ নেবার জন্যে সে ঝুঁকে পড়েছে— এখন নিভৃত আকাশের একেশ্বরত্ব ভোগে তার মন নেই।

আমার কানের বেদনা অনেকটা কমে এসেছে কিন্তু শোনবার পথ এখনো রুদ্ধ হয়ে আছে— ডাক্তার আশা দিচ্চে শ্রুতি আবার ফিরে পাব— কিন্তু এখনো সেদিকে বিশেষ অগ্রসর হতে পারি নি।

শান্তাকে নিয়ে তুমি যে-বনবাসে গেছ তার বিবরণ পেয়ে ঈর্ষ্যা বোধ করচি। আমার নির্ব্বাসন আমার ব্যাধির বেদনাকারার মধ্যে।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ১৩ কার্ত্তিক ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

২ জানুয়ারি ১৯২৬

ওঁ

পর্শু ৪ঠা তারিখে কলকাতায় যাচ্চি। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ো। ইতি ২ জানুয়ারি ১৯২৬

২১

১৩ মে ১৯২৬*

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ক্লান্তিতে যখন আধমরা হয়ে পড়ে আছি এমন সময়ে রামানন্দ বাবুর কাছ থেকে অত্যন্ত কঠিন একখানা চিঠি পেয়ে দেহমন দুইই আরো দমে গেল। তাঁর কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করি নি কারণ তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতির— বাইরের কোনো ঘটনার আকস্মিক উৎপাতে আমাদের পরস্পর ব্যবহারের এমন উলটপালট হয়ে যেতে পারে এ কথা কখনো কল্পনা করি নি। যে সকল ব্যবহারের মধ্যে আমার নিজের হাত নেই তার জন্যে আমার প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা কি যথাযোগ্য হয়েচে?

ইদানীং প্রায় ৪০টা ছোট গীতিকাব্য লিখে তার নাম দিয়েছি "বৈকালী"। সবগুলো একটা খাতায় কপি ক'রছিলুম— মনে ছিল প্রবাসীতে পাঠাব— তাঁদের কাজ হয়ে গেলে ছোট একটি বইয়ে ছাপাব। অনেকগুলো করে কবিতা ছাপানো ভুল— তাছাড়া বারবার মনে হয় আমার বেশি দিনের মেয়াদ নয় তাই জমাবার দূরাশা রাখি নে, হাতে হাতে খরচ করে যাওয়াই ভালো। হয় ত খাতাটা তোমার কাছে পাঠাবো, যদি রামানন্দবাবু প্রসন্নমনে সেগুলি গ্রহণ করতে পারেন তাঁকে দিয়ো— যদি তা অসম্ভব হয় তাহলে রথীর কাছে খাতাটা ফেরৎ দিতে ভুলো না। যে লেখাগুলো আগেই ছাপা হয়েছে

তাতে × চিহ্ন দিয়েছি। তোমরা যদি এগুলো ছাপবার যোগ্য বোধ কর তাহলে কপি করে নিয়ে ছাপিয়ে খাতাটা বই ছাপবার জন্যে ফিরে দিয়ো।

এবার জন্মদিনে তোমাদের সঙ্গে ভালো করে দেখাই হল না— অত্যন্ত কাছে আছি বলেই বোধ হয় দূরে ঠেলে রেখেছ— দূরে গেলে তখন বোধ হয় কাছে পাবার অভাব অনুভব করবে। এখনো হয় ত সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হই নি— হয় ত কিছু আশীর্ব্বাদী সংগ্রহ করতে পারবে। ইতি ১৮ [?] বৈশাখ ১৩৩৩

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২
২৩ ডিসেম্বর ১৯২৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মডার্‌ন্ রিভিয়ু ও প্রবাসীর মন্তব্যের ভাষায় ও যুক্তিতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম সন্দেহ নেই। নিজের সম্পর্কীয় ব্যাপারে মানুষ ছোটো কথাকেও বড়ো করে তোলে। যে জিনিষ বাইরের সে সব জিনিষকে ভিতরে নেওয়া একেবারেই ভালো নয়। অন্যায় বা ভুল বোঝাবুঝিকে নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করলে সেটাকে বাড়িয়ে এবং ছড়িয়ে ফেলাই হয়— আমি কোনো কথা কইতে চাইনে।

অনেক দিন থেকে তোমাকে স্নেহ করে আসচি। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে তোমারি পীড়া তা নয় আমারো। মাঝে মাঝে তাতে নাড়া লাগ্‌তে পারে, বন্ধন আশা করি ছিড়বে না। কিন্তু বারে বারে অকারণে বা স্বল্প কারণে অদৃষ্টের মার খেয়ে খেয়ে ক্রমে গ্রহনক্ষত্রের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস মনে পাকা হয়ে উঠ্‌চে। বহুদিন থেকেই প্রায় প্রত্যেক বন্ধুসম্বন্ধ আমার ভাগ্যে অকস্মাৎ প্রতিকূল হয়ে উঠেছে। একে সেটা দুঃসহ তার উপরে যদি বল্‌তে হয় যে নিশ্চয়ই আমারই স্বভাবে দোষ আছে তবে তাতে একগুণ দুঃসহতা দুই গুণ হয়ে ওঠে— তাই নক্ষত্রের পরে দোষারোপ করি— তাতে তার উজ্জ্বলতায় কলঙ্ক লাগে না।

এবার প্রবাসে একে ত তোমার চিঠি পাইনি তার পরে তোমার কন্যার জন্মসংবাদ যখন বাইরের লোকের কাছ থেকেই পাওয়া গেল তখন মনে সন্দেহ হতে লাগল আমার গ্রহ বুঝি আবার নড়ে চড়ে উঠেছেন।

হঠাৎ দূরের থেকে ফিরে এসে যখনি এই সমস্ত ব্যক্তিগত পঙ্কিলতার মধ্যে একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত গেড়ে যাই তখনি নিজের খর্ব্বতা নিয়ে দুঃখ বোধ করি। এত বড় পরাভব আর নেই। এ হচ্চে সামান্য ছায়াকে কল্পনায় অপছায়া করে তুলে আন্দোলিত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আত্মঅসম্মান ঘটানো। এই মায়ার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করব। তা করতে গেলে নিজেকে যথাসাধ্য বিবিক্ত রাখা দরকার হবে।

তোমাদের কল্যাণ হোক এই অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করি। ইতি ৮ই পৌষ ১৩৩৩

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০
৩১ ডিসেম্বর ১৯২৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তোমাদের প্রস্তাবটি ভালো। আমার নিজের সম্বন্ধে একটা ভাববার কথা, আমি কি কোনো বিশেষ নামধারী কোনো ধর্ম্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত? কোনো সমাজের সংজ্ঞার সঙ্গে আমার মিল হবে না বলে আশঙ্কা করি। অথচ যদি ব্রাহ্মসমাজের কোনো অনুষ্ঠানে কোনো প্রধান স্থান নিই তাহলে লোকের একটা ভুল ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

তার পরে আর একটা কথা আছে। হঠাৎ য়ুরোপ থেকে এসেই যে সন্দেহঘন বায়ুচক্রের প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েচি তাতে আমার শরীর মন আবার পীড়িত হবার পথে চলেচে। তাই এর থেকে আপনাকে বাঁচাবার অভিপ্রায়ে অজ্ঞাতবাস আশ্রয়ের সংকল্প করচি। মাঘের মাঝামাঝি এ প্রদেশে থাকব কি না সন্দেহ—অন্তত থাকবার ইচ্ছা নেই। অতএব তোমাদের যজ্ঞকার্য্যে সশরীরে আমাকে পাবে না বলেই মনে

হচ্চে। যদি দুগ্রহের নিষ্ঠুর পাশবদ্ধ হয়ে নিতান্ত পড়ে থাকতেই হয় তখন যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। আপাতত তোমাদের ও বিধাতার কাছে ছুটির দরবার রইল। ইতি ১৫ই পৌষ ১৩৩৩

অনুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

৯ জানুয়ারি ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার শরীর মনে আবার সেই আগেকার মত অবসাদ ঘনিয়ে আসচে— কোনো কর্ম্মে নিজেকে প্রয়োগ করতে পারচি নে। বর্লিনের ও বুডাপেস্টের ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি দুশ্চিন্তা ও দুশ্চেষ্টার জালে আবার ধরা দিই তাহলে আমার প্রাণপুরুষ আর আমাকে ক্ষমা করবেন না। বর্লিনের বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার হিস্ আমাকে বলেছিলেন যে, আমার কাছে warning এসেচে— এখনো তাকে উপেক্ষা করবার শক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি বেশিদিন থাকবেনা— এখন থেকে যেন আমি ভিড়ের কাছ থেকে সরে এসে কোণের মধ্যে আশ্রয় নিই। অন্য দুই এক জায়গায় ডাক্তার জোর করে আমার engagements ভেঙে দিয়েছিলেন

তাতে আমার গুরুতর আর্থিক ক্ষতিও হয়েছিল। মনে করে এসেছিলেম এখন থেকে জনতা ছেড়ে বিরলে নিভৃতে বাস করব। প্রথমে আবেদন নিয়ে এসেছিলেন গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। তাঁর পত্নীর স্মৃতিসভায় সাভাপত্য করতে হবে। আমি তাঁকে ডাক্তারের অনুশাসন জানালেম। তিনি বল্লেন, আচ্ছা যদি আপনি সভাসমিতির কাজ একান্তই ত্যাগ করেন তাহলে নিষ্কৃতি দিলুম। কিন্তু যদি আর কোথাও আবির্ভূত হন কেবল আমাকেই বঞ্চিত করেন তাহলে বুঝব আমার প্রতিই আপনি প্রতিকূল। আমার পক্ষে আত্মরক্ষার উপায় হচ্চে নির্ব্বিচারে সকল প্রকার সভাচর্য্যা থেকে দূরে পলায়ন। এই মুক্তির পন্থায় তোমরাও আমার সহায়তা কোরো।

বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে তোমাদের আলোচনা পড়ে দেখলুম। খুসি হলেম। বিশ্বভারতী থেকে খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে বোধ হয় না। তোমাদের শক্তি আছে, শিক্ষা আছে, মণ্ডলী আছে অতএব কৃতকার্য্য হবে সন্দেহ নেই। ইতি

১ জানুয়ারি ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

১৭ মার্চ ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস— ডান হাতের আঙুলে আঘাত লেগে লেখা খুঁড়িয়ে চল্‌চে, আর দাক্ষিণ্যও হারিয়েছে। ঠিক এই সময়েই বসন্ত উৎসবের আহ্বান। কবির কাছে সে আহ্বান সর্ব্বাগ্রগণ্য। একদিকে লিখে লিখে যাচ্চি অন্য দিক থেকে অভিনয়ের পালাও চল্‌চে। দেহে দুঃখ পেলে অনেক সময়ে আমার কলমে রস বেরোয়, খেজুর গাছের দশা আর কি। তোমাদের দাবী পরে শুন্‌ব— আপাতত দক্ষিণ হাওয়ার তাগিদটা মেটাই। দাঁড়ের কাজ আছে চিরদিন— পালের কাজ ক্ষণে ক্ষণে। মনের দুঃখে চুপচাপ ছিলুম— বীণাপাণির শুশ্রূষা স্পর্শ হঠাৎ এসে পৌঁচেছে। আজ তাঁকে ছেড়ে দণ্ডপাণিদেব তলব মান্‌তে পারচি নে। এবার উৎসবে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নি— এখানকার নব শালমঞ্জরীর নিমন্ত্রণমর্ম্মর আপনি যদি কানে গিয়ে পৌঁছয় তো এসো। কিন্তু তোমরা কাজের লোক— হয়তো তোমাদের দরজা বন্ধ। আমাদের উৎসব দোলের পরদিন, শনিবারে— পূর্ণচন্দ্র খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হবেন না। ইতি ৩ চৈত্র ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

২০ মার্চ ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কাল তোমাদের প্রত্যাশা করেছিলুম। একবার অপরাহ্ণে একবার সায়াহ্নে গাড়ি তোমাদের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলুম— ব্যর্থ ফিরে এলো। তোমরা এলে খুসি হতুম সে কথা পূর্ব্বে জানিয়েছি। ভুল বোঝাবুঝির প্রদোষ আলোকে আশা করি কোনো ছায়া হঠাৎ উপচ্ছায়ার আকার ধরেনি। ইতি ৬ চৈত্র ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

১৯ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, অনেকদিন পলাতকা ছিলুম এখন আর ফাঁক নেই, রাস্তাঘাট আঁটবন্ধ। মুলতুবি কাজগুলো গেটে ধর্ণা দিয়ে বসে আছে— তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে হাবড়ার টিকিট কিনতে বেরব, সাধ্য কি তার। অগ্রহায়ণে রাজধানীতে অনেকগুলো বিয়ে আছে যদিচ তার কোনোটাতে আমার কোনো স্বার্থ নেই

তবু সভায় উপস্থিত থাকতেই হবে সেই অবকাশে আমাকে প্রজাপতির পক্ষপুটচ্ছায়া থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারো— সেই সন্ধানে রাস্তা আগ্‌লে বসে থেকো। আপাতত সময় নেই। ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

৩০ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সভাসজ্জার কাজে আমাকে কেন খাটাবার চেষ্টা করো। একবার যদি এই আবর্ত্তে ধরা দিই তবে আমাকে উদ্ধার করবে কে? সম্প্রতি কিছু দিন থেকে দৈবদুর্য্যোগে জনসাধারণের লক্ষ্যগোচর হয়ে পড়েচি, সেই জন্যেই চতুর্দিক থেকে অনুরোধ— নানা আকার আয়তন ধরে আমার উপর এসে পড়চে উল্কাবৃষ্টির মতো। নিভৃতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্যে আজকাল আমার যে কতদূর আকাঙ্ক্ষা তা তোমাদের বয়সে তোমরা বুঝতেই পারবে না। রায়মশায়ের প্রশস্তিবাদ লিখে পাঠিয়েছি। আমার কাছ থেকে আর কিছু প্রত্যাশা কোরোনা।

সুবর্ণরেখাতীরে শাস্তারা ভালো আছে আশা করি।

ভাগীরথীতীর থেকে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ পাঠাই। ইতি
১৩ কার্ত্তিক ১৩৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯ জুলাই ১৯৩৩

কল্যাণীয়েষু

Wilberforce এর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটা মেসেজ তোমার জুলুম অনুসারে রচনা করেচি। সেটা এতক্ষণে তোমার মার্কিন বন্ধু মারফৎ তোমার হস্তগত হয়ে থাকব [থাকবে]। টাইপ করা কপিতে পরিদর্শককৃত একটা প্রমাদ প্রবেশ করেচে সংশোধন করে নিয়ো। এক জায়গায় আছে The evil cause has not died ইত্যাদি—cause টা evil হতেই পারে না কারণ cause টা suppression of slavery। এ স্থলে শুধু "evil" যদি রাখো তাহলে নালিশের কারণ থাকেনা। আমার যথার্থ নালিশ তোমার উপদ্রব নিয়ে। জনসাধারণকে নোটিস দিয়েছি যে বাংলা দেশের ভদ্র প্রথামতো আমার বহু দিন পূর্ব্বে মরা উচিত ছিল কিন্তু মরি নি—সেই পরিতাপ মনে রেখে এখন থেকে মৃতবৎ ব্যবহার করব— চিঠির জবাব দেব না, সভাপতি হব না, বইয়ের foreword লিখব না, মেসেজ পাঠাব না— কলমটাকে ডাইভোর্স করে দেব। কিন্তু তুমি কেন আমার এই জীবন্মৃত্যুব্রত ভাঙবার জন্যে উঠে পড়ে

লেগেচ তার একটা কৈফিয়ৎ দেবে। যদি তোমার ব্যবহার সংশোধন না করো তা হলে অকৃত্রিম মৃত্যু ছাড়া আমার আর গতি থাকবে না। তাতে ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে তোমাকে আর আমার হবে আত্মহত্যার পাতক। সাবধান করে দিলুম। ইতি ৩ শ্রাবণ ১৩৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

এইমাত্র চোখে পড়ল "cause" শব্দটা কেটে তার জায়গায় evil বসানো হয়েছে— অতএব প্রথম নালিশটা প্রত্যাহার করচি— দ্বিতীয় নালিশটা রুজু রইল।

৩০

২৬ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুব খুসি হয়েছি। শেষ সপ্তকের কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। সাধারণ পাঠকেরা নতুন কবিতা পেলেই তাকে কোনো পুরাতন শ্রেণীভুক্ত করে তবে সেটাকে ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ তাদের জাত-মানা মন—জাতের পরিচয় যে ছিঁড়েছে এমন কবিতাকে তার আত্মগত পরিচয়ে অভ্যর্থনা করে নিতে তারা অসম্মত। ছেলেবেলা থেকেই আমার মন জাত-খোওয়ানো—

তার প্রকাশ সুরু হতেই বাধা পেয়ে পেয়ে তবে আতিথ্য লাভ করেছে। মনে আছে ক্ষণিকা যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন পাঠকরা ভেবেই পায় নি একে কী ভাবে নেবে— একে কোন্ কোঠায় বসাবে, একে বাঁধানো হুঁকো দেবে কিনা ঠাওরাতে না পেরে চুপ করে বসে ছিল— নিমন্ত্রণও করে নি, তাড়া করেও যায় নি, বিনা আহ্বানে ও চৌকি জুড়ে জায়গা করে নিলে। খেয়া এক দিন এলো মুদ্রাযন্ত্রের "গারাজ্" থেকে রথে চড়ে। দরজা খোলেই না— বহু বৎসর ধরে প্রথম সংস্করণের রথের পরেই সে অচল হয়ে বসে রইল। শেষ সপ্তকের কী গতি হবে জানিনে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন খ্যাতি বিস্তারের প্রতি লোভ ছিল বিস্তর। ঐ রিপুটা একেবারে তিরোহিত হয়েছে বল্‌লে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু বুঝতে পারচি ওটা যাই যাই করচে— আশা হচ্চে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ওর সহমরণ হবে না। সাহিত্যের হাটে দরদস্তুর নিয়ে বকাবকির দিকে আমার কান এখন এগিয়ে যায় না— তবু তোমাদের মুখ থেকে যখন অভিনন্দন পাই তখন বুঝি আমার কলমের গাছে ফল ধরেচে।

বাংলার নদীমাতৃক আতিথ্য থেকে অনেকদিন দূরে ছিলুম। এবারে তাপিত দেহ নিয়ে এসেছি সুজলা বাংলার শুশ্রূষালয়ে। প্রায় মাসখানেক কাটল। ইতিমধ্যে বর্ষা পূর্ব্বদিগন্তে তাঁবু গেড়ে বসেছে। এখন মনটা শান্তিনিকেতনের দিকে উৎসুক— বর্ষার এমন বিরাট আত্মদান যজ্ঞ আর কোথাও দেখিনি।—

তোমাদের ঘাটশিলার পরিচয় আমার অজ্ঞাত নয়। সুবর্ণরেখার উপলবন্ধুর চরের উপর প্রথম সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ বকের দলের মৌন সভা দেখেছিলুম, আজও মনে আছে। এক সময়ে সেখানে বাসা বাঁধবার কথা মনে এসেছিল, ঘটে উঠল না। একবার শান্তিনিকেতনে এসে আমার মাটির ঘরটা দেখে যেয়ো— ওর শিল্পকলা দেখে নিশ্চয় খুসি হবে। ইতি ২৬ জুন ১৯৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

[১৯৩৫]

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

কোথাও নড়িনি, নড়বার শক্তিও নেই দেহে। তাই বলে মনে কোরোনা তোমাদের যৌবনের সচলতাকে আমি ঈর্ষা করি। কালিদাসের যক্ষ ছিল রামগিরি আশ্রমে আবদ্ধ, পাঠিয়েছিল মেঘদূতকে নদীগিরিপারে বার্ত্তা বহন করে। আমি আছি শান্তিনিকেতন আশ্রমে—আমার দূত মনোদূত, তাকে যেখানে ঘোরাই সে ভূগোলের রাজ্য নয়—সে বার্ত্তা বহন করে নিয়ে আসে আমারই কাছে—আনন্দে আছি। কেবল ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মের দায় এখনো স্কন্ধে চেপে আছে, সেটাকে নামাতে পারলে আর কোনো নালিশ থাকে না। "লেখা তো লিখেছি ঢের" লেখনী এখন সিভিল ডিস্‌ওবীডিয়েন্সের

রাস্তায় দাঁড়িয়েছে; আমিও তাকে হোয়াইট পেপরের অধিকার দেব-বলে মন স্থির করেছি। ভিড়ের লোকের মন পাবার জন্যে খ্যাতির হাটে আনাগোনা করতে আর উৎসাহ নেই। তোমরা এই শুভকামনা করো সম্পূর্ণ ভারবিহীন হোক আমার বিদায়কালের যাত্রা। যে উদার আলস্য কবিদের মূলধন আমি তাই নিয়েই জন্মেছিলুম—আমার যানবাহনটা ছিল দায়বিহীন বাণী বহন করবার জন্যে, তাতে ফাঁক ছিল ঢের,—কপালের দোষে যাত্রা আরম্ভের মুখেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গুরুভার কর্ত্তব্যের দল বিশ্বহিতের দোহাই দিয়ে, ফাঁক গেছে ভরে, ঠেসাঠেসিতে বাণী পড়েছেন সঙ্কুচিত হয়ে। অনেকদিন এমনি বোঝা টেনে কাটল এখন আর নয়—পুরোনো কলমটাকেও জেটিসন্ করবার ইচ্ছে।

ঘাটশিলায় গিয়ে রামানন্দবাবুর শরীর আশা করি সুস্থ হয়েছে। অনেকদিন পূর্ব্বে ও অঞ্চলে গিয়েছিলুম—একটি ছবি মনে আছে, ছোটো বড়ো নানা উপলে বিভক্ত সুবর্ণরেখা নদী বয়ে চলেছে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান ধূসর আলোয় একদল বক স্তব্ধ বসে আছে নদীবক্ষের মধ্যে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপরে—প্রাণবান করেছে তারা সন্ধ্যার শান্তিকে। সেই ধ্যানী বকের দল এখনো আছে, না সর্ব্বজীবশত্রু মানুষের সমাগমে পালিয়ে গেছে জানিনে—যদি গিয়ে থাকে তাহলে ক্ষতি হয়েছে।

তোমরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো আর

রামানন্দবাবুকে আমার প্রীতিঅভিবাদন জানিয়ো।
ইতি বিজয়া দশমী ১৩৪২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮
৮ মে ১৯৩৬

কবিসম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে
পি-ই-এন সমিতির সম্পাদকের প্রতি
দায়ভারগ্রস্তা বরাহনাগরিকার
প্রশস্তিবাদ

মৎস্যের তৈলেই মৎস্যের ভর্জ্জন,
সংক্ষেপে শস্তায় দায়ভার বর্জ্জন,
গ্রামোফোনে তুলে নিয়ে সিংহের গর্জ্জন
সিংহেরই কানে ফুঁকে গৌরব অর্জ্জন।
শুধু সাড়া দেয় তব নাসিকার তর্জ্জন,
শুধু চিঠি সই করে লজ্জা বিসর্জ্জন।

খেটে মরে ভেবে মরে আর যত সজ্জন,
নিষ্ক্রিয় মহিমায় তোমায় নিমজ্জন ॥

অনুষ্ঠাতার গুণমুগ্ধা
শ্রীরাণী মহলানবিশ
বকলম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ বৈশাখ ১৩৪৩ বরনগর

১৩
২৫ জুলাই ১৯২৬

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

কালিদাস, কোথাও নড়ি নি, নড়বার শক্তিও নেই দেহে। আমার ছুটি এখানকার সকলের ছুটির মধ্যে। লোকে যায় বায়ু পরিবর্তনের সঙ্কল্প নিয়ে—তার আয়োজন বিস্তর; ব্যয়ও কম নয়। অথচ প্রকৃতি নিজের হাতেই বায়ু পরিবর্তন করে দেন—সন্ধ্যার আকাশে তুলির পোঁচ লাগে নতুন রঙের—প্রাঙ্গণে এতদিন ছিল জুঁই বেল, তারা বিদায় নিল, এল শিউলি, কিছু কিছু মালতীও রয়ে গেল উপরি সময়ের ফরমাসে—ওদিকে মাঠে বাটে কাশবনে শুভ্রতার স্তব্ধ ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত, শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না, চাঁদের বর্ষাজলে ধোপ দেওয়া নূতন উত্তরী, বাতাসে ব্যাপ্ত হয়েছে শিশিরের স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। এই

পরিবর্ত্তন যদি নিজের খরচে করতে হ'ত তাহলে বুঝতে পারতুম এর মর্যাদা। বিনামূল্যের প্রশ্রয়ের আড়ালে বিধাতা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠদানগুলিকে আড়াল করে দিয়েছেন, সুলভ বলেই তারা হয়েচে দুর্লভ। ভালোই হয়েচে—কন্‌সেশনের টিকিট কিনে গাড়িতে ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে পিণ্ডীকৃত হয়ে ঠাঁই বদলের দূরাকাঙ্ক্ষায় ছুটোছুটি করতে হয় না। এই নি-কড়িয়া চেঞ্জের জলস্থল আকাশব্যাপী ঐশ্বর্য্য আমার মতো কয়েকটা বাদসাহি কুঁড়ের জন্যে ভিড়ের লোকের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে তাদেরি উদাসীন দৃষ্টির পর্দ্দার ওপারে। এমনি করেই বিধাতা তাঁর আমদরবারের মাঝখানেই খাস দরবারের আসর পাতেন। যারা সমজদার তারা নিমন্ত্রণ -পত্র আকাশ থেকে কুড়িয়ে পায় আর কেউ খবরই জানে না। এটা বোঝা যায় যারা অধিকারী তাদের সংখ্যা খুবই কম—সেই সামান্য ক'জনের জন্যে রাজাধিরাজের উৎসব সভায় এত ধুমধাম কেন তাই ভাবি। যুগ যুগ ধরে তাঁর বীণকারকে বায়না দিয়ে রেখেছেন কেবল এদের মন ভোলাতে। বাঁশি আজ বাজল, আমার দুই চক্ষু যোগ দিয়েছে ঐ কয়েক টুকরো সাদা মেঘের দলে, আমার মন বেরিয়েছে অভিসারে, একলা বসে শিশির-ভেজা মাঠের ধারে, নির্ম্মল নীলাকাশের নিচে; এই অভিসারের পথ ই, আই, আরের রেলপথ নয়। অতএব চুপচাপ নিস্তব্ধ ছুটির ভ্রমণ সেরে নিচ্চি—এরপর বায়ু পরিবর্ত্তনের দল যখন জমবে ভিড় করে, মুলতবি কাজের অনুশোচনা ঠেলা দেবে মনকে তখন আমারো রিটার্ণ টিকিটের

মেয়াদ ফুরোবে, সুবিধা এই, তখন এইখান থেকে এইখানেই ফিরব—সেই দুটি এইখানের মাঝে আছে অদৃশ্য সমুদ্র।

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে যে চিঠিখানি লিখতে লিখতে সেটাকে গদ্য-কাব্যের বান ডেকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেখি সেটা দেরাজের মধ্যে পড়ে আছে। তোমার জিনিষ তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া গেল। চিঠিখানার সেদিনকার তারিখে এসে ইতিপ্রাপ্তি হয়নি, অতএব ওটা কালাতীত হয়ে রইল। ইতি ১১ জুলাই ১৯৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ ক

[৪ মে ১৯২২]

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। রমাঁ রলাঁর সঙ্গে তোমার ভাল রকম পরিচয় হয়ে গেছে এটা বড় আনন্দের কথা। য়ুরোপে যত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েচে সকলের চেয়ে এঁকেই আমার কাছের বলে মনে হয়েছিল। এঁরি সঙ্গে আলাপ করবার সময় আমার ফরাসী ভাষায় অনভিজ্ঞতা আমাকে সকলের চেয়ে কষ্ট দিয়েছিল। আমি যখন ভারতবর্ষের দিকে ফিরছিলুম তখন আমার মনে ছিল যে, রমাঁ রলাঁর মত লোক যে-ভাবের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আছেন মহাত্মাজি এই ভাবটাকেই আমাদের জনসাধারণের মনে গভীর ও ব্যাপকরূপে উদ্বোধিত করে তুলচেন। আমি তাই ঠিক করেছিলুম আমার তরফ থেকে আমার কাজে ও রচনায় আমি এঁর সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু ফিরে এসে দেখি এখানে এমন একটা হাওয়া বইচে যাতে আমার প্রাণমন পীড়িত হয়ে উঠ্‌ল। প্রথম পীড়া হচ্চে মানসিক অত্যাচার। একে ত আমাদের অলস মন স্বভাবতই গতানুগতিক, তারপরে প্রকাণ্ড একটা moral জবরদস্তিতে প্রচলিত মতের লেশমাত্র বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করবার সাহস কারোর ছিল না। অর্থাৎ দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার উজান

হাওয়া খুব প্রবল বেগে বইছিল। সেইজন্যেই এমন মূঢ়ের মত কথা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল যে, অন্য সব কিছু চিন্তা চেষ্টা আলোচনা পরিত্যাগ করে' কেবলমাত্র চরকা কেটে ও খদ[দ]র পরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশ স্বরাজ লাভ করবে। সে স্বরাজটা যে কি তা স্পষ্ট করে প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করবার ভরসা বা ইচ্ছামাত্রও কারো ছিল না। দেশের শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান লোকেরাও বল্‌ত, এটাই আমাদের creed, আমাদের ধর্ম্মমত, অতএব এর সম্বন্ধে তর্ক চল্‌বে না। দেশের অধিকাংশ লোকই বিনা বিচারে এমন অদ্ভুত কথা বেদবাক্যের মত মেনে নিতে পারলে এর চেয়ে স্বরাজ সিদ্ধির বিরুদ্ধ প্রমাণ আর কি হতে পারে। তারপরে সমস্ত দেশ জুড়ে একটা চোখরাঙানী, একটা মুখ-চেপে-ধরার ভঙ্গী। এই মানসিক অত্যাচারের চোরাবালির উপরে একরাত্রে এরা স্বরাজের অভ্রভেদী দুর্গ গড়ে তুল্‌তে চেয়েছিল। বাংলাদেশে সবাই যে বিশ্বাস করেছিল যে, কোনো বিশেষ উপায়ে ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত বন্ধনমুক্ত হবে তা নয়—কিন্তু অনেকেই মনে করেছিল সাধারণকে ভোলাবার এ একটা ফন্দী—এমনকি মহাত্মাজিও সেইরকম বেণের মত হিসাব করে এইরকম চাল চাল্‌ছিলেন তা বিশ্বাস করবার মত প্রমাণ আছে। তিনি এণ্ড্রুজকে পত্রে লিখেছিলেন, সাধারণ লোককে এমনি সুনির্দ্দিষ্ট আশ্বাসবাক্য না দিলে তাদের

উৎসাহ হয় না। তুমি জান, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে বহু শতাব্দী ধরে কনিষ্ঠ অধিকারী বলে গণ্য, এইজন্য শ্রেষ্ঠ অধিকারীরা মন ভুলিয়ে তাদের সদগতিসাধন করা কর্ত্তব্য বলে মনে করে এসেচে। তাতে তাদের মন ত গেছে মারা, তারপরে তাদের সদগতিও ঘটল না। বর্ত্তমান যুগের জননায়ক এসেও তাদের সেই মন ভোলাবার উদ্যো[গে] প্রবৃত্ত হলেন। এটা হ'ল কিরকম? না, যে পাখীর পা আছে শিকল দিয়ে দাঁড়ে বাঁধা, তার ডানায় শিকল বেঁধে তাকে টান মেরে মুক্তি দেবার চেষ্টা—তার ফল হচ্চে এই, পাও যায় ভেঙে, ডানাও যায় ছিঁড়ে। যারা অন্তরে অন্তরে শিকলদেবতার উপাসক, তারাই নূতন শিকলের সহায়তায় পুরাতন শিকলকে ভাঙ্‌তে চেষ্টা করে। তুমি ত জানই এ আমি কিছুতেই সইতে পারি নে। আমি বল্‌তে চেষ্টা করলুম, আমি সত্যকে মানতে রাজি আছি কিন্তু মহাত্মাজিকে না। তাতে লোকে খুসি হল না।—এই ত গেল পয়লা নম্বর। তার পরে দেখলুম সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে ঘোরতর একটা পাশ্চাত্য বিদ্বেষ। সাধারণ পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে এইরকম উগ্র রাগদ্বেষের স্থান আছে—সর্ব্বত্রই এই রকম রিপুর স্টীমেই স্বাদেশিকতা জগন্নাথের রথযাত্রা ঘট্‌চে—অতএব যদি শাক্ত পোলিটিশনের দল খড়গ খর্পর নিয়ে পোলিটিকাল কালিঘাটে পশ্চিম যমদেবতার বাহন মহিষটাকে বলি দেবার সঙ্কল্পে ঢাক ঢোল বাজাত আমি তাতে যোগ দিতুম না বটে;

কিন্তু আশাভঙ্গের দুঃখ পেতুম না। কিন্তু আমার মনে এবার এই একটা আনন্দ গর্ব্ব জেগেছিল যে আমাদের দেশের পলিটিক্স্ দ্বেষহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এইটেই আমরা পৃথিবীকে দেখাতে পারব। কিন্তু দ্বেষহিংসাকে শরীরের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে মনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলে তাতে যে কম অকল্যাণ ঘটে তা বল্‌তে পারি নে। এই কয় বৎসর ভারতবর্ষের এক সভাতল থেকে আর এক সভাতলে কেবলি জালিয়ানবাগের অত্যাচার ও খিলাফতের অন্যায় ঘোষণা করে' সেই অভিযোগের দ্বারাই নন্-কোঅপরেশন নীতিকে প্রবল করার চেষ্টা করা হয়েচে। ভারতের স্বাতন্ত্র্য যে ভারতবাসীর মনুষ্যত্বের গৌরবসাধনের জন্যেই এ কথার উপর বিশেষ জোর দেখা গেল না—কেবল লোকের মনে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা পরকৃত বিশেষ অন্যায়ের স্মৃতি গভীর করে দেগে দেগে দেওয়া হতে লাগ্‌ল। অথচ সেই সঙ্গে মুখে বলা হতে লাগ্‌ল যে, খবরদার মনে যেন হিংস্রতা না আসে— নাকের মধ্যে ঠেসে ঠেসে নস্যি গুঁজে দিয়ে বলা হতে লাগ্‌ল, খবরদার, হাঁচি যেন কোন মতেই না আসে। দুটো চারটে বড় বড় হাঁচি যখন সশব্দে বেরিয়ে পড়ল তখন উপদেশকেরা আশ্চর্য্য হয়ে হাত উল্‌টে বল্‌লেন, "না, এদের দ্বারা নন্-কো-অপরেশনের উচ্চ নীতি কিছুতেই পালিত হতে পারে না— কেননা, এদের প্রচণ্ড হাঁচির রোগ আছে।" যাদের নস্য দেওয়া রোগ আছে, নাসিকার সংযমশীলতার সম্বন্ধে তাদের

হঠাৎ সন্দেহ ঘটল। ওদিকে যতক্ষণ সভায় সভায় অহিংস্রতার মন্ত্র মুখে আউড়িয়ে পদে পদে তীব্র বিদ্বেষের চর্চ্চা চল্‌ছিল তখন দেশের অধিকাংশ লোক—যাদের মনের মধ্যে হিংসা আছে ও হিংস্রতার উপর ষোল আনা শ্রদ্ধা আছে—তারা ভাবছিল "এ বেশ হচ্চে। দেশকে মদ খাওয়ানো দরকার—কিন্তু যে মহাত্মাজি সেটাকে গঙ্গাজল বলে খাওয়াচ্চেন, তিনি আমাদের সকলের চেয়ে চতুর। শুঁড়ির দোকানকে পুণ্যতীর্থ করে তোলাই আমাদের দেশে মাৎলামিকে পাকা করে তোলবার উপায়।" ইংরেজ গবর্মেণ্ট যে সয়তানী এই মন্ত্রটাকে নিশিদিন জপ করানো যেতে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিজি বারবার সকলকে ডেকে বলতে লাগ্‌লেন-"সয়তানীকে ঘৃণা কর কিন্তু সয়তানের প্রতি প্রেম যেন অক্ষুণ্ণ ও প্রবল থাকে।" কিন্তু যারা সরলবুদ্ধির লোক তারা এত অসীম সূক্ষ্মতা ধারণা করতেই পারে না। তাদের সহজেই মনে হয় যে, মার জিনিষটা abstract, একটা গড়িয়ে আসা পাথরও মারে, লাফিয়ে ওঠা ঢেউও মারে, আবার মেছোবাজারের গুণ্ডাও মারে—মারের উপর রাগ করার কোনো মানেই নেই—যে ব্যক্তি মারে রাগটা একমাত্র তারি পাওনা, অতএব সয়তান-বর্জ্জিত সয়তানীর উপর কোন নালিশই থাকতে পারে না—সয়তানটার উপরেই রাগ করতে হবে। যাই হোক্‌ নন্‌-কোঅপরেশন উদ্যোগের দুটো বড় জিনিষ টিকল না, একটা হচ্চে ৩১ ডিসেম্বর—সেটা টিঁকল না তার কারণ, সাধনার

অনুপাতেই সিদ্ধি এইটেই হচ্চে সত্য—সাধনাকে চরখায় চড়িয়ে সংক্ষিপ্ত করে সিদ্ধি হতে পারে না—সাধনা ছেলেখেলা নয়, জনসাধারণকে ফাঁকা কথায় ভোলান নয়। দ্বিতীয় যেটা টিঁকল না সে হচ্চে অহিংসা—তারও প্রধান কারণ, ক্ষমার পথেই অহিংসার সাধন এইটেই হচ্চে সত্য, অক্ষমার চর্চ্চা করে,' পদে পদে বিদ্বেষবুদ্ধিকে উত্তেজিত করে' অহিংস্রতায় উত্তীর্ণ হওয়া এ কেবল মহাত্মাজির উপদেশবাক্যের দ্বারা হতেই পারে না। শুধু কেবল ইংরেজ গবর্মেণ্টের প্রতি ও ইংরেজ-জাতির প্রতিই যে বিদ্বেষ জেগেচে তা নয়, সমস্ত পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি—বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি। বিদ্যার যেন পূর্ব্ব পশ্চিম দিগ্‌ভেদ আছে। যেমন করে বিলাতি কাপড় পোড়ানো চল্‌তে লাগ্‌ল তেমনি করেই বিদেশী culture সম্বন্ধে লঙ্কাকাণ্ড সুরু হল। তাই আমাকে আমাদের "দেশাত্মবোধের" পাণ্ডারা বল্লে আমি পশ্চিমের মোহে মুগ্ধ—সেখানকার সাকীদের হাত থেকে প্রশংসার মদ খেয়ে সেইখানকার মাটিতেই আমার মন লুটোপুটি খাচ্চে। আমার যজ্ঞক্ষেত্রে আমি পশ্চিমের অতিথিদের আমন্ত্রণ করেচি এতেই আমার বুদ্ধিবিকার প্রকাশ পাচ্চে। আমি পশ্চিমে রমা রলা প্রভৃতি যে সমস্ত মনস্বীদের দেখে এসেচি সমস্ত মানব সংসারের তপস্যাকেই তাঁরা গ্রহণ করেচেন, তাঁদের কাছে দেশবিদেশের একান্ত ভেদ ঘুচে গেছে—এইজন্যে তাঁদের দেশের দেশাত্মবোধিদের কাছ থেকে তাঁরা দুঃখ পাচ্চেন,—

ভারতবর্ষে এসে আমি মহাত্মাজিকে দেখলুম তিনি তাঁর আইডিয়ালকে ভারতপলিটিক্সের বেষ্টনীর মধ্যে বেড়ার মধ্যেকার ধেনুর মত পূরে রেখেচেন। আমি বরাবর এই কথাই জানি যে, যে-আইডিয়াল দেশের চেয়ে বড় সেই আইডিয়ালেই দেশ বড় হয়। এঁরা সকলেই বলেন, আগে দেশের আইডিয়ালকে মানি তার পরে সর্ব্বজনীন আইডিয়ালকে মানা সম্ভব হবে। এঁরা ভুলে যান ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ রোগ যে আরোগ্যতত্ত্বের সাহায্যে সারে সেই আরোগ্যতত্ত্ব সকল ব্যক্তিরই। দেহের আকৃতি (physiognomy) প্রত্যেক দেহের পক্ষে স্বতন্ত্র, কিন্তু দেহের মূল প্রকৃতি সাধারণ দেহতত্ত্বের (physiology) অন্তর্গত। যে পরিমাণে মনুষ্যত্বকে লাভ করব সেই পরিমাণেই দেশকে লাভ করব। পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে বর্জন করাই যাঁদের মতে প্রাচ্যের মনুষ্যত্বের সাধনা তাঁরা হয়ত কোন্‌দিন এমন কথা বল্‌বেন, পশ্চিমের হতভাগ্য লোকদের পক্ষে পৃথিবী নিরবলম্বভাবে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে মরচে, কিন্তু ভারতবর্ষের দেবানুগৃহীত মানুষদের পক্ষে পৃথিবী বাসুকির ফণার উপর স্থির হয়ে নিদ্রা দিচ্চেন। যাই হোক দেশের লোকের মন সম্প্রতি 'গুরু'-ভারপীড়িত। চরখা ও খদ[দ]রের ধ্যানে নিমগ্ন। এবং এমন একটি আকাশকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করচে যার কেবলমাত্র পূর্ব্বদিকই আছে পশ্চিমদিকের লেশমাত্রও নেই।

আমি "মুক্তধারা" বলে একটি ছোট নাটক লিখেচি

এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তার ইংরেজি অনুবাদ Modern Review-তে বেরিয়েচে। তোমার চিঠিতে তুমি 'machine' সম্বন্ধে যে আলোচনার [কথা] লিখেচ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করচে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেচে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারচে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্চে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েচে। আর ধনঞ্জয় হচ্চে যারা যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলচে, "আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিৎব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্চে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করচে আত্মার ট্রাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলচে, "মার লাগিয়ে জয়ী হব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বলচে, "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে ওঠ জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজে

বন্দী মানুষটি বল্‌চে, "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্চে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্চে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্চে অভিজিৎ।

অনেক বক্‌লুম, এখন থামি। আজ ২১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার, আগামী সোমবার ২৫শে বৈশাখে আমার জন্মদিন। তোমরা দূর থেকে সেইদিনের কথা স্মরণ করে' আমাকে চিন্তা করেচ, আমিও সেইদিনে তোমার কথা স্মরণ করব। এবার বৃষ্টিহীন খরতর রৌদ্রের মধ্যে নববর্ষ দেখা দিয়েচে—আমার সেই বলাকার নববর্ষই মনে পড়চে। আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সেই নববর্ষই এসেচে—রুদ্রই বুঝি পথ দেখাবেন। আমার দেশ আমাকে ত্যাগ করেচে, অতএব সকল দেশের উপরেই আমার অধিকার বুঝি পাকা হল। অভিজিৎ উত্তরকূটের সিংহাসন ত্যাগ করেছিল তার চেয়ে বড় রাজ্যের মধ্যে মুক্ত হবার জন্যে,—তেমনি দেশে আমার যে সম্মানের বন্ধন ছিল সে আমাকে মাতৃগর্ভের নাড়ির মতই ত্যাগ করচে মুক্ত ধরণীকে লাভ করব বলেই। রাণাকে ও তাঁর স্ত্রীকে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ো। ইতি

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সীতা দেবীকে লিখিত পত্র : ১-৫

১০ জুন ১৯১৭

The Yews

দার্জ্জিলিং

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার "নিরেট গুরু" বইখানি পেয়ে আমি দুঃখ পাব কি সুখ পাব এখনো ঠিক করতে পারচিনে। কারণ আমিও নেহাৎ কম নই আমার দুশোটি ছাত্র—তাদের গোনবার সময়ে আমার ঠিকে ভুল হয় কিনা এ পর্য্যন্ত তার আলোচনা হয়নি। কিন্তু এটা দেখা গেচে ছাত্র গোনবার বেলায় আমার হিসাবে একজন কম পড়ে না বরং একজন বেড়ে যায়—আমি নিরেট গুরুর মত বোকামি করে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে বাদ দিই নে। যখন আমার সন্দেহ হল তোমার নিরেট গুরু বইটি আমাকে পাঠানোর মধ্যে কোনো একটি শ্লেষ আছে তখন অত্যন্ত রাগ করে ঠিক করলুম আমি ঠিক ওর একটি উল্টো উপাধি গ্রহণ করব। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলুম "ফাঁপা গুরু" নামটার মধ্যে বিশেষ গৌরব নেই—বড়ই হাল্কা। অতএব ঐ লাইনে উপাধি নেওয়া আমার চল্‌বে না। তোমার বইয়ে গুরুগিরির যে শোচনীয় পরিণাম দেখিয়েচ সেটাতেও আমার অনেক উপকার হয়েচে—আর কিছু না হোক আমি খুব মোটা পশমের মোজা পরচি তাতে হঠাৎ পা ঠাণ্ডা হবার আশঙ্কা আপাতত নেই। একটা কথা স্বীকার করতেই

হবে যে, সংসারে নিরেট গুরু বিস্তর আছে—তার বিনামূল্যে যে ঘোড়াটা পায় তার কান কেটে দেয় অথচ ঘোড়ার ছায়ার মূল্য দিয়ে ফতুর হতে থাকে। আমি চেষ্টা করব যাতে ঘোড়ার ছায়ার চেয়ে ঘোড়াটাকে মূল্যবান বলে জানতে পারি এবং পা ঠাণ্ডা হবা মাত্র তখনি নাড়া ছেড়ে না যায়। মুস্কিল হচ্চে তোমার নিরেট গুরুর শিক্ষাটা আমি যত সহজে ও নম্রভাবে গ্রহণ করচি অধিকাংশ গুরুমশায়ই তা করবে না—তারা মনে করবে এটা একটা বানানো গল্প! ইতি

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২৮ অক্টোবর ১৯১৮

৩

কল্যাণীয়াসু,

তোমার তর্জ্জমা পেয়েছি—সেটা দেখাও শেষ করেচি। তোমার লেখা বেশি কাটতে হয় না বলে আরাম পাই, নইলে অতবড় লেখা আর কারো হলে হাত দিতে ভয় হত। আপাতত আর তর্জ্জমা না হলেও চলবে—এখানে এখনও আমার সমস্ত ছুপুরবেলা তর্জ্জমা সংশোধন করতেই কেটে যায়,

হয়রান হয়ে পড়েছি। এই কিস্তিটা শেষ হলেই বাস্, আর নয়। ইংলণ্ডে যাওয়ার কিছুই ঠিক নেই। যাবার ইচ্ছা আদবেই নেই। যদি আমার বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহলে যেমন করে হোক্ আমাকে টেনে নিয়ে যাবেন। আপাতত সেই কোণটাতে এসে বসেছি—চিঠির পর চিঠি লিখচি—তর্জ্জমার পর তর্জ্জমা দেখচি। শনি, মঙ্গল, রাহু বা কেতু, কোন্ গ্রহ যে তর্জ্জমার অধিপতি তা ঠিক জানিনে— সেই গ্রহ আমার কোষ্ঠীতে সম্প্রতি খুব উচ্চ স্থানেই আছে— সেই গ্রহ শান্তি হলেই আমিও শান্তি পাব। কিন্তু এ কথাও সকৃতজ্ঞভাবে আমার মনে রাখা উচিত যে সেই তর্জ্জমার গ্রহই আমাকে নোবেল প্রাইজ পাইয়েছিল। বিদ্যালয় না খুল্‌লে তোমরা বোধহয় এখানে আসবে না। ইতি ১১ই কার্ত্তিক ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৯

কল্যাণীয়াসু

মুলুর অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হয়েচি। ওকে আমি মনে বিশেষ স্নেহ করতুম। তোমাদের, বিশেষত তোমার মায়ের শোক অন্তরের সঙ্গে অনুভব করচি। কিছু পরিমাণে বেদনার ক্ষমতাই আমাদের আছে কিন্তু সান্ত্বনার ক্ষমতা ত নেই। ঈশ্বর তোমাদের শান্তি দিন এই প্রার্থনা করি। ইতি ২১ ভাদ্র ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

শ্রীমতী সীতা দেবীর প্রতি

রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ

অন্তরে মিলন-পুষ্প
সৌন্দর্য্যে ফুটুক,
সংসারে কল্যাণ ফলে
ফলিয়া উঠুক ॥

১১ আশ্বিন
১৩৩০

৫
২৬ ডিসেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম, এখনো সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইনি। ধাঁ করে যে কয়টা নাম মাথায় এল লিখে দিই অমেয়া (অমিয়া নয়), আনতি, সুমনা (ফুল) স্বরেণু।

এইটুকু মাত্র লিখেচি হেনকালে আলিগড়ের সন্নিহিত কোন্ এক জায়গা থেকে পাঁচজন ব্যক্তি আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। আমার সময় হনন করতে। তারপরে এলেন দুজন ওলন্দাজ। তাঁরা এইমাত্র চলে গেলেন, কার্ড পাঠিয়েচেন দুজন পার্সি— এখনি আসবেন। তারপরেই চায়ের সময় আসবেন এক জন ইংরেজ। সন্ধের সময় আর কে আস্‌বেন জানা নেই। ইতি ১০ই পৌষ, ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

ক

শ্রীমান প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ছাত্র মুলু

শ্রীমান প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আশ্রমের ভূতপূর্ব ছাত্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ বাসরে আচার্য রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা—

৪ঠা আশ্বিন ১৩২৬

এখানে যারা একসঙ্গে এসে মিলেচি, তাদের অনেকেই একদিন পরস্পরের পরিচিত ছিলুম না; কোন্ গৃহ থেকে কে এসেচি, তার ঠিক নেই। যে দিন কেউ এসে পৌঁছল, তার আগের দিনেও তার সঙ্গে অসীম অপরিচয়। তারপরে একেবারে সেই না-জানার সমুদ্র থেকে জানা শোনার তটে মিলন হল। তারপরে এই মিলনের সম্বন্ধ কতদিনের কত না-দেখাশুনোর মধ্যে দিয়েও টিঁকে থাক্‌বে। এই জানাটুকু কতই সঙ্কীর্ণ, অথচ তার পূর্ব্বদিনের না-জানা কত বৃহৎ।

মায়ের কোলে যেমনি ছেলেটি এল, অম্‌নি মনে হল এদের পরিচয়ের সীমা নেই; যেন তার সঙ্গে অনাদিকালের সম্বন্ধ, অনন্তকাল যেন সেই সম্বন্ধ থাক্‌বে। কেন এমন মনে হয়? কেননা, সত্যের ত সীমা দেখা যায় না। সমস্ত "না" বিলুপ্ত করেই সত্য দেখা দেয়। সম্বন্ধ যেখানেই সত্য সেখানে ছোট হয় বড়, মুহূর্ত্ত হয় অনন্ত; সেখানে একটি শিশু আপন পরমমূল্যে সমস্ত সৌরজগতের সমান হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে কেবল জন্ম এবং মৃত্যুর সীমার মধ্যে তার জীবনের সীমা দেখা যায় না, মনের মধ্যে আকাশের ধ্রুবতারাটির মত সে দেখা দেয়। যার সঙ্গে সম্বন্ধ গভীর হয়নি, তা'কে মৃত্যুর

মধ্যে কল্পনা করতে মন বাধা পায় না, কিন্তু পিতামাতাকে, ভাইকে, বন্ধুকে যে জানি, সেই জানার মধ্যে সত্যের ধর্ম্ম আছে—সেই সত্যের ধর্ম্মই নিত্যতাকে দেখিয়ে দেয়। অন্ধকারে আমরা হাতের কাছের একটুখানি জিনিষকে একটুখানি জায়গার মধ্যে দেখতে পাই। একটু আলো পড়বামাত্র জানতে পারি যে, দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যা-কিছু ভয়ভাবনা, সে কেবল অন্ধকাব থেকেই হয়েচে। সত্য সম্বন্ধ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই আলো ফেলে এবং এই আলোতে আমরা নিত্যকে দেখি।

হৃদয়ের আলো হচ্চে প্রীতির আলো, অপ্রীতি হচ্চে অন্ধকার। অতএব এই প্রীতির আলোতে আমরা যে সত্যকে দেখতে পাই, সেইটিকে শ্রদ্ধা করতে হবে; বাহিরের অন্ধকার তাকে যতই প্রতিবাদ করুক, এই শ্রদ্ধাকে যেন বিচলিত না করে। সত্যপ্রীতির কাছে অল্প বলে কিছু নেই, সত্যপ্রীতি ভূমাকেই জানে। সংসার সেই ভূমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যু সেই ভূমাব বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে থাকে, কিন্তু প্রেমের অন্তরতম অভিজ্ঞতা যেন আপনার সত্যে আপনি বিশ্বাস না হারায়।

আমাদের যে অতি প্রিয়, প্রিয়দর্শন ছাত্রটি এখানে এসেছিল—না-জানার অতলস্পর্শ অন্ধকার থেকে জানার জ্যোতির্ম্ময়লোকে—এল তার জাগ্রত জীবন্ত ঔৎসুক্যপূর্ণ চিত্ত নিয়ে, আমাদের কাজে কর্ম্মে সুখে দুঃখে যোগ দিলে—আজ শুনচি সে নেই। কিন্তু যেই শুনলুম সে নেই,

অমনি তার কত ছোট ছোট কথা বড় হয়ে উঠে আমাদের মনের সামনে দেখা দিলে। ক্লাসে যখন সে পড়্‌ত, তখন সেই পড়ার সময়কার বিশেষ দিনের বিশেষ এক-একটি সামান্য ঘটনা, বিশেষ কথায় তার হাসি, বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে তার উৎসাহ, এসব কথা এতদিন বিশেষভাবে মনে ছিল না, আজ মনে পড়ে গেল। তারপরে ছেলেদের আনন্দবাজারে যে-সব কৌতুকের উপকরণ সে জড় করেছিল, সে সমস্ত আজ বড় হয়ে মনে পড়েচে।

বড়লোকের বড়কীর্ত্তি আমাদের স্মরণক্ষেত্রে আপনি জেগে উঠে। সেখানে কীর্ত্তিটাই নিজের মূল্যে নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু এই বালকের যে-সব কথা আমাদের মনে পড়্‌চে, তাদের ত নিজের কোনো নিরপেক্ষ মূল্য নেই। তারা যে বড় হয়ে উঠেছে সে কেবল একটি মূল সত্যের যোগে। সেই সত্যটি হচ্চে সেই বালক স্বয়ং। পূর্ব্বেই বলেচি সত্য ভূমা। অর্থাৎ বাইরের মাপে, কোনো প্রয়োজনের পরিমাণে তার মূল্য নয়—তার মূল্য আপনাতেই। সেই মূল্যেই তার ছোটও ছোট নয়, তার সামান্য চিহ্নও তুচ্ছ নয়—এই কথাটি ধরা পড়ে প্রেমের কাছে।

তোমাদের সঙ্গে সে যে হেসেছিল, খেলেছিল, একসঙ্গে পড়েছিল, একি কম কথা! তার সেই হাসি খেলা, তোমাদের সঙ্গে তার সেই পড়াশোনা, মানুষের চিরউৎসারিত সৌহার্দ্দ্য-ধারারই অঙ্গ, সৃষ্টির মধ্যে যে অমৃত আছে, সেই অমৃতেরই অংশ। আমাদের এখানে তোমাদের যে প্রাণপ্রবাহ, যে

আনন্দপ্রবাহ বয়ে চলেছে, তার মধ্যে সেও তার জীবনের গতি কিছু দিয়ে গেল, এখানকার সৃষ্টির মধ্যে সেও আপনাকে কিছু রেখে গেল। এখানে দিনের সঙ্গে দিন, কাজের সঙ্গে কাজ, ভাবের সঙ্গে ভাব, প্রতিদিন যে গাঁথা পড়চে, নানা রঙে নানা সুতোয় মিলে এখানে একটি রচনাকার্য্য চল্‌চে। সেইজন্যে এখানে আমাদের সকলেরই জীবনের ছোট বড় নানা টুক্‌রো ধরা পড়ে যাচ্চে: সেই বালকেরও জীবনের যে অংশ এখানে পড়েচে, সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সেইটুকু রয়ে গেল, এই কথাটি আজ তার শ্রাদ্ধ-দিনে মনে করতে হবে।

তা ছাড়া তার জীবনের কীর্ত্তিও কিছু আছে এখানে। ভুবনডাঙার গরীবদের জন্যে সে এখানে যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছে, তার কথা তোমরা সবাই জান। চাঁদা সংগ্রহ করে আমরা অনেক সময়ে মঙ্গল অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু তার চেয়ে বড় হচ্চে নিজের সাধ্য দ্বারা, নিজের উপার্জ্জনের অর্থের দ্বারা কাজ করা। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে মুলু তাই করেচে। সে পুরানো কাগজ নিজে বোলপুরে বয়ে নিয়ে বিক্রী করে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করত। সে নিজে তাদের শেখাত, তাদের আমোদ দিত। এ সম্বন্ধে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কোনো সাহায্য সে নেয়নি। এই অনুষ্ঠানটি কেবল যে তার ইচ্ছা থেকে প্রসূত, তা নয়, তার নিজের ত্যাগের দ্বারা গঠিত। তার এই কাজটি, এবং তার চেয়ে বড় তার এই উৎসাহটি, আশ্রমে রয়ে গেল।

পূর্ব্বে বলেচি, অপরিসীম অ-জানা থেকে জানার মধ্যে মানুষ আস্‌বামাত্রই সেই না-জানার শূন্যতা এক নিমেষে চলে যায়—সেই না-জানার মহাগহ্বর সত্যের দ্বারা নিমেষে পূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরের মধ্যে বুঝ্‌তে পারি, আমাদের গোচরতা এবং অগোচরতা দুইকেই ব্যাপ্ত করে সত্যের লীলা চল্‌চে। অগোচরতা সত্যের বিলোপ নয়। পাবার বেলায় এই যে আমাদের অনুভূতি, ছাড়বার বেলায় একে আমরা ভুলব কেন? ঢেউয়ের চূড়াটি নীচের থেকে উপরে যখন উঠে পড়্‌ল, তখন সত্যের বার্ত্তা পেয়েচি, ঢেউয়ের চূড়াটি যখন উপর থেকে নিচে নেমে পড়্‌ল, তখন সত্যের সেই বার্ত্তাটিকে কেন বিশ্বাস করব না? এক সময়ে সত্য আমাদের গোচরে এসে "আমি আছি" এই কথাটি আমাদের মনের মধ্যে লিখে দিলে—তার স্বাক্ষর রইল; এখন সে যদি অগোচরে যায়, অন্তরের মধ্যে তার এই দলিল মিথ্যা হবে কেন? ঋষি বলেচেন—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

এই শ্লোকটির অর্থ এই যে, মৃত্যু সৃষ্টির বিরুদ্ধ শক্তি নয়। এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে যেগুলি চালক শক্তি, তার মধ্যে অগ্নি হচ্চে একটি; অণু পরমাণুর অন্তরে অন্তরে থেকে তাপরূপে অগ্নি যোজন বিয়োজনের কাজ করচেই। সূর্য্যও তেমনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে এবং ঋতুসম্বৎসরকে চালনা করচে। জল পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবহমান, বায়ু পৃথিবীর

নিশ্বাসে নিশ্বাসে সমীরিত। সৃষ্টির এই ধাবমান শক্তির মধ্যেই মৃত্যুকেও গণ্য করা হয়েচে। অর্থাৎ মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণকে অগ্রসর করে দিচ্চে—মৃত্যু ও প্রাণ এই দুইয়ে মিলে তবে জীবন। এই মৃত্যুকে প্রাণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভক্ত করে দেখ্‌লে, মিথ্যার বিভীষিকা আমাদের ভয় দেখাতে থাকে। এই মৃত্যু আর প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিরাট ছন্দের মধ্যে আমাদের সকলের অস্তিত্ব বিধৃত হয়ে লীলায়িত হচ্চে; এই ছন্দের যতিকে ছন্দ থেকে পৃথক করে দেখ্‌লেই তাকে শূন্য করে দেখা হয়, দুইকে অভেদ করে দেখ্‌লেই তবেই ছন্দকে পূর্ণ করে পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মৃত্যুতেই এই যতিকে ছন্দের অঙ্গ বলে দেখা সহজ হয়—কেননা, আমাদের প্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্যে শ্রাদ্ধের দিন হচ্চে শ্রদ্ধার দিন, এই কথা বলবার দিন যে, মৃত্যুর মধ্যে আমরা প্রাণকেই শ্রদ্ধা করি।

আমাদের প্রেমের ধন স্নেহের ধন যারা চলে যায়, তারা সেই শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে দিক, তারা আমাদের জীবনগৃহের যে দরজা খুলে দিয়ে যায়, তার মধ্য দিয়ে আমরা শূন্যকে যেন না দেখি, অসীম পূর্ণকেই যেন দেখতে পাই। আমাদের সেই যে অসত্য দৃষ্টি, যা জীবন-মৃত্যুকে ভাগ করে ভয়কে জাগিয়ে তোলে, তার হাত থেকে সত্যস্বরূপ আমাদের রক্ষা করুন, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতে নিয়ে যান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছাত্র মুলু

দুর্গম স্থানে যাইবার, অজানা লক্ষ্য সন্ধান করিবার প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক উৎসাহ আছে, বিশেষত যাদের বয়স অল্প। এই যাত্রাকালে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া পদে পদে বাধা অতিক্রম করাই আমাদের প্রধান আনন্দ। কেননা, এই রকম নিজের শক্তির পরিচয়েই মানুষের আত্ম-পরিচয়ের প্রবলতা।

এই কারণে আমার মত এই যে, শিক্ষার প্রথম ভূমিকা সমাধা হইবার পরেই ছাত্রদিগকে এমন পাঠ দিতে হইবে যাহা তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। অথচ শিক্ষক এই কঠিন পাঠ তাহাদিগকে এমন কৌশলে পার করাইয়া দিবেন যে, ইহা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য না হয়। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রণালী এমন হওয়া উচিত, যাহাতে ছাত্রেরা পদে পদে দুরূহতা অনুভব করে, অথচ তাহা অতিক্রমও করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মনোযোগ সর্ব্বদাই খাটিতে থাকে এবং সিদ্ধিলাভের আনন্দে তাহা ক্লান্ত হইতে পায় না।

এখানকার বিদ্যালয়ে আমি যখন ইংরেজি শিখাইবার ভার লইলাম, তখন এই মত অনুসারে আমি কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষার দায়িত্ব আমার হাতে আসিল। তৃতীয় শ্রেণীতে আমি যে সকল ইংরেজি রচনা পড়াইতে সুরু করিলাম, তাহা

সাধারণত কলেজে পড়ানো হইয়া থাকে। অনেকেই আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, এরূপ প্রণালীতে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না।

মুলু আমার এই ক্লাসের ছাত্র ছিল। পড়াতে সে কাঁচা এবং পড়ায় তাহার মন নাই বলিয়া তাহার সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল। শিশুকাল হইতেই তাহার শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া প্রণালীবদ্ধভাবে পড়াশুনা করার অভ্যাস তাহার ঘটে নাই। এইজন্য নিয়মিত ক্লাসের পড়ায় মন দেওয়া তাহার পক্ষে বিতৃষ্ণাকর এবং ক্লান্তিজনক ছিল।

বাল্যকালে ক্লাসের পড়ায় আমার অরুচি নির্বিশেষ প্রবল ছিল, একথা আমি অনেকবার কবুল করিয়াছি। এইজন্য প্রাচীন বয়সে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াও, পাঠে কোনো ছাত্রের অমনোযোগ বা অরুচি লইয়া ক্রোধ বা অধৈর্য্য আমাকে শোভা পায় না। পাঠে যাহাতে ছেলেদের মন লাগে একথা আমি বিশেষভাবে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি না; অর্থাৎ পাঠে অনবধান বা শৈথিল্যের জন্য সকল দোষ ছেলেদেরই ঘাড়ে চাপাইয়া ভর্ৎসনা এবং শাস্তির জোরে মাষ্টারির কাজ চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব।

সেইজন্য আমার ক্লাসের ইংরেজি পড়ায় মুলুর মন লাগে কিনা তাহা আমার বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল। যেরূপ আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল, মুলুর মন লাগিতে কিছুই বিলম্ব হইল না। কোনো কোনো ছেলে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিবার ভয়ে পিছনের আসনে বসিত। কিন্তু মুলুর আসন ছিল

ঠিক আমার সম্মুখেই। সে দুরূহ পাঠ্য বিষয়কে যেন উৎসাহী সৈনিকের মত স্পর্দ্ধার সহিত আক্রমণ করিতে লাগিল।

আমার ক্লাসে ছেলেরা যে বাক্যগুলি নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করিত, ঠিক তাহার পরের ঘণ্টাতেই এণ্ড্রুজ সাহেবের নিকট তাহাদিগকে সেই বাক্যগুলিরই আলোচনা করিতে হইত। মুলু এইসব বাক্য লইয়া ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল প্রবন্ধ সে এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে উপস্থিত করিত। এমন হইল, সে দিনের মধ্যে তিনটা চারিটা প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল।

এই যে তাহার উৎসাহ হঠাৎ এতদূর বাড়িয়া উঠিল, তাহার কারণ আছে। প্রথমত, আমার ইংরেজি ক্লাসে আমি কখনই ছাত্রদিগকে বাংলা প্রতিশব্দ বলিয়া দিয়া পাঠ মুখস্থ করাই না। প্রতিপদেই ছাত্রদিগকে চেষ্টা করিতে দিই। এই চেষ্টা করিবার উদ্যমে মুলুর চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা তৃপ্ত হইত। আমি যতদূর বুঝিয়াছিলাম, বাহির হইতে কোন শাসন বা তাগিদ সম্বন্ধে মুলু অসহিষ্ণু ছিল। তাহার পরে, তাহাদের পাঠ্য বিষয় বিশেষরূপে কঠিন ছিল বলিয়াই মুলু তাহাতে গৌরব বোধ করিত। এই কঠিন পাঠে তাহাদের প্রতি যে-শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা সে অনুভব করিয়াছিল। এইজন্য ইহার যোগ্য হইবার জন্য তাহার বিশেষ জেদ ছিল। আর একটি কথা এই, যে, আমি ন্যুম্যান, ম্যাথু আর্নল্ড্, ষ্টিভেন্‌স্‌ন্ প্রভৃতি লেখকের রচনা হইতে যে-সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে পড়াইতাম,

তাহার মধ্যে গভীরভাবে ভাবিবার কথা যথেষ্ট ছিল। এই কথাগুলি কেবলমাত্র ইংরেজি বাক্য শিক্ষার উপযোগী ছিল, এমন নহে। ইহাদের মধ্যে প্রাণবান সত্য ছিল,—সেই সত্য মুলুর মনকে যে আলোড়িত করিয়া তুলিত তাহার প্রমাণ এই যে, এইগুলি কেবলমাত্র জানিয়া ইহার অর্থ বুঝিয়াই সে স্থির থাকিতে পারিত না; ইহাতে তাহার নিজের রচনাশক্তিকে উদ্রিক্ত করিত। কাঠে অগ্নি সংস্পর্শ সার্থক হইয়াছে তখনি বুঝা যায় যখন কাঠ নিজে জ্বলিয়া উঠে। ছাত্রদের মনে শিক্ষা তখনি সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝি, যখন তাহারা কেবলমাত্র গ্রহণ করে এমন নহে, পরন্তু যখন তাহাদের সৃজনশক্তি উদ্যত হইয়া উঠে। সে শক্তি বিশেষ কোনো ছাত্রের যথেষ্ট আছে কি নাই, সে শক্তির সফলতার পরিমাণ অল্প কি বেশি, তাহা বিচার্য্য নহে, কিন্তু তাহা সচেষ্ট হইয়া ওঠাই আসল কথা। মুলু যখন তাহার নবলব্ধ ভাবগুলি অবলম্বন করিয়া দিনে দুটি তিনটি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল, তখন এণ্ড্রুজ তাহার মনের সেই উত্তেজনা লইয়া প্রায় আমার কাছে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন।

এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানসিক উদ্যমশীল বালক অল্প কিছুদিন আমার কাছে পড়িয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাকে কোনো একটা বাঁধা নিয়মে টানিয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন; ইহার নিজের বিচারবুদ্ধি ও সচেষ্ট মনকে সহায় না পাইলে ইহাকে বাহিরে বা ভিতরে চালনা করা দুঃসাধ্য। সকল ছেলে সম্বন্ধেই একথা কিছু না কিছু খাটে এবং এইজন্যাই

প্রচলিত প্রণালীর শিক্ষাব্যাপারে সকল মানবসন্তানই ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয় এবং জবরদস্তি দ্বারা তাহার সেই স্বাভাবিক বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহাকে পীড়া দেওয়াই বিদ্যালয়ের কাজ। বাহ্য শাসন সম্বন্ধে মুলুর সেই বিদ্রোহ করা সহজ হইত না বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং ইহাও আমার বিশ্বাস ছিল যে, অন্তত ক্লাসে ইংরেজি পড়া সম্বন্ধে আমি তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে অকৃতকার্য্য হইতাম না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'প্রসাদ' [মাঘ ১৩২৬]

পরিশিষ্ট

খ

রামানন্দকে লিখিত ৭৯ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে এণ্ড্রুজকে লেখা পত্র।

Vienna. July 20. 1926.

My Friend,

My mind is passing through a conflict. I have my love and gratitude for the people of Italy. I deeply appreciate their feeling of admiration for me which is so genuine and generous. On the other hand the Italy revealed in Fascism alienates herself from my own ideal picture of that country which I should love to cherish in my heart. I fervently hope that this movement is not in harmony with the true nature of Italy, and that it is only a momentary eruption on her surface life. The painful facts about this movement that are daily coming to my notice since I have left Italy make them almost a matter of personal grievance for me because of the assurance I have had from the people of that land of their regards for my own self.

You know that I had my first introduction to Italy when I was invited to Milan last year. It takes long to study the mind of a people but not to feel their heart when that heart opens itself. I was in the town only for a few days and in that short time I realised that the people

really loved me. One can claim, rightly or wrongly, praise as one's desert, but love is a surprise every time that it comes. I was strongly moved by that surprise when I found loving friends and not merely kind hosts in the people of Italy. It grieved me deeply, and I felt almost ashamed, when I suddenly fell ill and had to sail back home before I could fulfil my engagements in all other towns.

Then followed the magnificent gift from Mussolini, an almost complete library of Italian literature for my institution. It was a great surprise to me. In this greeting I felt the touch of a personality which could express itself in this manner, in an appropriate action of unstinted magnificence.

This helped me to make up my mind to visit Italy once again in spite of the misgivings created by the reports reaching us in India about the character of the Fascist movement. I could gather from the literature that had come to my notice that the Fascist movement contained in it elements that were against my ideals, that it was tainted by conspiracy, dealing its blows in secret, driving the corrupt politics of Europe towards barefaced barbarity. But lately we have lost our faith in all mutually recriminating reports from

the western countries. For it is an open secret that along with the army and navy and air crafts the bigger nations of the West think it necessary to maintain their organizations of world-wide propaganda of misrepresentation. Neither did I have any qualification nor the intention to dabble in politics which specially concerns any of the European countries. And this was why I wanted to keep my mind neutral when I came to Italy. But we live in a whirlwind to talk today and an individual like myself is compelled to contribute to that universal noise, dragged by the chain of *Karmas* as we say in our country.

I allowed myself to fall a victim to this relentless Karma with its ever lengthening coil of consequence when I succumbed to the importunity of press interviewers in Italy.

An interview is a dangerous trap in which our unwary opinions are not only captured but mutilated. Words that come out of a moment's mood are meant to be forgotten, but when they are snap-shotted, most often our thoughts in them are presented in a grotesque posture which is an irony of accident. The camera in this case being also a living mind the picture becomes a composite one in which two dissimilar features of mentality have a mesalliance that is likely to be unhappy and undignified.

My interviewers in Italy were the products of three personalities— that of the reporter, the interpreter and mine. Over and above that, there evidently was a hum in the atmosphere of another insistent and universal whisper which without our knowing it, mingled in all our talks. Being ignorant of Italian I had no means of checking the result of this concoction. The only precaution which I could take was to repeat emphatically to all my listeners that I had no opportunity to study the history and character of Fascism.

But since then I have had the chance of knowing the contents of some of these interviews from the newspaper cuttings that my friends have gathered and translated for me. And I was not surprised to find in them what was inevitable. Through misunderstanding, wrong emphasis, natural defects in the means of communication, and the pre-occupation of the national mind, some of these writings have been made to convey that I have given my deliberate opinion on Fascism, expressing my unqualified admiration.

This time it was not directly the people of Italy whose hospitality I enjoyed, but that of Mussolini himself as the head of the Government.

This was no doubt an act of kindness, but somewhat unfortunate for me. For, always and everywhere official vehicles, though comfortable, move only along the chalked path of programme too restricted to lead to any places of significance, or persons of daring individuality ; they are for providing visitors only with specially selected morsels of experience.

The opinions which I could gather in an atmosphere of distraction were enthusiastically unanimous in the praise of Mussolini for having rescued Italy in a most critical moment of her history from the brink of ruination. In Rome I came to know a professor, a genuinely spiritual character, a seeker of peace who was strongly convinced not only of the necessity but of the philosophy of Fascism. About the necessity I am not competent to discuss, but about the philosophy I am doubtful. For it costs very little to fashion a suitable philosophy in order to mitigate the rudeness of facts that secretly hurt one's conscience. One thing that surprised me most, coming from the mouths of fervent patriots, that the Italian people, owing to their unreasoning impulsive nature, had proved their incapacity to govern themselves, and therefore in the inevitable logic of things they lent themselves to be

governed from the outside by strong hands. However these are the facts that immediately and exclusively concern Italy herself, the validity even of which has sometimes been challenged by European critics. But whatever may be the case, the methods and the principle of this Fascism concern all humanity, and it is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses freedom of expression, enforces observances that are against individual conscience, and walks through a blood-stained path of violence and stealthy crime. I have said it over and over again that the aggressive spirit of Nationalism and of Imperialism, religiously cultivated by most of the nations of the West, is a menace to the whole world. The demoralisation which it produces in European politics is sure to have disastrous effects, especially upon the peoples of the East, who are helpless to resist Western methods of exploitation. It would be most foolish, if it were not almost criminal, for me to express my admiration for a political ideal which openly declares its loyalty to brute force as the motive power of civilisation. That barbarism is not altogether compatible with material prosperity may be taken for granted, but the cost is terribly great—it is fatal. This worship of unscrupulous force as the vehicle of nationalism

keeps ignited the fire of international jealousy which is for universal incendiarism, a fearful orgy of devastation. The mischief of the infection of this moral aberration is great because today the human races have come close together and any process of destruction once set going does its work in an enormously wholesale manner. Knowing all this could I be credited to having played my fiddle while an unholy fire was being fed with human sacrifice?

I was greatly amused in reading in a Fascist organ how the writer vehemently decrying pantheistic philosophy of the passive and meditative East, comparing with it the vigorous self-assertion and fury of efficiency which he acknowledges to have been borrowed by his people from their modern schoolmasters in America. This has suggested to my mind the possibility of the idea of Fascism being an infection from across the Atlantic.

The unconscious irony in this paper lies in the fact of the writer's using with unction the name of Christanity in this context, the religion which had its origin in the East. He evidently does not realise that if Christ were born again in this world he would forcibly have been turned back from New York had he come there from outside, if for nothing else,

at least for the want of the necessary amount of dollars to be shown to the gatekeeper. Or if he had been born in that land, Ku Klux Klan would secretly have knocked him to death or have lynched him. For did he not give utterance to the political blasphemy that blessed are the meek, thus insulting the Nordic right to rule the world ? and the economic heresy that blessed are the poor ? Would he not have been put into prison for twenty or more years for saying that it was as easy for the prosperous to reach the kingdom of heaven as for the camel to pass through the eyes of a needle ? The fascist professor deals a pen-thrust against what he calls our pantheism which as a word has no synonym in our language nor as a doctrine any place in our philosophy. He does not seem to have realised that the Christian idea that God remains essentially what he is while manifesting himself in the son's being belongs to the same principle as our principle of immanence. The divinity of God according to it accepts humanity for its purpose of self-revelation and bridges the infinite gulf between them. This idea has glorified all human beings, has had the effect in the Christian West to emancipate individuals from the thraldom of absolute power. This has trained that attitude of mind which is the origin

of the internal politics of western people. It has helped to distribute the power of government all over the country and thus has given it a permanent foundation which cannot be tampered with or destroyed by the will of one individual or whim of a group of them. This consciousness of the dignity of the individual has encouraged in the West the freedom of conscience and thought. We in the East come to Europe for this inspiration. We are also dreaming of the time when the individuals belonging to the people of India will have the courage to think for themselves and express their thoughts, feel their strength, know their rights and take charge of their own government.

The fascist organ is evidently fascinated by the prospect of economic self-aggrandisement of the nation at the cost of moral self-respect of the people. But it is the killing of the goose for the sake of the golden eggs. In the olden civilisations the slavery of the people did build for the time being stupendous towers of splendour. But this spirit of slavishness constantly weakened the foundations till the towers came down to the dust, offering as their sole contribution to humanity ruins haunted by venerable ghosts.

In bygone days in India, the state was only a part of the people. The mass of the population

had its own self-government in the village community. Dynasties changed but the people always retained the power to manage all that was vital to them. This has saved them from sinking into barbarism, this has given our culture a community through centuries of political vicissitude.

Our western rulers have destroyed this fundamental structure of our civilisation, the civilisation based upon obligations of intimate human relationship. And therefore nothing today has been left for the people through which they can express their collective mind, their creative will, realise the dignity of their soul, except the political instrument the foreign model of which is always before their envious gaze. We come to Europe for our lesson in the mastery of this instrument, as Japan has done and has been successful in her purpose. But must our friend, the fascist philosopher, come to us to copy our political impotence, the result of the surrender of freedom for centuries to the authority of some exclusive reservoir of concentrated power, while rejecting our great ideal of spiritual freedom which has its basis upon the philosophy that infinite truth is everywhere, and that it is for everyone to reach it by removing the obstruction of the self that obscures light?

I am sure that you will be interested to know what was the impression that I have carried from my interview with Mussolini. We met only twice and our meetings were extremely brief owing, very likely, to our mutual difficulty of communication through the slow and interrupted medium of an interpreter.

In the hall which emphasised its bigness by the unusual bareness of its furniture Mussolini has his seat in a distant corner. I believe this gives him the time to observe visitors who approach him, and makes him ready to deal with them. I was not sure of his identity while he was walking towards me to receive me, for he was not tall in proportion to his fame that towers high. But when he came near me I was startled by the massive strength of the head. The lower part of the face, the lips, the smile revealed a singular contradiction to the upper one, and I have often wondered since then, if there was not a secret hesitation in his nature, a timid doubt which was human. Such an admixture of vacillation in a masterful personality makes his power of determination all the more vigilant and strong because of the internecine fight in its own character. But this is a mere surmise.

For an artist it is a great chance to be able to meet a man of personality who walks solitary

among those who are mere fragments of a crowd which is always on the move, pressed from behind. Such men are the makers of history and one cannot but feel anxious lest they might miss their eternity by using all their force in capturing the present by its throat leaving it killed for all future. Men have not altogether been rare who furiously created their world by trampling human materials into the shape of their megalomaniac dreams, at last to burden history with the bleached bones of their short-lived glory, while there were others, the serene souls, who with their light of truth and magic of love have made deserts fruitful along endless stretches of grateful years.

But, to be honest, I must confess that I cannot fully trust my own impression caught from a momentary glimpse of Mussolini with which mingled the emphasis of the surroundings in which I was placed. There have been times when history has played tricks with men and through a combination of accidents has magnified the features of essentially small persons into a parody of greatness. Such a distortion of truth often finds its chance not because these men have an extra-ordinary power in themselves but because they represent some extraordinary weakness of those whom they lead. This pro-

duces a mirage of wrong appearance and startles our imagination into a feeling of awe and exaggerated expectation. To be tortured by tyranny is tolerable but to be deluded into the worship of a falsified ideal is humiliating for the whole age which by chance is submitted to it. If Italy has made even a temporary gain through a ruthless politics she may be excused from such an obsession—but for us outsiders who believe in idealism there can be no such excuse. And therefore it would be wise for us to wait before we bring our homage to a person, who has suddenly been forced upon our attention by a catastrophe, till through the process of time all the veils are removed that are woven round him by colourful sensations of the moment.

My letter has run on to a great length. But I hope you will bear with it knowing that it has helped me in making my thoughts clear about my experience in Italy and also explaining the situation in which I have been placed.

Rabindranath Tagore

পরিশিষ্ট

গ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৮৬৫ - ১৯৪৩

১
৩ জুলাই ১৮৯৮

বাঁকুড়া
২০শে আষাঢ়, ১৩০৫
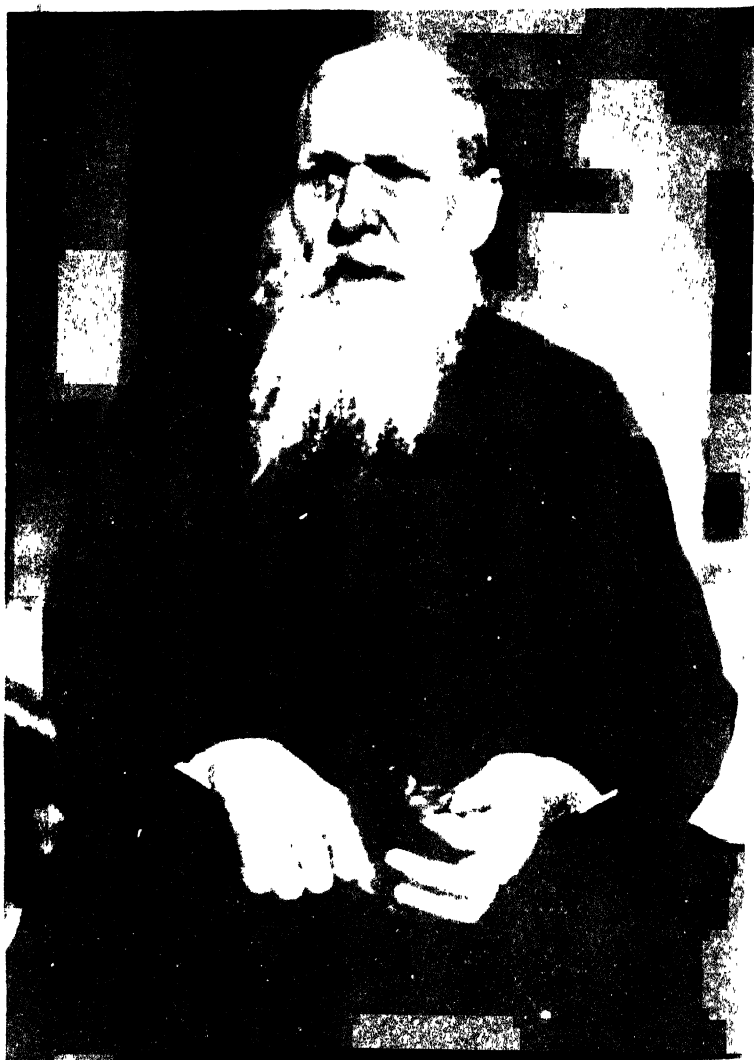
মান্যবরেষু,

"প্রদীপে" প্রকাশার্থ আপনি যে কবিতাটি দিয়াছেন, তজ্জন্য সাতিশয় অনুগৃহীত হইলাম।

জ্যৈষ্ঠের "ভারতীতে" প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আপনি কোথায় কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হয় জানিতে চাহিয়াছেন। আমাদের এই বাঁকুড়া সহরের অন্তর্গত রামপুর ও গোপীনাথপুর নামক দুইটি পল্লীতে, লুধিয়ানা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানের ন্যায় নানাবিধ চাবখানার কাপড় প্রস্তুত হয়। তসরের উৎকৃষ্ট কোটের ও চাপকানের কাপড়, ধুতি ও সাড়ী, গর্ভসূতি বা বাফ্‌তা এবং সুন্দর টেব্‌ল্‌ক্লথ্‌ও প্রস্তুত হয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর সহরে গরদের থান, ধুতি এবং সাড়ী প্রস্তুত হয়। বাঁকুড়া সহরে বাসন (পিতল ও কাঁসার) সকল প্রকারই তৈয়ারী হয়। তন্মধ্যে অপর জেলাতে প্রধানতঃ এলোকেশী (মুখ বিশিষ্ট) ডিবে, গাড়ু, পোর্সলেন ডিষের অনুকরণে নির্ম্মিত কাঁসার ডিষ, প্রভৃতি রপ্তানী হইয়া থাকে। স্বদেশবস্তু ভাণ্ডারের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় অত্রস্থ মুখার্জ্জি কোং'র কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু রামনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিলে জিনিষের মূল্য, কারিকরের নাম, কলিকাতা পাঠাইবার খরচ প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক্ খবর জানিতে পারিবেন।

মেদিনীপুরে একপ্রকার পিতলের জগ্ (Jug) নির্ম্মিত হয়, তাহা বড়ই সুন্দর। এখানে সাধারণ ব্যবহার্য্য লন্ঠন বেশ সুন্দর প্রস্তুত হয়। ইতি

অনুগৃহীত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
"প্রদীপ" সম্পাদক

২
২৫ অক্টোবর ১৯১৭

কলিকাতা
৮ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি "আমার ধর্ম্ম" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাহার ইংরেজী হওয়া দরকার। ইংরেজীতে উহা বাহির হইলে আপনার ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের লোকদের ধারণা ঠিক হইবে। এখন কেহ বা আপনাকে বৌদ্ধ, কেহ বৈষ্ণব, কেহ মধ্যযুগের Saint কেহ বা Mystic বলিয়া নিশ্চিন্ত আছে। ইংরেজী প্রবন্ধটি Sādhana কিম্বা personality, এই দু-খানি বহির যেটিতে ইচ্ছা ছাপিতে পাঠাইতে পারেন, আমার এইরূপ মনে হইতেছে। এই Suggestion মডার্ন রিভিয়ুর জন্য করিতেছি না।

আপনার জীবনের ভিতরের কথা আপনার গ্রন্থাবলী হইতে

অনেকটা বুঝা যায়। সমস্ত চিঠি সকলে রাখিলে আরও বুঝা যাইত। কিন্তু বাহিরের ব্যাপারও কিছু কিছু জানা দরকার। তাহাতে অন্ততঃ সত্যের অপলাপ নিবারিত হয়। আপনি জমিদারী সম্বন্ধে বা স্বদেশী সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, তাহা…না অন্য কোন রকমে লিখিয়া রাখিয়াছেন কিনা জানি না; কিন্তু এগুলির এবং অন্যান্য বাহ্য ঘটনার একটি বৃত্তান্ত থাকা দরকার। আমি এসব জিনিষ সাময়িক পত্রে ছাপিতে বলিতেছি না। সদ্য সদ্য, বহিতেও না। কিন্তু যাহা আপনার নিকট হইতে ভিন্ন জানা যাইবে না, তাহা আপনি লিখিয়া রাখিলে ভাল হয় বলিয়া এই চিঠি লিখিতেছি। জমিদারী সম্বন্ধে আপনি যাহা করিয়াছেন, বোলপুরে একদিন তাহা আপনার মুখে শুনিয়া, তখনই আপনাকে এ সব কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম। কোন একটা কারণে এতদিন বলি নাই। ইতি

ভবদীয়

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩

২৯ অক্টোবর ১৯১৭

কলিকাতা

১২ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

আজ সকালে আপনাকে চিঠি লেখার পর মনে হইল, মডার্ন রিভিয়ুতে আপনি The nation নাম দিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাও Nationalism বহিতে থাকা আবশ্যক। আপনি Nation এর অর্থ করিয়াছেন The people of a country organised for political and economical exploitation, আপনার কাছে শুনিয়াছি কোন কোন ইংরেজ সমালোচক ইহাতে খুঁত ধরিয়াছেন। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, cultural unity ইত্যাদি থাকিলে nation হয়। কিন্তু আপনি বলিতেছিলেন যে এরূপ unity আমাদের থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য লোকেরা আমাদিগকে nation বলিয়া মানিতে চায় না। ইহা ঠিক্ জবাব। এসব কথা The nation প্রবন্ধে আপনি জুড়িয়া দিয়া তাহার পর Nationalism বহিতে ঐ প্রবন্ধ ছাপিলে বেশ হইবে। "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানটির সংস্কৃত পাইলে আমি মূল ও অনুবাদ নাগরী অক্ষরে ছাপিয়া প্রচারের ভার লইতে পারি।

আপনি প্রবাসীর সম্পাদক হইলে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিতেন না বলিয়াছেন। তাহা ঠিক্। কেন না, তাহা হইলে

তখন সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও আপনি ছাড়িতেন না। প্রবাসীর বর্ত্তমান সম্পাদকও মনে মনে কখনও ছাড়ে নাই; কিন্তু মুখে বেশী তাগিদ দেয় নাই এই জন্য যে সম্পাদকতা তাহার জীবিকা। সেটাও বোধ হয় আমার ভুল। আমার ইহা বুঝা উচিত ছিল যে আপনার নিকট লেখা চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করা আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য।

অগ্রহায়ণ মাসের কাগজটি বাহির হইলে প্রবাসীর বয়স ২০০ মাস হইবে। ১ম মাসে আপনার লেখা ছিল। ২০০তম মাসের জন্য কিছু একটি পাইলে আনন্দিত হইব। আপনার চিঠিখানি শান্তা দখল করিল। প্রত্যেক চিঠির অন্ততঃ দুপ্রস্ত নকল আপনার হাতের পাইলে তবে ঠিক্ হয়।

ভবদীয়

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪

২২ আগষ্ট ১৯২৫

শান্তিনিকেতন,

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬ই ভাদ্র, ১৩৩২।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা—আচার্য্য

মহোদয় সমীপে,

সবিনয় নিবেদন—

আমি যখন শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষের পদ আপাততঃ পাঁচমাসের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমার এই ধারণা

ছিল যে, ইহা বাহিরের কোন কর্তৃপক্ষের শাসন পরিদর্শন-আদির অধীন হইবে না। এক্ষণে দেখিতেছি, সে ধারণা ভ্রান্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার যে চিঠির দ্বারা বিশ্বভারতীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ, ও বি-এ পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে এই সর্ত্তের উল্লেখ আছে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিশ্বভারতী অথবা শিক্ষাভবন পরিদর্শন করাইবেন।, এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের মত কি, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি বাহিরের কোন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের অধীন কোন বিদ্যামন্দিরে কাজ করিতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। এই জন্য আমি দুঃখের সহিত শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষতা কার্য্যে ইস্তফা দিতেছি। আপনি দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করিলে উপকৃত হইব। ইতি

আজ্ঞাধীন

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ।

৫

২৩ আগষ্ট ১৯২৫

শান্তিনিকেতন

৭ই ভাদ্র, ১৩৩২।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার নামে কল্য আমার যে ইস্তফা পত্র পাঠাইয়াছি, তাহা পাইয়া থাকিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশ্যন্সের যে ধারা অনুসারে বিশ্বভারতীকে তাঁহাদের পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহা দেখিলাম। তাহাতে পরিদর্শন করা বা না করা কিছুরই উল্লেখ নাই।

যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার পরীক্ষা ও উপাধিগুলি recognise করেন, তাঁহারা কেহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে inspect করিবার সর্ত করেন নাই।

যাহা হউক, এ সকল বিষয় আপনাদের বিবেচ্য। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি inspection এ রাজী নহি বলিয়া ইস্তফা দিয়াছি। তাহা গ্রহণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৬

৯ মে ১৯২৬

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৩।

ভক্তিভাজনেষু

এই চিঠি লিখিতেছি বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। কোন প্রকারে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমি আপনার লেখা পাইবার জন্য কখনও কাড়াকাড়ি করি নাই। তাহা আগ্রহ ও লোভের অভাববশতঃ নহে। তাহার কারণ অন্যরূপ। আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে

অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা একটি কারণ। দ্বিতীয়তঃ, যে-যে স্থলে আপনি টাকা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তথায় আমি টাকাও দিয়াছি। আগে আগে আমি নিজেই এ সব স্থলে কিছু টাকা দিতাম। সম্প্রতি "পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী" প্রকাশের মাঝামাঝি বা তাহার পরে (আমি তখন প্রায় শান্তিনিকেতনে থাকিতাম বলিয়া ঠিক্ সময় মনে নাই) বিশ্বভারতী কার্য্যালয় দশটাকা করিয়া পৃষ্ঠাহার নির্দ্দেশ করেন। ঐ হারে কিছু টাকা দেওয়া হইয়াছে। পরে হার -নির্দ্দেশের ভার প্রবাসী আফিসের উপরই দেওয়া হয়। প্রবাসী আফিস ও প্রেস এবং বিশ্বভারতী কার্য্যালয় উভয় পক্ষের দেনাপাওনার হিসাব হইয়া গেলে বাকী টাকা যত শীঘ্র পারি, দিব।

যাহা হউক উক্ত উভয় কারণে আমার একটা ধারণা ও আশা জন্মে, যে, যে-লেখার জন্য আপনি টাকা লইতে সম্মত তাহা আমি পাইব, এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিব। কিন্তু কাল রাত্রে শান্তিনিকেতনে আহারের পর শুনিলাম, যে, "নটীর পুরস্কার" নাটিকাটি "বসুমতীকে" ছাপিবার জন্য ৬০০ টাকায় দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য যদি প্রবাসী উহা প্রকাশ করিবার অযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কিছু বলা উচিত নহে। অন্যথা আমার পক্ষে ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। ছয়শত টাকা দিতে সম্ভবতঃ আমিও পারিতাম। আমি প্রবাসীতে "মুক্তধারা" ছাপিবার অধিকারের জন্য ১২৫০ টাকা নগদ এবং ৩৭৫০ খানি "মুক্তধারা" বিশ্বভারতীকে দিয়াছিলাম।

সুতরাং "নটীর পুরস্কার" পাইলে সম্ভবতঃ দরদস্তুর করিতাম না। এ সব কথা আপনার জন্য লিখিতেছি না; লিখিতেছি, বিশ্বভারতী কার্য্যালয় আমার প্রতি অনাস্থা দেখাইয়াছেন ও অবিচার করিয়াছেন, এই বিশ্বাসবশতঃ।

এখন অবস্থা এই দাঁড়াইতেছে, যে, আপনি যদি অতঃপর আমাকে বিনা দক্ষিণায় কিছু লেখা দেন, কিম্বা কিছু দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বভারতী কার্য্যালয়ের এবং আমাব এই সন্দেহ স্বভাবেই হইবে, যে, আমি বিশ্ব-ভারতীর আর্থিক ক্ষতির কারণ।

অতএব আপনার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই, যে, আপনি অতঃপর আমাকে বাংলা বা ইংরেজী কোন লেখা দিবেন না। আমি জানি, আপনার লেখা না পাইলে আমার কাগজ দুটির গৌরব হ্রাস পাইবে। কিন্তু অতঃপর আপনার লেখা গ্রহণ করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না। আমার হৃদয়মনে দুঃখের কারণের অভাব নাই। তাহার উপর, বিশ্বভারতীর ক্ষতি করিতেছি, কিম্বা উহার যে সামান্য সেবা আমি করি তাহা স্বার্থপ্রযুক্ত করি, এরূপ কোন সন্দেহের আঘাত আমার পক্ষে দুঃসহ হইবে।

আমি যদি কোন ভুল করিয়া থাকি, কিম্বা আমার কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা সংশোধনের সুযোগ দিলে অনুগৃহীত হইব। ইহা পুনর্বার লেখা পাইবার কৌশল নহে,

বিশ্বাস করিবেন। উহার লোভ, আশা ও গৌরব ত্যাগ করিলাম। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ: আমি চন্দ্রকান্ত দেব ও যতীন্দ্রনাথ সুরের আত্মীয়দিগকে যে বহি ছাপিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং অপ্রকাশিতপূর্ব হইবে এইরূপ আমার সংকল্প ছিল। সুতরাং নটীর পুরস্কার আমি ছাপিতে পাইলে প্রবাসীতে ছাপিতাম না, একেবারে বহির আকারে নন্দলালবাবুর কতকগুলি রঙীন ছবিতে অলংকৃত করিয়া বাহির করিতাম। ছাপার খরচ, কাগজ ও ছবির ব্লকের দাম, দপ্তরীর পাওনা, সব আমি দিতাম। কিন্তু বহিটি আগেই প্রকাশিত হইয়া যাইবে বলিয়া উহা বহির আকারে বাহির করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলাম।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৭

৩০ জুন ১৯২৭

১৫ আষাঢ় ১৩৩৪

ভক্তিভাজনেষু,

আপনি কাল যে আমাকে মৌখিক বলিয়াছিলেন, চিঠিতে কথাগুলা শক্ত হইয়া যায়, এবং সব কথা বলাও হয় না, তাহা ঠিক্। কিন্তু আমার এটা একটা দুর্বলতা বা অক্ষমতা, যে,

আমি যথাসময়ে মৌখিক সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারি না—সব কথা মনে পড়ে না। এইজন্য আপনার অবগতির জন্য এই চিঠিতে কয়েকটা কথা লিখিতেছি।

অনেক দিন আগে আমি আপনাকে একটা উপন্যাস লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন আপনার ইচ্ছা হয় নাই। তাহার পর শান্তাও বলিয়াছিল। তখনও আপনার মানসিক অবস্থা অনুকূল ছিল না। তাহার পর নানা কারণে এবং আপনার ইচ্ছা হওয়ায় আপনি "বিচিত্রার' জন্য উপন্যাস লিখিতেছেন।

ফণীবাবুর কন্যা রাণুকে আপনি যে-সব চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রবাসীতে ছাপিবার জন্য কালিদাস আপনার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার আপত্তি না থাকায় সেগুলি কালিদাসের নিকট ছিল। কিন্তু রাণু সেগুলি কাগজে না ছাপাইয়া একেবারে পুস্তকের আকারে বাহির করিতে চায়, এই কারণে সেগুলি আপনি কালিদাসের নিকট হইতে ফেরত লইয়াছিলেন। এখন বোধ হয়, সেই চিঠিগুলিই "বিচিত্রার" শ্রাবণ সংখ্যা হইতে উহাতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহার আষাঢ় সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। হয়ত রাণুর মত পরিবর্তন ইহার কারণ।

এই প্রকারে নানা কারণে আপনার বৃহৎ ও ভাল লেখাগুলি "প্রবাসীতে" না গিয়া অন্যত্র ছাপা হইবে। অবশ্য "প্রবাসীর" কোন একটা দাবী আছে, তা নয়। কিন্তু "প্রবাসীর" সহিতই, লেখক হিসাবে, আপনার সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী।

এবং সম্প্রতি হঠাৎ "প্রবাসীর" কোন সাহিত্যিক, নৈতিক বা অন্যবিধ অপকর্ম ঘটে নাই। এই জন্য অতঃপর "প্রবাসী" অন্য কাগজের পাত্রাবশিষ্টের মত কিছু কিছু পাইলে তাহাতে তাহার উপকাব না হইয়া অপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাও গোপন করিবার চেষ্টা করা বৃথা, যে, আমি অহঙ্কারশূন্য নহি। ব্যক্তিগতভাবে আমি উহা ত্যাগ করিতে চেষ্টা যে না করি, তাহা নহে। কিন্তু "প্রবাসী" ও আমি ঠিক্ এক নই। আমার জামাতা কন্যা পুত্রবধূ পুত্রদেরও ইহার সহিত যোগ এবং সম্ভবতঃ কিছু কিছু অহঙ্কার আছে। সুতরাং লোকের চোখে খাট হইলে তাহাতে শুধু যে উহার ক্ষতি হইবে, তাহা নহে, আমার পরিবারস্থ সকলে ব্যথিত হইবে।

আপনার কাছে বৃহৎ ও ভাল লেখা পাইবার উদ্দেশ্যে এসব কথা লিখিতেছি না। কারণ, আমি জানি, আপনি নিজে হইতেই স্বভাবতঃ "প্রবাসীর" সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। "প্রবাসীকে" বড় ও ভাল লেখাগুলি দিলে তাহাতে আপনার ও বিশ্বভারতীর আথিক ক্ষতি হইবে। কারণ যাঁহারা প্রবাসীকে Crush করিয়া নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চান, তাঁহারা ধনী লোক; তাঁহারা যত টাকা দিবেন, আমার তত দিবার সাধ্য না থাকিতে পারে। অথচ আমি, প্রবাসীর প্রতি আপনার প্রীতিবশতঃ বিনামূল্যে বা সস্তায় আপনার লেখা লইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। এইজন্য আপনি আমাকে কোন লেখা না দেন, ইহাই আমি চাই।

বিশ্বভারতীর একটি Publishing board আছে (যদিও উহা নামে মাত্র, কাজ প্রায় autocraticallyই হইয়া থাকে)। ঐ board যদি আপনার সব লেখার দক্ষিণা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, এবং তাহার পর আপনি যাহাকে যেটি ইচ্ছা দিতেন, তাহা হইলে আমার কোন লেখা লইতে অসুবিধা বা আপত্তি হইত না। কিন্তু এরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা আপনার উচিত, ইহা আমি বলিতে পারি না।

আপনি প্রবাসীকে crush করিবার ষড়যন্ত্রে কাহারও সহিত যোগ দিবেন, ইহা অসম্ভব—কাল আপনাকে তাহা মৌখিক বলিয়াছি। আজ সেই কথাই চিঠিতে আবার লিখিতেছি। অতএব আপনাব উদ্দেশ্য ও মনের ভাব সম্বন্ধে আমার কোন ভ্রান্তি হইবে না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ ত আপনার বা আমাব মনের ভাব জানে না। তাহারা, বাহিরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা হইতেই এক একটা অনুমান ও সিদ্ধান্ত করিবে ও করিতেছে। তাহারা দেখিতেছে, একটি নূতন সচিত্র মাসিক কাগজ বাহির হইয়াছে। উহা অন্য সব পুরাতন সচিত্র মাসিকের ন্যায় প্রবাসীরও rival। অধিকন্তু মৌখিক ইহা রটিত হইয়াছে, যে, উহা প্রবাসীকে crush করিবে। এইরূপ কাগজে আপনার লেখা অধিক পরিমাণে বাহির হইলে তাহা হইতে যাহা অনুমান হয়, লোকে তাহাই করিবে।

আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, এইসব কথা প্রবাসীর জন্য লেখা আদায় করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি না।

এ বিষয়ে আমি sensitive। এই কারণে আমি কতকটা উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমি বরাবর আপনার ও বিশ্ব-ভারতীর অনুকূল অনেক কথা লিখিয়া থাকি। সমালোচনাও (তদপেক্ষা কম) কখন কখন করিয়াছি। এখন অনুকূল কিছু লিখিলে তাহার ব্যাখ্যা এই হইবে, যে, আমি আপনার অনুগ্রহ পুনর্লাভের চেষ্টা করিতেছি এবং তাহারই ফলে এখনও "খুদকুঁড়া" কিছু কিছু পাইতেছি। সমালোচনা করিলে বা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে তাহার ব্যাখ্যা এই হইবে, যে, আমি আর অনুগ্রহ না পাওয়ায় সুর বদ্‌লাইয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাও এখন সঙ্কোচের বিষয় হইয়াছে। তাহা যে অনুগ্রহলাভচেষ্টা নহে, তাহার ত আমি রাস্তায় placard দিতে পারি না। সেদিন আপনার বাড়ীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর আপনি যে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে আমাকে একটি লেখা দিতে বলিয়াছিলেন, ও তিনি দিয়াছিলেন, তাহা আমি হাসিমুখে লইলেও আমার ধিক্কার বোধ হইয়াছিল—এই ভাবিয়া, যে, আমি কি লেখা আদায় করিতে গিয়াছিলাম? কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, আপনি আমাকে ব্যথা দিবার জন্য তাহা করেন নাই, এবং আমি ব্যথিত হইব ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিলে করিতেন না।

আর অধিক লিখিব না। সকল দিক্ দিয়া আমার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, স্থির করা কঠিন। যথাসাধ্য বিবেচনা করিয়া কাজ করিব।

টম্‌সনের বহি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধটি চাহিয়াছি। তাহা ছাপিব। যে প্রবন্ধটি অমিয়বাবু সেদিন দিয়াছেন, তাহাও ছাপিব। আপনার অন্য কোন লেখা সম্বন্ধে আমার প্রার্থনা নাই। বোধ হয় আমাকে অন্য কোন লেখা না দেওয়াই ভাল।

একটি কথা আপনাকে বলিয়া রাখি। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটি দীর্ঘলেখা পাইয়াছি। তাহাতে প্রধানতঃ, উহার জন্য প্রদত্ত টাকা ব্যয় ও গচ্ছিত রাখা সম্বন্ধে সমালোচনা আছে। আমি মনে করিতেছি, প্রথমতঃ কর্মসচিবের নিকট হইতে information চাহিব। তাহার পর কি করিব, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। ইহাও আমার একটি বিপদ্; যাহাই করি না কেন, তাহার কুব্যাখ্যা হইবে। কিছু না করিলেও কুব্যাখ্যা হইবে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ : প্রবাসীর ভাদ্রসংখ্যা হইতে আমি আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। সুতরাং টম্‌সনের বহি সম্বন্ধে লেখাটি ছাড়া অনুগ্রহ করিয়া আর কিছু পাঠাইবেন না। অমিয়বাবুকে বলিবেন তিনিও যেন আপনার আর কোন চিঠি না পাঠান। প্রবাসী crushed হয় কি না, তাহার experiment টা সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে হইয়া যাওয়াই ভাল।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ। (২) মডার্ন রিভিউয়ের জন্যও অনুগ্রহ করিয়া অতঃপর আমাকে কোন লেখা দিবেন না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৮

১ জুলাই ১৯২৭

১৬ই আষাঢ় ১৩৩৪

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পড়িয়া আমি সাতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইলাম। 'প্রবাসী' বিষয়ক চিঠিতে বিশ্বভারতীর কথা লেখা আমার খুব অবিবেচনা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া আরও মর্মাহত হইলাম।

বিশ্বভারতীর কথা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা স্বতন্ত্র পত্রে, ভিন্ন সময়ে, আমার লেখা উচিত ছিল। তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনার বুঝিবার ভুল বা সন্দেহ হইত না। আমি আপনার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি। তাহা হইলেও এখনও আমার এই ধারণা আছে, যে, আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন না। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি, যে, বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কোন প্রকার বিভীষিকা দেখাইবার জন্য একেবারেই নহে। আমি আপনাকে অনেক বৎসর

হইতে জানি। মানবচরিত্রজ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান আমার একেবারেই নাই, মনে করি না। সুতরাং আপনাকে ভয় দেখাইবার শাসাইবার কল্পনাও আমার মনে আসিতে পারে, এত বড় আহাম্মক ও অমানুষ আমি নহি। আপনাকে নির্ভীক বলিয়া জানি, কাগজেও লিখিয়াছি। বিশ্বভারতীর বিষয় লিখিবার প্রকৃত কারণ লিখিতেছি। আপনি বিদেশে চলিয়া যাইতেছেন। আপনার অনুপস্থিতির সময়ে যদি আমাকে বিশ্বভারতীর সংশ্রব ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে কারণ সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ হইবে বলিয়া এখন একটুকু আভাস দিয়া রাখা দরকার মনে করিয়াছিলাম। আমি আমার কাগজ দুটাতে ছাপাইবার জন্য যাহা পাই, তাহা আমাকে বাধ্য হইয়াই ছাপিতে হয়। কিন্তু যে লেখাটি পাইয়াছি, তাহার লেখক, উহা আমাকে পাঠাইবার উদ্দেশ্য কি, লেখেন নাই। সুতরাং আমি মনে করিয়াছি, যে উহা না ছাপিবার বা ছাপিবার উভয় অধিকার আমার আছে। সেই কারণে আমি information চাহিব; এবং বিশ্বভারতীর সভ্য রূপে যাহা কর্তব্য, তাহা করিব। যদি সংস্কারের প্রয়োজন আছে মনে করি, চেষ্টা করিব, কিন্তু যদি দেখি, যে, তাহা করাইবার আমার ক্ষমতা নাই, তাহা হইলে হয়ত পদত্যাগ করিব। ইহা লইয়া কাগজে একটা কোন আন্দোলন করিবার সংকল্প আমি করি নাই, এবং করিবও না। কারণ বলিতে চাই না। কিন্তু কোন বিভীষিকা কারণ নহে।

এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য বলিলাম। ইহা আপনি

বিশ্বাসযোগ্য মনে করিলে আমি শান্তি পাইব, নতুবা আমি যে অবিবেচনার কাজ করিয়াছি, তাহার ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে।

বিশ্বভারতী সম্বন্ধীয় লেখাটি অধ্যাপক টুচির নহে, ইহাও জানাইতেছি। টুচি আমাকে কখন কিছু বলেন নাই, লেখেন নাই। অন্য অনেকের কাছে মৌখিক অনেক কথা শুনিয়াছি, লিখিত সমালোচনা কেবল এই সেদিন একটি পাইয়াছি। বাস্তবিক দোষ বিশ্বভারতীর পরিচালনায় কি ঘটিয়াছে ঠিক্ জানি না। কিন্তু অনুসন্ধান কর্ত্তব্য, ইহা বুঝিয়াছি। আরও জানাইতেছি যে, ইহার সহিত "বিচিত্রা" ও "প্রবাসী" ঘটিত ব্যাপারের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই।

আমার জামাতাকন্যা প্রভৃতির সহিত প্রবাসীর সম্পর্কের যে কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে লিখিয়াছি। তাহাব জন্য তাহাদিগকে দোষী করিবেন না।

খুচু এখন বাড়ী নাই ; সুতরাং সে কিছু বলিয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। যদি সে কোন অন্যায় কথা বলিয়াও থাকে, তাহা হইলেও তাহার সহিত আমার চিঠির কোন সম্পর্ক নাই, জানিবেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পরিবারস্থ কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়া আমি চিঠি লিখি নাই।

"পাত্রাবশিষ্ট" কথাটি ব্যবহার করার অপরাধের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু উহা কেন ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি। আপনি আমাকে আগে

যে-যে লেখা দিয়াছেন, এবং এখনও যেগুলি আমার হাতে মজুত আছে, তাহার প্রত্যেকটি আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। "বৃক্ষবন্দনা" ও "বর্ষশেষ" আমার ত খুবই ভাল লাগিয়াছে, আমার কোন সমঝদার মফঃসলস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐগুলিকে আপনার আগেকার সব লেখার চেয়ে ভাল বলিয়া লিখিয়াছিলেন। এইরকম আরও appreciation এর বিষয় আপনাকে জানান আবশ্যক মনে করি নাই। "ধর্মবোধ" লেখাটিও আমি খুব সারবান্ মনে করি, এবং ইহাতে যে বর্তমান সময়ের সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের একটি সমস্যার আলোচনা আছে, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। সুতরাং আমি আপনার কোন একটি লেখারও প্রতি অনাদর জানাইবার জন্য কিম্বা তৎসম্বন্ধে আমার মনে তাচ্ছিল্যের ভাব থাকার জন্য "পাত্রাবশিষ্ট" কথাটা ব্যবহার করি নাই। আমি ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম, যে, আগে অন্যেরা আপনার লেখা বাছিয়া লইবে, এবং যাহা বাকী থাকিবে, আমি তাহা পাইব। আপনিও আমাকে এখানে মৌখিক বলিয়াছিলেন, যে, "বিচিত্রার" লোকেরা যে রকম করিয়া আপনার সব কবিতাগুলি দখল করিয়া লয়েন বা লইতে চান, তাহা আপনার ভাল লাগে না। কার্যতও দেখিতেছি, যে, তাঁহারা পর্য্যাপ্তেরও অধিক লেখা পাইয়াছেন। আমি ইহা অভিযোগের ভাবে বলিতেছি না। আমার যাহা ধারণা, তাহা কেন জন্মিয়াছে, তাহাই বলিতেছি। কিন্তু আবার

বলিতেছি যে, আমি যে কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা করা উচিত হয় নাই. অন্য কোন কথা ব্যবহার করা উচিত ছিল। সেই নিমিত্ত, ঐ কথাটা ব্যবহার করার জন্য পুনর্বার ক্ষমা চাহিতেছি।

"সবুজপত্রে" আপনি বড় বড় লেখা যখন দিয়াছিলেন, তখন আমি কেন কিছু বলি নাই বা করি নাই, তাহার সব কারণ এতদিন পরে বলিতে পারিব না: কারণ সব কথা মনে নাই, বিস্মৃতিবশতঃ হয়ত অজ্ঞাতসারে অপ্রকৃত কথা বলিয়া বসিব। কিন্তু ইহা বলিতে পারি, যে, তখন কিছু না বলা এবং এখন কিছু বলার সঙ্গে "লেখা কেনাবেচার" কোন সম্পর্ক নাই। আপনি "বিচিত্রা"কে লেখা দেওয়ার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতেছেন: আমি তাহা দেখিতে পারিতেছি না। অনেক দিন হইতে প্রবাসীকে আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বিশ্বভারতী "ভারতী"কে নিজের organ করিয়া আপনাকে সম্পাদক করিয়া চালাইবেন, এইরূপ একটি প্রস্তাব হইয়াছিল, Mr. Andrews আমাকে বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আপনার অসম্মতিতে তাহা ফাঁসিয়া যায়। ইহা ১টি ধাপ। "নটীর পূজা" সেই ষড়যন্ত্রের ফলে আমি পাই নাই; কেহ নগদ টাকা আনিয়া ধন্না দিয়া বসিয়াছিল বলিয়া নহে। ইহা আর একটি ধাপ। তৃতীয় প্রমাণ, ইউরোপ হইতে কোন কর্মী লিখিয়াছিলেন, যে, প্রবাসীকে আপনার লেখার monopoly হইতে বঞ্চিত করা তাঁহার একটি achievement; যদিও monopoly কোন

কালে ছিল না, আমি তাহা চাই নাই, এবং চাহিলেও আপনি সেরূপ হাস্যকর আবদার পূর্ণ করিতেন না। আর এক প্রমাণ, আপনি ভিয়েনা হইতে যে চিঠি আমাকে এখানে পাঠান, তাহার নকল এখানে অন্ততঃ দুই ব্যক্তির নিকট আসিয়াছিল। "বিচিত্রার" সহিত ইহাদের কাহারও কাহারও যোগ আছে। "বিচিত্রার" capitalist সরল অন্তঃকরণে টাকা দিয়া থাকিবেন ; ইহা বিশ্বাস করিতে কোন বাধা দেখি না। কিন্তু প্ররোচক ও উদ্যোক্তাদের কাহাকেও কাহাকেও আমি আপনার চেয়ে ভাল করিয়া চিনি। তাঁহাদের দ্বারা প্রবাসীকে crush করার কথা রটিয়াছে। আপনার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ আমি কেন করিব ? "প্রবাসীর" সাহিত্যিক সম্বন্ধ ছেদন গভীর দুঃখের সহিত করিতেছি ; স্পর্দ্ধার সহিত করিতেছি না। ক্ষুদ্রচেতা লোকদের বাক্যবাণ সহ্য করা আমার এখন ক্ষমতার অতীত হইয়াছে বলিয়া আমি এই উপায় অবলম্বন করিলাম। ইহা আমার সমূহ ক্ষতির এমন কি সর্বনাশেরও কারণ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াও করিলাম। সূর্য্যের কিরণ সহ্য হয়, বালুকার উত্তাপ সহ্য হয় না।

আমি অনেকের কাছে বলিয়াছি, যে, "বিচিত্রার" দ্বারা এই একটি উপকার অন্ততঃ হইবে, যে, রবিবাবু আবার আর একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস জগৎকে দিবেন। আমি আশা করি, আমার ব্যবহার আপনার মনের স্থৈর্য্য ২/১ ঘণ্টা অপেক্ষা বেশী সময়ের জন্য নষ্ট করে নাই, এবং আপনি বরাবর আরও ভাল ভাল জিনিষ জগৎকে দিতে থাকিবেন। আমি ব্যবসাদার

ও স্বার্থপর হইলেও সম্পূর্ণ সংকীর্ণমনা নহি। আমার ব্যবসার যদি ক্ষতি হয় (তাহা নিশ্চিত নহে, যদিও সম্ভবপর), তাহা হইলেও অন্যকৃত উপকার বুঝিবার ও স্বীকার করিবার ক্ষমতা আমার আছে।

আপনি আমার আগেকার চিঠির কোন কোন কথা যদি কাহাকেও বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই চিঠিখানার সেই সেই বিষয়ক কথা তাঁহাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করিলে বলিবেন, এই অভিলাষ জানাইয়া এবং এতবড় চিঠি দ্বারা আপনার সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষমা চাহিয়া পত্র শেষ করিলাম।*

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১ জুলাই ১৯২৭

১৬ই আষাঢ় ১৩৩৮

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার চিঠির জবাবে যে চিঠি লিখিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে লিখিয়াছি, খুড়ু বাড়া নাই বলিয়া তাহাকে আপনার উল্লিখিত তাহার বিশ্বভারতীবিষয়ক মন্তব্য সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বিকালে সে আফিস হইতে বাড়ী আসার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যাহা বলিল, তাহার তাৎপর্য্য দিতেছি :—

---

* এই পত্রের উপরে লাল কালির বেষ্টনীতে লিখিত রয়েছে : অমিয়বাবুর মারফৎ প্রাপ্ত চিঠির উত্তর। এই চিঠি প্রথমে পাই।

বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে কোন document তাহার নিকট নাই, এরূপ document সংগ্রহ করিয়া বেড়ান তাহার কাজ নয়। তার হাতে এমন document আছে যাতে আপনাদের সকলকেই বিশ্বভারতী সুদ্ধ "dustbin" এ সে বসাইতে পারে, এরূপ idiotic কথা সে বলিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িতেছে না। এরূপ মন্তব্য সে করিয়াছে কিনা, তাহার আলোচনা তাহার সঙ্গেই হওয়া উচিত।

আমারও মনে হয় মুকাবিলা আবশ্যক হইলে অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়েরই উপস্থিতি প্রয়োজন।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১০

১ জুলাই ১৯২৭

১৭ই আষাঢ় ১৩৩৪

ভক্তিভাজনেষু,

আপনি কাল অমিয়বাবুর মারফৎ যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আগে পাইয়া তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য কালই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। ডাকের চিঠিটি আজ সকালে পাইলাম।

এই ব্যাপারটি লইয়া আমি অত্যন্ত অশান্তিতে কাল কাটাইতেছি। এই অশান্তি শেষ করিবার জন্য আমি আপনার সহিত সম্বন্ধটিকে সাহিত্যিক সম্পর্ক শূন্য করা শ্রেয়ঃ

মনে করিয়াছি—যদিও প্রথম প্রথম আমার সাহিত্যিক ব্যবসাই আমাকে আপনার সাহচর্য্যের সৌভাগ্য প্রদান করে। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিব, আমি ব্যবসার খাতিরেই আপনার অনুরাগী ও ভক্ত সহচর ছিলাম কিনা। আমার ব্যবহার দ্বারা আপনিও প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিবেন—যদিও আমার ধারণা আপনি মনে করেন না, যে আমি সাংসারিক সুবিধার জন্য আপনার সহিত যোগ রাখিয়া থাকি।

আপনাকে আমি মৌখিক বলিয়াছি, এবং চিঠিতেও আবার লিখিতেছি, যে, প্রবাসীর সহিত অন্য কাগজের প্রতিযোগিতায় আপনি যোগ দিয়াছেন, এইরূপ সন্দেহ বা বিশ্বাস বা কল্পনা, জাগ্রত অবস্থায় দূরে থাক্, স্বপ্নেও আমার মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। এরূপ কোন জনশ্রুতিও আমার কাণে পৌছায় নাই। আপনি প্রবাসীকে অনেক ভাল লেখা দিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন ও দিতেন, ইহা আমি জানি ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

আপনি আমাকে বন্ধু মনে করেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য ও গৌরব। যে-যে কারণে তাহা মনে করেন, তাহার কোনটিরই অভাব আমার জীবিত কালে আমার পক্ষ হইতে ঘটিবে না, আমার এইরূপ বিশ্বাস। সুতরাং "বন্ধুত্ব সম্পর্ক নিয়ে চিরদিন আমার যে রকম দুর্ঘটনা ঘটেচে এবারেও তাই ঘটল, অর্থাৎ কোনো অপরাধ না করেও আমাকে দুঃখ পেতে হবে", এখন এইরূপ আপনার মনে হইলেও কিছুদিন পরে আপনি বুঝিতে পারিবেন, যে, আমার পক্ষ হইতে

আন্তরিকভাবের এবং তাহার পরিচায়ক বাহ্য ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে, যে, সাহিত্যিক সম্পর্ক ছেদন করিলাম, তাহার দু-একটা কারণ আগেই লিখিয়াছি।

আমি আপনার নিকট এত প্রকারে ঋণী যে, সে-সব ঋণ কোন কালেই শোধ হইবে না। শোধ হউক, এ ইচ্ছাও আমার নাই; ঋণীই আমি থাকিতে চাই। আপনি আমার পরলোক ও ইহলোকের সন্তানদিগকে স্নেহ করিয়াছেন ও করেন, এই ঋণটি আমার হৃদয়ের গোপন সম্পত্তি, আমি বিশ্বাস করি, খুড়র বিরুদ্ধে আপনি অনেক কথা শুনিয়া থাকিলেও, এবং যদি তাহার সত্য অপরাধ থাকে তাহা সত্ত্বেও আপনি তাহাকেও স্নেহ করিবেন।

"কোনো অপরাধ না করেও" আপনাকে "দুঃখ পেতে" হয়, ইহা সত্য কথা। কিন্তু আপনার যাঁহারা বন্ধু তাহাতে তাঁহাদের দোষ আছে কিনা, জানি না। আপনি আমাকে বন্ধু মনে করেন, এই সম্মান ও আনন্দ আমি পাইয়াছি বলিয়া আমার কথাই কেবল বলিতে পারি। আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, কবিঋষিরূপে আপনি অসাধারণ মানবচরিত্রজ্ঞ হইলেও লৌকিক ব্যবহারে আপনি কোন কোন মানুষকে চিনিতে পারেন না, এবং তাহাদের মৎলব বুঝিতে পারেন না; কোন কোন স্থলে সকল পক্ষের কথা শুনিয়া জানিয়া একটা মত বা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন না, মনে মনে একতরফা ডিক্রী দেন। এইরূপ সব কারণে এমন অবস্থা দাঁড়ায়, যে, আপনাকে কষ্ট পাইতে হয়।

আপনাকে কষ্ট দিবার জন্য ইহা লিখিলাম না; আপনি নিরপরাধ হইয়াও কেন কখন কখন দুঃখ পান, তাহার একটা কারণ আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা লিখিলাম।

আপনার সম্বন্ধে কোনো "মিথ্যা জনশ্রুতি" আমার কানে পৌঁছায় নাই, পৌঁছাইবার দুর্মতি ও দুঃসাহস এ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই।

Forward এ অমলের Greater India Society সম্বন্ধীয় চিঠির সহিত আপনার কোন প্রকার যোগ আমি সন্দেহ বা কল্পনা করি নাই: যতদূর জানি কালিদাসও করেন নাই।

আমি Greater India Societyর সভ্য এখনও হই নাই। উহা আমার বিদেশে থাকা কালে গত বৎসর আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে স্থাপিত হয়। উহার অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ছাপি ও বিজ্ঞাপন ছাপি, আমার সহিত এ পর্য্যন্ত উহার এই সম্পর্ক আছে। অবশ্য, উহার সভ্য না হওয়ার বা উহাকে উৎসাহ না দিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। উহার সম্বন্ধে আপনি অন্য যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমি কালিদাসকে পড়িতে দিব; তাহার কিছু বলিবার থাকিলে সে বলিবে। আশা করি ইহা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধ নহে।

আপনার মত ধীর প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিটিমিটির দ্বারা বিচলিত না হইতে বলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। কিন্তু আমি ইহাই জানাইবার জন্য এ বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, যে, আপনি জানিবেন আমি খুব দুঃখ পাইলেও আপনার প্রতি

আমার মনের ভাব এবং আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা অপরিবর্ত্তিত আছে ও থাকিবে।

বিশ্বভারতীর কথা আপনাকে কেন লিখিয়াছিলাম এবং টুচি যে আমাকে কোন কথা বলেন নাই লেখেন নাই, তাহা আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি।

আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বেও কখন কখন আপনি বেদনা বা লজ্জা পাইবেন এরূপ কিছু ভাবিয়া সমালোচনা হইতে নিবৃত্ত হই নাই, সমালোচনা করিয়াছি। বিশ্বভারতী সম্বন্ধীয় যে লেখা পাইয়াছি, তাহাতে আপনার উপর কোন দোষারোপ নাই; কারণ বিশ্বভারতীর এখন constitution হইয়াছে। সুতরাং এখন যে আপনার দুঃখ বা লজ্জা পাওয়ার চিন্তা আমাকে নিরস্ত করিবে তাহা নহে—যদিও আমি স্বীকার করি যে এই চিন্তা আমার মনে আসা স্বাভাবিক। কাগজে কোন বিষয়ে লিখিবার আগে, অন্য প্রতিকার আছে কিনা; লিখিলে ফল হইবে কিনা; সুফল হইবে, না কুফল হইবে; কুফল বেশী হইবে, না সুফল বেশী হইবে; এইরূপ নানা দিক দিয়া বিষয়টির বিবেচনা আবশ্যক। সংকোচের এই রকম কারণ অনেক সময়ে থাকে। বক্ষ্যমাণ ব্যাপারে অবশ্য আমি এখনও এরূপ বিস্তারিত চিন্তা করি নাই।*

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

---

* এই পত্রের উপর লাল কালির বেষ্টনীতে লিখিত রয়েছে: ডাকে প্রাপ্ত চিঠির উত্তর।

২২।২৫

১১

জুলাই ১৯২৭

১৮ই আষাঢ় ১৩৩৪

৩রা জুলাই, ১৯২৭।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার আজকার চিঠি পড়িয়া ব্যথিত হইয়াছি। আমি জানি, আমার জন্যে আপনি আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের কাছ থেকে অনেক বার অনেক আঘাত পাইয়াছেন। তা ছাড়া আমি নিজেও, ইচ্ছা করিয়া নহে, আপনাকে দুঃখ দিয়াছি। তাহার জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। কি করিলে ভবিষ্যতে আপনি আমার জন্য ও আমার দ্বারা আঘাত না পান, তাহা আমি এখনও ঠিক্ করিতে পারি নাই; চিন্তা করিতেছি। আপনি আপনার যে বন্ধুদের নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও সমশ্রেণীস্থ লোক আমি নই। তথাপি, আপনি যখন বন্ধুশ্রেণীতে আমাকে স্থান দিয়াছেন, সেই জন্য আপনাকে জানাইতেছি, আমার আপনার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ পূর্ব্ববৎ আছে—বরং বাড়িয়াছে।

"প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর দরোয়াজা বন্ধ", ইহা আমার কাণে ও হৃদয়ে বড় কঠোর ও নির্ষ্ঠুর শুনাইতেছে। আমি আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছি। তাহা আপনি যে ভাবেই গ্রহণ করুন, তাহা বারণ করিবার অধিকার ও ক্ষমতা আমার নাই। যাক্, আমি লিখিতে জানি না; মনের কথা বলিতে পারিব না, ভাষার অভাবে।

ভগবানের নিকট আলো চাহিতেছি। আপনার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ চাহিতেছি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ আপনি, "সস্তার তিন অবস্থা", লিখিয়াছেন। আপনি ত চিরকালই প্রীতিবশতই লেখা দিয়াছেন। বিনামূল্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা সস্তা ত কিছু নাই। কিন্তু আমি সব সময়ই আপনার লেখা পাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। টাকা যখন সামান্য কিছু দিয়াছি, তাহার জন্য আপনি লিখিয়াছেন, ইহা কখনও মনে করি নাই। আমি বড় অশান্তিতে আছি। এই জন্য অসম্বদ্ধ কথা লিখিলাম।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১২

১৪ নভেম্বর ১৯২৯

২-১, টাউনশেণ্ড রোড্,
ভবানীপুর, কলিকাতা।
১৪।১১।১৯২৯ রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

অমিয়বাবু শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবীর অনুবাদিত যে দুটি কবিতা পাঠাইয়াছেন তাহা পাইয়া অনুগৃহীত ও আহ্লাদিত হইলাম। ডিসেম্বরের কাগজে উহা ছাপা হইবে।

আপনাকে তুটি অনুরোধ জানাইয়া রাখিতেছি। যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও অবসর পান তাহা হইলে কিছু করিবেন—আপনাকে বিন্দুমাত্রও পীড়ন করা আমার অনভিপ্রেত এবং অনভ্যস্ত তাহা আপনি জানেন।

ভাদ্রের প্রবাসীতে আপনি "ধ্যানী জাপান" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষে আছে—"ধ্যানের শক্তি আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখতে বসিনি. কোরিয়া দেশের একজন যুবকের সঙ্গে একদিন আমার কি কথা হয়েছিল সেইটি জানাবার জন্যে কলম ধরেছিলুম। সে কথা পরে হবে।"

এই কথা জানিতে আমার ও অন্য পাঠকদের কৌতূহল আছে। যদি সহজে পারেন, অনুগ্রহ করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

আমার কাগজ তুখানার সম্পাদকীয় কতক ভার বুবার উপর পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে আরও বেশী করিয়া পড়িবে। সে প্রতি বৎসর মডার্ণ রিভিয়ুর চারিটা বিশেষ সংখ্যা বাহির করিতে চায়। আগামী জানুয়ারী সংখ্যাতে সে Art, Archaeology ও History সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিশেষ প্রবন্ধ দিতে চায়। আপনি যদি পারেন ত Art বা History সম্বন্ধে যে-কোন রকমের একটি প্রবন্ধ দিলে অনুগৃহীত হইব।

কারবারে বড় জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। যাই যাই করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারি নাই। তাহার পর কয়েকটি লোকহিতকর কাজ উপলক্ষ্যে কাশী

যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া জানিলাম আপনি শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন। সুতরাং আপনার দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইল। আশা করি, শীতের আরম্ভে আপনার স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৩

১৭ই নভেম্বর ১৯২৯

2-1, Townshend Road,
Bhawanipur, Calcutta.
Nov 17, 1929.

ভক্তিভাজনেষু

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আপনার যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা লিখিয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন জানিয়া প্রীত হইলাম। "Political Philosophy of Rabindranath" নামক পুস্তক সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধটি ছাপা হইয়াছে। এই চিঠির আগেই হয় ত তাহা অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে দেখিতে পাইবেন। আমি উহার প্রুফ আপনাকে পাঠাইতে বলিয়া কাশী গিয়াছিলাম। আপনি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়ায় প্রুফ আপনাকে পাঠান হয় নাই।

বড়োদার বক্তৃতা লেখা হইয়া গেলে আপনি যদি পারেন তাহা হইলে ইংরেজী প্রবন্ধ একটি লিখিয়া দিবেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত আপনার পোলিটিক্যাল মতসম্বন্ধীয় লেখাটির

তর্জমা অবশ্যই আমার ইংরেজী কাগজে চলিতে পারে। কিন্তু বুবার বরাত, special number এর জন্য আপনার Art বা History সম্বন্ধে একটি লেখা। নূতন লেখা সম্ভব না হইলে কোন অপ্রকাশিত বক্তৃতাদি পরিবর্ত্তন দ্বারা সময়োপযোগী করিয়া দিলেও চলিতে পারে। কিন্তু আপনার উপর কোন প্রকার চাপ দেওয়া মোটেই আমার অভিপ্রেত নহে। আপনাকে সব কথা জানাইয়া রাখিলাম। বেশ স্বচ্ছন্দ মনে অবসর সময়ে কিছু করিতে পারিলে করিবেন।

বাংলাদেশে আপনার অশান্তির কারণ আমি কখন ক্বচিৎ প্রত্যক্ষ জানিতে পারি, এবং অধিকাংশ সময় লোকমুখে শুনি। যাহারা এই কারণ ঘটায়, সর্বাপেক্ষা অপরাধী তাহারাই; কিন্তু যাঁহারা এ সব জিনিষ আপনার চক্ষুগোচর বা কর্ণগোচর করেন, তাঁহাদেরও দোষ আছে। কারণ, তাহা করিয় আপনার বা অন্য কাহারও উপকার তাঁহারা করেন না, এবং তাহার দ্বারা কোন প্রতিকারও হয় না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৪

১৯ নভেম্বর ১৯২৯

ভবানীপুর

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

ভক্তিভাজনেষু

আমি আপনাকে কাজ উপলক্ষ্যে চিঠি লিখিলেও আপনি কাজ সম্বন্ধীয় কথার জবাব দিয়া অতিরিক্ত যাহা লেখেন তাহাতে উপকৃত হই এবং আনন্দ পাই। আপনি যে লিখিয়াছেন, "নিজের ভিতরকার যে বড়ো দান সেটা বড়ো শান্তি ও অবকাশ ছাড়া যথোচিত ভাবে উদ্‌ভাবিত হতে চায় না। সেই শান্তি ও নিরাবিল অবকাশকে আপনার অন্তরের জিনিষ করে তোলবার জন্যে একান্তমনে চেষ্টা কবি। যদি সফল হতে পারি তবে নিজের জীবনটাই নৈবেদ্যরূপে রচিত হতে পারবে—অন্য কোন রচনা নাই বা হোলো"। আপনার ভিক্ষা সার্থক না হইলেও লিখিয়াছেন— "এই ভিক্ষাটা সাধনারই একটা অঙ্গ—বোধ করি নিরর্থক হলেও তার একটা সার্থকতা আছে"।

এই সকল কথা পড়িয়া আমার আন্তরিক দৈন্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইয়াছে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ নবেম্বর মাসের "প্রবুদ্ধ ভারতে" Romain Rolland-এর প্রবন্ধে আপনার পিতার সহিত পরমহংস রামকৃষ্ণের

সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত আছে। ইহা রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের পক্ষ হইতে লেখা। অন্য versionটি প্রকাশিত হইলে সত্য নির্ণয়ের সুবিধা হইত।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৫

২৭ অগস্ট ১৯৩১

২৭।৮।১৯৩১।

ভক্তিভাজনেষু

আমাকে একটি কাজের ভার লইতে হইয়াছে যাহা করিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি।

রঘুনাথ মল্লিক নামক চোরবাগানের মল্লিক গোষ্ঠীর একটি যুবক সংস্কৃতে এম. এ. পাস করিয়া "কালিদাসের গল্প" লিখিয়াছেন এবং তাহা চিত্রিত করাইয়া প্রকাশ করিতেছেন। সেই বইটির একটি ছোট ভূমিকা আপনাকে লিখিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে আমাকে বলিয়াছেন। আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা আমি জানি, আপনি কিরূপ কর্ম্মপীড়িত তাহাও জানি। এই কারণে এ ভার লওয়া আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু অনেক সময় মানুষকে অগত্যা অনেক কাজ করিতে হয়। সেইজন্য, আপনি অনুরোধ রক্ষা করিতে পারুন বা না পারুন, আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। বহির পাতাগুলি ও কতকগুলি ছবি পাঠাইতেছি। এগুলি আমি স্বয়ং আপনাকে দিব বলিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ চলিয়া আসায় দেওয়া হয় নাই। বহিখানি আপনি আদ্যোপান্ত পড়িবেন, এরূপ

অসঙ্গত অনুরোধ আমি করিতেছি না। কালিদাস সম্বন্ধে ২।৪ কথা এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর কিছু আস্বাদ বাঙালী পাঠকেরা পাইলে ভাল হয়, এই প্রকার বা অন্য যাহা আপনার বিবেচনায় ভাল, তাহা লিখিলেই কাজ চলিবে। এক পৃষ্ঠার বেশী লিখিবার প্রয়োজন নাই।

আপনি কিছু না লিখিলেও আমার চিত্তবিক্ষেপ হইবে না—বলা বাহুল্য।

ভবদীয়

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ বহির পাতা ও ছবিগুলি ডাকে রেজিষ্টরী করিয়া পাঠাইতেছি।

১৬

২১ ডিসেম্বর ১৯৩১

2-1, Townshend Road,

Bhawanipur P. O.

Dated the 21st Dec., 1931.

ভক্তিভাজনেষু

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনের উৎসবে শান্তিনিকেতনে আপনার বক্তৃতার যে তাৎপর্য্য প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল, তাহার একটি অনুবাদ আপনাকে পাঠাইতেছি। মহাত্মাজির সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য বাঙালী ছাড়া অন্যেরাও জানিলে উপকৃত হইবেন বলিয়া উহা ইংরেজীতে ছাপিতে চাই। কিন্তু অনুবাদক মূলের বেশী অনুসরণ করায় ইংরেজীটা ভাল হয় নাই।

অল্পস্বল্প সুধরাইলে যদি চলনসই হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টা করিবেন ; নতুবা অনুবাদটি ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

মস্কোতে আপনার ছবিসমূহের প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আপনি ইংরেজীতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার একটি ফোটোগ্রাফ কেদার রথীর নিকট হইতে আনিয়াছেন। তাহার প্রতিলিপি মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপিবার অনুমতি চাহিতেছি। নিষেধপত্র না আসিলে বুঝিব আপনার অনুমতি আছে। আর, যদি চিঠি লিখিয়া অনুমতি দিবার অবকাশ হয়, তো আরও ভাল।

আপনার ছবি চারিখানির ব্লকের প্রুফ দেখিয়া নন্দলালবাবু অনুমোদন করিয়াছেন। সংশোধন যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহা করা হইয়াছে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৭

২ অগস্ট ১৯৩২

১রা আগষ্ট, ১৯৩২।

ভক্তিভাজনেষু

আপনাদের ছবিগুলি সম্বন্ধে কালিদাসের সহিত কথা হইয়াছে। অন্যান্য ছবির সহিত উহার ব্লক প্রস্তুত করিবার জন্য U. Roy & Sons এর বর্তমান মালিক করুণাবিন্দু বিশ্বাসকে দেওয়া হয়। শুনিলাম, করুণাবাবু বলিয়াছেন, যে,

তিনি যাহাদের নিকট হইতে ছবিগুলি পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ফেরত দিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে যে formal চিঠি তাঁহাকে দশবার দিন পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, তাহার লিখিত জবাব তিনি এখনও দেন নাই। লিখিত জবাব পাইবার চেষ্টা করাইব। তাহার পর কর্ত্তব্য স্থির করিব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

১৮

৭ ডিসেম্বর ১৯৩২

The 7th Dec., 1932.

ভক্তিভাজনেষু

পৌষের প্রবাসীর জন্য আপনি "পত্রধারার" যে তিনটি চিঠি দিয়াছিলেন, তাহার প্রথমটি ছাপিতে পারিলাম না কারণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ঐরূপ কারণে মিঃ ব্রেল্‌স্‌ফোর্ডের বহি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটির কয়েকটি জায়গা দাগ দিয়া পাঠাইতেছি। ঐগুলি সম্বন্ধে যাহা বিহিত, করিয়া আমাকে ফেরত দিলে অনুগৃহীত হইব।

যাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাহাও ছাপিতে না পারার হীনতাবোধে আমার অনিদ্রা ঘটিতেছে।

আপনার সহিত যখন সাক্ষাৎ করিতে পারিব, তখন সব কথা বলিব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

১৯

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

43, Wellesley Street,
Calcutta, 17-9—1934.
রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যার ২৫৪ পৃষ্ঠায় আপনার "Message to the Society of Friends, Ireland" আমি "Moral Warfare" নাম দিয়া ছাপিয়াছি, দেখিয়া থাকিবেন। উহা আপনার কয়েক বৎসর আগেকার লেখা—বোধহয় বিলাতে থাকিতে আইরিশ কোয়েকারদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। উহা অপ্রকাশিত অবস্থায় আমার নিকট ছিল। সেপ্টেম্বর সংখ্যার গোড়ায় দিবার মত কিছু খুঁজিতে খুঁজিতে আমি উহা পাই। উহা প্রেসে কম্পোজ করিতে দিবার পর আপনার "I am He" প্রবন্ধটি পাই 'Moral Warfare' তখন কম্পোজ হইয়া গিয়াছে, এবং জিনিষটিও ভাল। সুতরাং দুইটিই ছাপা হইয়াছে।

প্রেস অফিসার যদিও Warning দেন নাই, তথাপি তিনি কেদারনাথকে মৌখিক বলিয়াছেন, যে, জিনিষটি আপত্তিজনক। কারণ, উহাতে মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে "The evils" এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, "the cowardly violence of evils"-এর বিরুদ্ধে "Spiritual powers array" করার কথা, "aggressive power pitifully fails when human

nature bears insult and pain without retaliating" ইত্যাদি কথা আছে; অতএব (প্রেস অফিসারের মতে) জিনিষটি ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছে। কেদার বলিয়াছেন, যে, ইহা বিশেষ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিত বা অভিপ্রেত নহে, নেশ্যনমাত্রেরই সহিত অন্য নেশ্যনের ব্যবহার সম্বন্ধে ইহা লিখিত। প্রেস্ অফিসার বলেন, আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন লোকে কি বুঝিয়াছে। কেদার বলেন, আমি 'Author-কেই জিজ্ঞাসা করিব।

অবশ্য আপনি বিশেষ করিয়া ভারত গবর্নমেণ্টেরই বিরুদ্ধে ইহা লেখেন নাই, যদিও ব্রিটিশ নেশ্যন অন্যায় করিলে অন্য অন্যায়কারী নেশ্যনের মত তাহাদেরও বিরুদ্ধে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

আপনি উত্তরে যাহা লিখিবেন তাহা প্রেস অফিসারকে দেখাইতে হইবে না। তবে তিনি যদি কেদারকে কোন উপলক্ষ্যে ডাকেন ও কথা উঠে তাহা হইলে কেদার আপনার মত জানাইতে পারিবে। লেখাটি যে অনেক আগে লিখিত, তাহা কেদার জানিত না, এবং কোন্ বৎসর ও মাসে আমি উহা পাইয়াছিলাম তাহা লিখিয়া না রাখায় আমিও তারিখ ছাপিতে পারি নাই।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২০

১৪ জানুয়ারি ১৯৩৫

43, Wellesley Street

14-1-1935.

ভক্তিভাজনেষু

আপনি অমিয়বাবুর চিঠির উপর লণ্ডনে ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনী সম্বন্ধে কিছু মত প্রকাশ করিয়া যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার প্রুফ দেখা এবং তাহা প্রবাসীর পৃষ্ঠাভুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর সহকারী সম্পাদকদের বুঝিবার ভুলে উহা মাঘের প্রবাসীতে ছাপা হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। আমি প্রায়ই আফিস যাইতে পারিনা। এই জন্য এই রূপ হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। লেখাটি ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২১

২১ জানুয়ারি ১৯৩৬

43, Wellesley Street

২১।১।১৯৩৬.

রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

কাল এয়ার মেলে পারিস হইতে একটি চিঠি পাইয়াছি। তাহার নকল পাঠাইতেছি। (তাহাতে উল্লিখিত পুস্তিকাটি

এখনও পাই নাই)। এই রূপ চিঠি আপনি আগেই পাইয়া থাকিবেন। জগদ্ব্যাপী শান্তির জন্য ভারতবর্ষ হইতে সহযোগিতা করিতে হইলে সে চেষ্টার নেতৃত্ব আপনাকে করিতে হইবে। অতএব এ বিষয়ে আপনার উপদেশ চাহিতেছি। আপনি যাহা করিবেন বা করিতে বলিবেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে।

আপনার "শিক্ষার" নূতন সংস্করণটি দেখিতেছিলাম। ইহাতে যাহা আছে, তাহার অন্ততঃ কতকগুলি প্রবন্ধ ইংরেজীতে বাহির হইলে সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোক উপকৃত হয় এবং বাহিরের লোকও অনেকে জানিতে পারে। "তপোবন" প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে কি? না হইয়া থাকিলে আপনার ওখানকার অধ্যাপকেরা কেহ করিলে ভাল হয়। উহাতে যাহা আছে, তাহার অনেক কথা ইংরাজীতেও আপনি লিখিয়াছেন বলিয়াছেন, কিন্তু সমস্তটির অনুবাদ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২২

২ মার্চ ১৯৩৬

43, Wellesley Street,

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪২।

ভক্তিভাজনেষু

মডার্ন রিভিয়ুর জন্য আপনার একটি কি দুটি লেখা চাহিতেছি। ছোট, বড় কবিতা, গদ্য-যাহা হউক, হইলেই

হইবে। যাঁহাদের লেখায় কাগজখানার মূল্য বাড়িয়াছে, আপনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। সম্প্রতি আমাকে উহার লেখকদের একটি তালিকা ছাপিতে হইবে। তাহাতে গোড়ায় আপনার নাম দিব। এইজন্য এখন কিছু লেখাও আপনার বাহির হওয়া চাই।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২৩

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৩।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার "জাপানে-পারস্যে" গ্রন্থে আমার নাম মুদ্রিত করায় অনুগৃহীত হইয়াছি।

আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিনীত নিবেদক

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২৪

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

P 283, Darga Road,
Circus P.O.
১৬।৯।১৯৩৬।

ভক্তিভাজনেষু

পরশু আপনার বাড়ীতে আপনার কবিতা পাঠের পর একটি কথা আপনাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভিড়ের

মধ্যে সুবিধা হইল না।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে এখানকার কয়েকজন মহিলা কর্ম্মী একটি মহিলা সম্মেলন করিতে চান। তাহাতে, সারা বাংলাদেশে যে-সব মহিলা শিক্ষাদান ও অন্যান্য উপায়ে পল্লীউন্নয়ন প্রভৃতি কাজ করেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইবে। যাঁহারা ইহার উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা আপনি এই সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন। আমিও মনে করি, আপনি ইহা করিলে যেরূপ শুভফল হইবে, অন্য কেহ তাহা করিলে সেরূপ হইবে না। আপনি সম্মত হইলে তারিখ আপনার সুবিধামত নির্দ্ধারিত হইবে। সম্মেলনটির উদ্যোগ শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ করিতেছেন। ইনি ময়মনসিংএর শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের কন্যা, আগে একটি গবর্ণমেণ্ট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাহা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়া দেশহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এখন ভবানীপুরে একটি নারী প্রতিষ্ঠান চালান। তাহাতে পল্লাগ্রামে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবার নিমিত্ত প্রাপ্তবয়স্কা ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আপনার বিশেষ অসুবিধা না হইলে সম্মেলনটির উদ্বোধন আপনি করিলে আনন্দিত হইব।

আমি শুনিয়াছি, আপনার যত কবিতা লেখা ছিল, সমস্তই আপনার শেষ কবিতার পুস্তকে ছাপা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর যদি কিছু লিখিয়া থাকেন বা লেখেন, তাহা হইলে

কার্ত্তিকের ও অগ্রহায়ণের প্রবাসীর জন্য একটি করিয়া দিলে অনুগৃহীত হইব।

কার্ত্তিকের প্রবাসী ২৩শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর, বাহির হইবে।

আমি এখন শান্তার কাছে আছি। তাহার ঠিকানা চিঠির ১ম পৃষ্ঠার মাথায় লিখিয়া দিয়াছি। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৫

১৩ অক্টোবর ১৯৩৬

P. 283, Darga Road,
Circus P. O., Calcutta.
the 13th Oct., 1936.
রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

বিহার প্রদেশের অন্যতম বিহারী নেতা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে চান। তিনি শিক্ষাবিষয়ে যোগ্য লোক। পড়াশুনাও বেশ আছে। তাঁহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস আর একজন লোক দাঁড় করাইবেন, তিনি এইরূপ শুনিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটদাতাদের মধ্যে অনেক বাঙালী আছেন। তিনি আশঙ্কা করেন, যে, আপনার দ্বারা এই বাঙালী ভোটারদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে

ভোট দেওয়ান হইবে। সেইজন্য আপনাকে চিঠি লিখিবার জন্য আমাকে লিখিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনি না, তাঁহাকে চিনি। তিনি যোগ্য লোক।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৬

২০ জানুয়ারি ১৯৩৭

20 Mullen Street,
Elgin Road P. O.
কলিকাতা।
২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৭।

ভক্তিভাজনেষু

আপনি সুস্থ আছেন এই অনুমান করিয়া এই চিঠি লিখিতেছি।

মডার্ণ রিভিয়ুর ফেব্রুয়ারীসংখ্যার গোড়ায় ছাপিবার মত কোন লেখা হাতে নাই। সুরেনবাবুকে একটি অনুবাদের জন্য লিখিয়াছি। এখনও উত্তর পাই নাই। আপনার নিকট কবিতার অনুবাদ বা গদ্য কিছু যদি থাকে, দিলে অনুগৃহীত হইব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৭

১৮ মার্চ ১৯৩৭

20 Mullen Street

১৮।৩।১৯৩৭

ভক্তিভাজনেষু

অরবিন্দ জেনিভা থেকে যে তর্জমাগুলি পাঠিয়েছেন, তার কিছু অনুমোদিত হলে অনিলবাবু আমাকে যেন পাঠিয়ে দেন, এই কথা তাঁকে বললে অনুগৃহীত হব।

আপনি গত রবিবারে অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদের আলোচনা যখন কচ্ছিলেন তখন আমার মনে হয়েছিল, sugest আর suggestion এর বাংলা কি হবে। এইরকম আরও খুব প্রচলিত কয়েকটা ইংরেজী শব্দ আছে, যার বাংলা সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৮

১৯ মে ১৯৩৮

20 Mullen Street,

Elgin Road, P. O.

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।

ভক্তিভাজনেষু

অনিলবাবুর চিঠির মধ্যে আপনার ২রা জ্যৈষ্ঠের চিঠি পেয়েছি। পেয়েই "রবিরশ্মি" সম্বন্ধে চারুবাবুকে লেখা

আপনার চিঠি না-ছাপতে আমার সহকারীদিগকে লিখে দিয়েছি। চারুবাবুকেও তা জানিয়ে দিলাম। তিনি যদি ছাপতে বলেন, তখন ছাপা হবে। একথাও তাঁকে লিখেছি যে, তিনি শুধু "আমার আপত্তি নাই" বললেই ছাপব না; তিনি Positive ইচ্ছা প্রকাশ করলে ছাপব।

আপনার চিঠির শেষ কথাগুলি থেকে মনে হল আপনি নিরুপদ্রবে আছেন। তাতে প্রীত হয়েছি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৯

২৮ অগস্ট '১৯৩৮

20 Mullen Street,
Elgin Road P. O.,
কলিকাতা।
২৮-৮-১৯৩৮।

ভক্তিভাজনেষু

জাপানী কবি য়োনে নোগুচি আপনাকে ও মহাত্মা গান্ধীকে চীন জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমার নিকটও আসিয়াছে। যদি আপনি আপনাকে লিখিত চিঠির কোন উত্তর দেন, তাহা হইলে আমি তাহার একটি নকল পাইলে উপকৃত হইব।

ধীরেন লিখিয়াছেন আপনার স্বাস্থ্য এখন ভাল আছে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পুনঃ—আমি মহাদেব দেশাইকেও লিখিলাম গান্ধীজী কোন জবাব দিলে যেন একটি নকল পাই।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৫০

৩১ মার্চ ১৯৩৯

১নং উড্ স্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৭ই চৈত্র ১৩৪৫।

ভক্তিভাজনেষু

আমাকে একটি প্রদর্শনী খুলবার জন্যে বাঁকুড়া যেতে হ'চ্ছে। রবি সোমবার ১৯শে ২০শে চৈত্র সেখানে থাকতে হবে। এইজন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না।

তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বারা বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে দেশের যে উপকার হ'য়েছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সভার কাজ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষক ছিল বলে এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য এর পরিচালক, ও প্রধান কর্ম্মী ছিলেন ব'লে, এর সব কাজই উপেক্ষা ক'রে চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে ব'লে মনে হয়। তা না হ'লেও, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সুবিচার বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস

লেখকেরা করবেন বলে মনে হয় না। এইজন্যে, আপনি যদি বিশ্বভারতীর সংশ্রবে বা অন্য কোনরকমে এ বিষয়ে গবেষণা, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করান তো বড় ভাল হয়। যথাসময়ে, সভার শাতাব্দিক উৎসবও হতে পারবে।

শ্রীমান্ হিতেন ও যোগানন্দ এ বিষয়ে আপনার উপদেশ নেবার জন্যে যাচ্ছেন।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৩১

১১ জুলাই ১৯৩৯

1 Wood Street,

Dated the 11th July 1939.

ভক্তিভাজনেষু

আমি গত শনিবার রাত্রে আপনাকে একটি চিঠি লিখিয়াছি। তাহা লিখিবার কারণ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রদেব লিখিত "সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র" নামক পুস্তকের নিম্নলিখিত বাক্যগুলি :—

"'প্রবাসী' পত্রিকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'প্রবাসীতে' লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র প্রবাসীতে লেখা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী থেকে যখন তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল যে, তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক করে যেন পূর্ব্বাহ্ণে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁরা সেটি মনোনীত

করলে তবেই সে উপন্যাস 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হবে,—এ সর্ত্তে শরৎচন্দ্র নিজেকে অপমানিত করতে রাজী হলেন না। একথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবি শুনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে 'প্রবাসীতে' রচনা পাঠাতে তাঁকে বারংবার নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র তাই প্রবাসীতে কখনো কোন রচনা দেন নি।"

কোন বিখ্যাত বা অবিখ্যাত লেখকের লেখা পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করা আশ্চর্য্যের বা দোষের বিষয় নহে। কিন্তু আমি শরৎবাবুর লেখা পাইবার জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ বা চেষ্টা করি নাই। কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর বহির ঐ কথাগুলি অবলম্বন করিয়া আমার উপর আক্রমণ হইয়াছে। তাহা গত শনিবার রাত্রে দেখিয়া আমি ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। আমার চিঠিতে একটা বাক্য আছে যাহা ঔদ্ধত্য প্রকাশক মনে হইতে পারে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অন্য রূপ ছিল। বাক্যটা এইরূপ :—

"আমি জানি আমি কখনও আপনাকে এরূপ অনুরোধ করি নাই যে, আপনি শরৎবাবুকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করুন।" ইহার পর আমার লেখা উচিত ছিল, "এই কারণে আমার মনে হয় আপনি কখনও তাঁহাকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করেন নাই।" কিন্তু মনের চঞ্চল অবস্থায় তাড়াতাড়িতে তাহা লেখা হয় নাই। এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন। আপনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবাসীর প্রতি মমতাবশতঃ

তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া থাকেন, তাহা আপনার মহত্ব। কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছু জানিনা। এইজন্য, আপনি যাহা জানেন তাহা জানিতে চাহিয়াছি। জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

এ বিষয়ে প্রবাসীতে কিছু লেখা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু আপনার এ বিষয়ে কি মনে আছে না জানিয়া কিছু লেখা উচিত হইতেছে না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৩২

১৪ মার্চ ১৯৪০

১নং উড্ ষ্ট্রীট,

১লা চৈত্র ১৩৭৬।

ভক্তিভাজনেষু

এপ্রিল মাসের মডার্ন রিভিয়্ উহার চতুঃশততম সংখ্যা হইবে। অনেক আগে যুদ্ধ বাধিবার আগে ভাবিয়া ছিলাম সেটিকে বেশ বড় আকারে ভাল করিয়া ছাপিয়া বাহির করিব। কিন্তু যুদ্ধের জন্য কাগজপত্রের মূল্যবৃদ্ধিবশতঃ তাহা করিতে পারিলাম না। তথাপি ৪০০তম সংখ্যার মর্য্যাদা রক্ষা হইবে যদি আপনার ছোট একটি লেখাও উহাতে থাকে। যদি অপ্রকাশিত কিছু কবিতা বা গদ্য রচনা থাকে অনুগ্রহ করিয়া অনিলবাবুকে তাহা পাঠাইয়া দিতে বলিবেন। এ মাসে

আমাকে অন্য কাজ অনেক করিতে হইয়াছিল বলিয়া আপনাকে চিঠি লিখিতে বিলম্ব হইল। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পুঃ —আপনার বাঁকুড়ার যে-যে বক্তৃতার অনুলিপি কেহ লইয়াছিলেন, তাহা আপনাকে পাঠাইতে চিঠি লিখিয়াছি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৩৩

২ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

১নং উড্ ষ্ট্রীট্,

১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৭ সাল।

ভক্তিভাজনেষু

পরশু সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজে আমি যা বলেছিলাম, আপনার কাছে তা পাঠাচ্ছি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৪

২৮ নভেম্বর ১৯৪০

১নং উড্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭।

ভক্তিভাজনেষু

পরশু শনিবার আমি শান্তিনিকেতন যাইব। যদি ডাক্তারদের নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে আপনার নিকট

যাইব ; আর যদি নিষেধ থাকে, তাহা হইলে কেবল আপনার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইয়া আসিব, যেমন আপনি জোড়াসাঁকোতে থাকিতে অনেকবার করিয়াছি।

কোন অনুরোধ করিতে আপনার নিকট যাইব না। আপনাকে দেখা ভিন্ন অন্য কোন অভিলাষও অন্তরে লইয়া যাইব না।

সংবাদ লইয়া জানিয়াছি আপনি কিঞ্চিৎ বল পাইয়াছেন। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩১

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

1 Wood Street
Park Street P. O.
৩০শে মাঘ, ১৩৪৭।
১২।২।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

ফাল্গুনের প্রবাসীর জন্যে ছাপা আপনার "ঐকতান" কবিতাটির একটি ইংরেজী অনুবাদ হলে বাঙালী ছাড়া অন্যেরাও আনন্দিত ও উপকৃত হবেন। অনুবাদটি আপনার দ্বারা হলেই খুব ভাল হয়। কিন্তু আপনি এখন সেরূপ পরিশ্রম করতে পারবেন কি না জানি না। অবশ্য এম্প্রেস নন্দিতারও অনুমতি চাই। যদি পারেন, তাহলে অন্য কাউকে

বলতে হয় না। নইলে, আপনার মত হলে, আপনাদের অধ্যাপক শ্রীমান্ ক্ষিতীশকে বলে দেখতে পারি।

"তিন সঙ্গীর" ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপাবার লোভ আছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে অনুবাদ করাতে ও অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশ করাতে অনুমতি দেন, তাহলে ক্ষিতীশকে অনুরোধ করতে পারি। তিনি রাজী আছেন। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬৬

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

1 Wood Street.
Dated the 18th Feb. 1941.

ভক্তিভাজনেষু

১১ই মাঘের আপনার ব্যাখ্যানে মহাত্মা রামমোহন রায়কে আপনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। ঐদিন ক্ষিতিমোহন বাবুও তাঁর বক্তৃতায় রামমোহনের প্রকৃত স্থান নির্দেশ করে তাঁকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করেন। আবার ঐদিনই আমিও তাঁর সম্বন্ধে প্রসঙ্গত কিছু বলেছিলাম। এই আকস্মিক মিলটি আপনার গোচর করবার জন্যে আমার মুদ্রিত বক্তৃতাটা এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আশা করি আপনি এখন ভাল আছেন।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৭

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

1 Wood Street,

২০।২।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনি ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের যে বহিখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজ প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আফিস হইতে তাহা আপনার নিকট একখানি প্রেরিত হইবে। আপনি একবার পাতা উল্টাইয়া দেখিলে অনুগৃহীত হইব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—অনিলবাবু আমাকে লিখিয়াছেন যে, অমিয়বাবু আপনার "ঐকতান" কবিতাটির অনুবাদ করিতেছেন। তাহা শীঘ্র পাইবার আশা করিতেছি। তিনি যদি এই সঙ্গে আপনার "গান্ধি মহারাজ" কবিতাটিরও ইংরেজী তর্জমা করেন, তবে বড় ভাল হয়। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ঐটির খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, গান্ধিজী শেষবার বাংলাদেশে (মালিকান্দায়) আসিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন ও বাংলার সেই কলঙ্ক এই কবিতাটির দ্বারা শুধু ক্ষালিত হয় নাই, পরন্তু এইটির দ্বারা মহাত্মাজীর অবাঙালী শিষ্যদের সহিত বঙ্গের একটি মধুর যোগসূত্র ও মিলনসূত্রও স্থাপিত হইয়াছে। এই

সদ্ভাবসূত্রের খুব আবশ্যক ছিল, আছে ও বরাবর থাকিবে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৮

২ এপ্রিল ১৯৪১

২রা এপ্রিল, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনাকে কল্য লিখিয়াছিলাম যে, আপনার নূতন চিঠিটিও, অর্থাৎ ২৯শে মার্চের চিঠিটিও, প্রবাসীর বৈশাখ সংখ্যায় ছাপিতেছি। তাহা না ছাপাই স্থির করিলাম। আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া ও আপনার অনুমতি না লইয়া উহা ছাপা উচিত বোধ হইল না, এবং উহা ছাপা আবশ্যকও মনে হইতেছে না। আবশ্যক বোধ হইলে এবং আপনি অনুমতি দিলে পরে ছাপা যাইতে পারিবে। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৯

১৭ এপ্রিল ১৯৪১

১৭ই এপ্রিল, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনাকে বিন্দুমাত্রও কষ্ট দেওয়া আমার অনভিপ্রেত।

কিন্তু ক্ষিতীশ আপনার "নবজাতক" গ্রন্থের "জন্মদিন" কবিতাটির একটি অনুবাদ আমাকে দেওয়ায় আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে। এটি আপনাকে দেখিয়ে প্রকাশ করবার অনুমতি নেবার ভার ছিল অমিয়বাবুর উপর। তিনি অনুমতি নিয়েছেন কিনা জানতে পারিনি। সেইজন্যে জানতে চাচ্ছি এটির প্রকাশে আপনার সম্মতি আছে কিনা।

অনুবাদটি মূলের শাব্দিক অনুসরণ করেনি ; কিন্তু তাৎপর্য্য ঠিক থাকলে ছাপা চলবে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪০

২০ এপ্রিল ১৯৪১

২০।৪।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

একটি চিঠির প্রুফ আপনাকে না পাঠিয়ে আগে তার নকলটিই আপনাকে পাঠাচ্ছি। যদি নকলের সবটির বা কোন কোন অংশের প্রকাশে আপনার সম্মতি থাকে, তা হলে সমস্ত নকলটি বা তার অনুমোদিত অংশ প্রেসে পাঠাব, নতুবা পাঠাব না।

এই চিঠিটির প্রথম প্যারাগ্রাফে আপনার পিতৃদেবের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যে-সব কথা আছে, তাতে রামকৃষ্ণের কোন ব্যক্তিগত সমালোচনা নাই।

সুতরাং তাহা প্রকাশে কাহারও অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। অবশ্য আপনার সত্য ও ন্যায্য কথাগুলি অনেকের পক্ষে প্রীতিকর হবে না। কিন্তু সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ ভক্তেরা এমন সব কথা বানিয়েছেন যার জন্যে বিষয়টির অপক্ষপাত ঐতিহাসিক বিবেচনার নিমিত্ত আপনার কথাগুলি নিরপেক্ষ লোকদের জানা আবশ্যক।

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সম্বন্ধে আপনার চিঠিটিতে ছিল— "কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের সিংহদ্বার দিয়ে— এই জন্যে আত্মন্যেবাত্মানং উপলব্ধির বিশুদ্ধ আত্মসমাহিত আনন্দের সাধনা তাঁর ছিল না— শাক্তবৈষ্ণব ধর্ম্ম থেকে হৃদয়াবেগ মন্থন করে নেওয়া এবং তার আন্দোলনে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল।"

আমি এই বাক্যগুলি নকল করি নি— এগুলি ব্যক্তিগত সমালোচনা মনে হতে পারে বলে বাদ দিয়েছি।"

আমি বুঝতে পারছি, আমি আপনার উপর উপদ্রব কচ্ছি। কর্ত্তব্যের দায়ে কচ্ছি বটে, কিন্তু তা কষ্টকর হলে আপনি অসঙ্কোচে আমাকে নিষেধ ও নিবৃত্ত করবেন, এই ভরসায়।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২০।৪।১৯৪১

পুনশ্চ—

"জন্মদিন" কবিতাটির পরিবর্ধিত অনুবাদটি পাইয়া বাধিত হইলাম। উহা কল্য সোমবার প্রেসে পাঠাইব। উহার প্রুফ

পাঠান অনাবশ্যক।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪১
২৬ এপ্রিল ১৯৪১

২৬শে এপ্রিল, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ১৫শে এপ্রিলের চিঠি পেলাম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত আপনার পিতৃদেবের সাক্ষাৎকারের বিষয় যে চিঠিখানিতে আছে, তা ছাপানো যে একান্ত আবশ্যক, এমন কথা বলতে পারিনে। এটি ছাপালে অনেকে ক্লেশ অনুভব করবেন তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং না ছাপালেই ভাল।

আপনি কোনো চিঠিই ছাপাবার জন্যে আমাকে লেখেন নি। এটিও প্রকাশ করবার জন্যে লেখেননি। সবগুলি বা কোনটিই যে ছাপতে হবে, এমন কোন কথা নাই। আরও কয়েকটি চিঠি আছে, যার একটি বাক্যও ছাপাবার জন্য নকল করি নি। কেবল যেগুলিতে কারো মনে আঘাত লাগবে না, সেইগুলিরই নকল প্রেসে দিয়েছি। তারও প্রুফ আপনার কাছে যাবে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪২

২৮ এপ্রিল ১৯৪১

২৮।৪।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আপনার পিতৃদেবের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আপনার চিঠিটির বিষয়ে আপনি ২৬শে এপ্রিল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। আপনার ইচ্ছা অনুসারে উহা কোন উপযুক্ত সময়ে ছাপিবার জন্য রাখিলাম। আপনার ২৬শে এপ্রিলের চিঠিটিও উহার সঙ্গে রাখিয়া দিলাম।

আপনার "সভ্যতার সঙ্কট" সম্বন্ধীয় ভাষণে যাহা যোগ করিয়াছেন, সুধীরবাবুর চিঠির মধ্যে তাহা পাইয়া প্রেসে পাঠাইয়া দিয়াছি।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী বাহির হইয়া গেলে একবার শান্তিনিকেতন যাইবার ইচ্ছা আছে। তাহার আগে কয়েক জায়গায় আপনার জন্মোৎসব করিয়া যাইতে হইবে। ইতি

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৩

৫ মে ১৯৪১

৫।৫।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

গত ৭ই এপ্রিল আপনার যে দীর্ঘ টাইপ লিখিত পত্র

পাইয়াছিলাম, তাহা পড়িয়া বিচলিত হইয়াছিলাম—ইহা আপনাকে সেই চিঠি পাইবার পর জানাইয়াছিলাম।

চিঠিটির প্রুফ দেখিবার সময় সে কথা আবার মনে পড়িয়াছিল। বিচলিত হইবার কারণ এই যে, আপনি ইয়োরোপে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যে প্রীতি ও সম্মান পাইয়াছেন, তাহার পূর্ণ বৃত্তান্ত আমাদের এবং দেশের অন্য লোকদের আনন্দ ও কল্যাণের নিমিত্ত প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। না হওয়ায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি এবং দেশের অন্য লোকেরাও বঞ্চিত হইয়াছেন।

আমি ইয়োরোপে অল্প যে কয় জায়গায় আপনার সঙ্গে ছিলাম, তাহা হইতেই ইয়োরোপের অন্যত্র লোকেরা আপনাকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বুঝিয়াছিলাম। আপনার সহিত পরিচিত হইবার ও নিকট সংস্পর্শ লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভের পর আপনি প্রথম যখন বিদেশ যাত্রা করেন, তখন আমার চক্ষে দিনের আলো ম্লান হইয়াছিল—ভাবিয়াছিলাম আমাদের দেশের বাহিরে পৃথিবীতে যাহারা বাস করে, তাহারা আপনার লেখা পড়ে শুধু ইহাই ত তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট; আপনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তাহারা না-ই পাইল। কিন্তু ইয়োরোপে কয়েকদিন আপনার সঙ্গে থাকিয়া মানুষের আপনার সংস্পর্শ লাভে কি আনন্দ ও কল্যাণ তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আপনি যে আমাদের,

বাঙালীদের, ভারতবর্ষীয়দের একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন, তাহা বুঝিয়াছি। ভারতবর্ষের বাহিরে আপনার প্রতি মানুষের মনের ভাব বুঝিবার সুবিধা বাঙালীদের হইত, যদি আপনার ভ্রমণসঙ্গীরা ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেন।

আমার ইয়োরোপ দর্শনের বৃত্তান্ত মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত "Letters from the Editor" এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত "সম্পাদকের চিঠিতে" বাহির হইত। তাহাতে আপনার সম্বর্দ্ধনার কথাও থাকিত। তাহার পর আমার বহু বক্তৃতায় এবং ২/১টা প্রবন্ধে সে সব কথা বলিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে ত আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম না। সুতরাং আমার ক্ষোভ আছে। আমার বিচলিত হইবার অন্য কোন কারণ নাই।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৪

৭ মে ১৯৪১

১, উড্ স্ট্রীট,

Dated the 7th May 1941.

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ৬ই মের চিঠিখানি পেয়েছি। এটি আষাঢ় মাসের প্রবাসীর জন্যে রাখলাম।

আজ আপনার "গল্পসল্প" পুলিনের কাছ থেকে আ-বাঁধা

অবস্থাতেই আনিয়েছিলাম জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসীতে" 'পুস্তকপরিচয়' বিভাগে উল্লেখ করবার জন্যে। কিন্তু করে ফেলেছি তার চেয়ে বেশি—একেবারে আগাগোড়া পড়ে ফেলেছি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৫

১০ মে ১৯৪১

১, উড্ স্ট্রীট্,

১০ই মে, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আমি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে দুটি জিনিষ সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহা আপনার অবগতির জন্য পাঠাইতেছি।

এই দুটি বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত বক্তব্য লিখিব। এখন কেবল উল্লেখ করিলাম মাত্র।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৬

১১ মে ১৯৪১

১১ই মে, ১৯৪১।

রবিবার

ভক্তিভাজনেষু

"সাহিত্যে চিত্রবিভাগ", প্রবন্ধটি পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম।

আজ রবিবার, প্রেস বন্ধ। কাল এটি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতেই দিবার যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিব। এখন “বিবিধ প্রসঙ্গ” ছাড়া আর কিছুর জায়গা না থাকিবারই কথা। কিন্তু অন্য কিছু রাখিয়া দিয়া বা “বিবিধ প্রসঙ্গ” কমাইয়াও ইহা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দিতে হইবে।

বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা কেন officially দেওয়া আবশ্যক, আমি আজ তাহাও সংক্ষেপে বিবিধ প্রসঙ্গের জন্য লিখিয়াছি। ইহা যে গবর্ণমেণ্ট দিবেন, সে আশা আমি করিনা। কিন্তু যাহা হওয়া উচিত, আমি তাহাই বলিয়াছি। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট recognition ভিন্নও ইহা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় রূপে চালান যাইত, যদি যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আমাদের দেশে পাওয়া যাইবে না। পরে এ বিষয়টির আরও আলোচনা হয় ত করিব। আপাততঃ যাহা লিখিয়াছি, তাহা শীঘ্রই আপনার নিকট পাঠাইব। এ বিষয়ে আমার যতটুকু লেখা কম্পোজ হইয়াছে, তাহা আগেকার চিঠিতে আপনাকে পাঠাইয়াছি। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৪৭

১৩ মে ৯৪১

1, Wood Street,

Dated, the 13th May 1941.

ভক্তিভাজনেষু

সাহিত্যের চিত্রবিভাগ সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধটির প্রক্ষ দেখা হইয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে কাল বাহির হইবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখা একটি প্রবন্ধ আপনাকে পাঠাইতেছি। ইহা লিখিত হইবার ইতিহাস আমি যাহা অনুমান করি, তাহা আপনাকে মৌখিক জানাইব। আমি ১৬ই মে প্রাতে আপনার দর্শনপ্রার্থী। তখন দেখা হইলে কথা হইবে।

আপনাকে যে কখনও সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি করা হয় নাই, তাহার দায়িত্বটা আপনার উপর চাপান হইয়াছে। অথচ আপনার মুখেই শুনিয়াছি, আপনাকে সভাপতি করবার প্রস্তাব কখনও করা হয় নাই। আপনি পীড়িত হইবার পর, এক বৎসর আগে আপনাকে যে সভাপতি করিবার কথা তোলা হয়, সেটা makebelieve.

আপনাকে পরিষৎ অনেকবার সহকারী সভাপতিরূপে পাইয়াছিলেন, অথচ "অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও" সভাপতিরূপে আপনাকে তাঁহারা পান নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

পরিষৎকে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ী হইতে সাধারণ স্থানে

আনিবার নিমিত্ত আপনি সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহা আপনার মুখে শুনিয়াছি। সে কথার কোন উল্লেখ প্রবন্ধটিতে নাই। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পুঃ—প্রবন্ধটির লাল দাগগুলি আমার দেওয়া নহে।

রা. চ.।

৪৮

১৪ মে ১৯৪১

ক্লান্ত থাকিলে এই লম্বা চিঠি পরে পড়িবেন।

১৪ই মে, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আজ প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠসংখ্যা বাহির হইল। ইহার অন্য সব পাতা ভর্তি হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য একটি পাতা অতিরিক্ত ছাপিয়া মাঝখানে বসাইয়া দেওয়া হইল।

আপনাকে কাল "বঙ্গলক্ষ্মী" হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের যে প্রবন্ধটি পাঠাইয়াছি, আপনাকে কোন বাদপ্রতিবাদে জড়িত করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। আপনাকে বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষৎ যে কখনও সভাপতি করেন নাই, ইহা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। এ বিষয়ে যাহা ঐতিহাসিক সত্য তাহা জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। এইজন্য পাতাটি পাঠাইয়াছি।

আপনাকে অক্স্‌ফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট প্রদানের

যে অনুষ্ঠান হয়, সেই সময়ে—কিছু আগে বা পরে—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, আপনাকে পরিষদের সভাপতি করিবার প্রস্তাব কেহ কখনও করেন নাই। এক বৎসর আগে যে আপনার মত এ বিষয়ে পরিষদের পক্ষ হইতে জানিবার চেষ্টা হয়, তাহা সত্য, কিন্তু তাহার আগে, পরিষদের আধ শতাব্দীর জীবনে, যখন আপনি সুস্থ সবল ছিলেন, তখন আপনাকে কেন সভাপতি করা হইল না, ইহাই হইবে ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসা। হীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও" তাঁহারা আপনাকে কোনদিনই সভাপতি-রূপে পান নাই। এই অনেক চেষ্টা কি প্রকার, তাহা তিনি লেখেন নাই। "পরিষৎ-পরিচয়" নামক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বহিতে দেখিতেছি, পরিষদের কর্তৃপক্ষ আপনাকে সহকারী সভাপতিরূপে পাইয়াছিলেন ১৩০১, ১৩০২, ১৩০৩, ১৩০৮, ১৩১২, ১৩১৩, ১৩১৪-১৫, ১৩১৬ ও ১৩২৪ সালে। আপনি সহকারী সভাপতি হইতে রাজী হইয়াছিলেন এতবার, অথচ সভাপতি হইতে রাজী হইলেন না একবারও, কর্তৃপক্ষের "অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও" ইহা বিশ্বাস করা সহজ নহে।

হীরেন্দ্রবাবুর সহিত আপনার পরিচয় দীর্ঘকালের, এবং তিনি আপনার রচনাবলী ও নানা কার্যের সহিত পরিচিত। লিখিবার বড় বড় এত বিষয় আপনার সম্বন্ধে থাকিতে, আপনি যে সাহিত্যপরিষদের সভাপতি হন নাই এই বিষয়টি সম্বন্ধেই কেন তিনি প্রবন্ধ লিখিলেন, সে বিষয়ে আমার অনুমান

লিখিতেছি।

আপনাকে অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর উপাধি দিবার পর আমি সে বিষয়ে প্রবাসীতে একটি নোট লিখি। বিবিধ প্রসঙ্গে সেই নোটটির পরেই আর একটি নোটে লিখি যে, আপনার সম্মানের অভাব নাই, সম্মানপ্রার্থীও আপনি নহেন, কিন্তু ইহা বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় যে, বিদেশে যিনি এত সম্মান পাইয়াছেন অযাচিত ভাবে, তাঁহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ একবারও সভাপতি করেন নাই। আমার এই নোটটি প্রেসে কম্পোজ করা হইয়াছিল, ছাপা হইতে যাইতেছিল, এমন সময় পরিষদের সেক্রেটারি ও প্রবাসীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেদারের মারফৎ আমাকে অনুরোধ করিলেন যেন ঐ নোটটি ছাপা না হয়। কারণ বোধ হয় এই, যে, ওটি ছাপা হইলে লোকে ব্রজেন্দ্রবাবুর মুরুব্বি যদুবাবু ও হীরেন্দ্রবাবুকে দোষ দিবে যে তাঁহারা আপনাকে কখনও সভাপতি করেন নাই। যাহা হউক, আমি নোটটি ছাপি নাই। পাছে আমি ভবিষ্যতে ঐরূপ কিছু লিখি তাহারই অগ্রিম জবাব ব্রজেন্দ্রবাবু হীরেন্দ্রবাবুর দ্বারা এই প্রবন্ধে দেওয়াইয়াছেন আমার অনুমান এই।

আপনাকে যে প্রবন্ধের পাতাটি পাঠাইয়াছি, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুরই দ্বারা লাল কালীতে চিহ্নিত "বঙ্গলক্ষ্মী" হইতে ছিন্ন।

এই দীর্ঘ পত্রের উত্তর চাহিতেছি না। ১৬ই মে শুক্রবার প্রাতে আপনার অনুমতি পাইলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তখন আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানাইবেন। ইচ্ছা না করিলে কিছু বলিবেন না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব না। "পরিষৎ-পরিচয়" পুস্তক আমার সঙ্গে থাকিবে। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৯
১৭ মে ১৯৪১

১৭।৫।১৯৪১

ভক্তিভাজনেষু

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা থেকে আরম্ভ ক'রে এ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে আপনার যত লেখা পেয়েছি, প্রায় সবই না চেয়ে পাওয়া। এই জন্যে আপনার লেখা চাইবার অভ্যেস আমার হয়নি। কিন্তু "গল্পসল্প" পড়ে যখন দেখলাম, অন্তত ছোট ছোট গল্প আপনি এখনও লিখছেন, তখন আমার লোভ হয়েছিল, এবং এখনও আছে, স্বীকার করছি।

আপনি একটি গল্প ডিক্‌টেট্‌ করছেন শুনে আমি এ চিঠি লিখছি না—সেটি হয়ত অন্য কারও অনুরোধ অনুসারে লিখছেন। "গল্পসল্প" পড়ে আমি প্রলুব্ধ হয়েছি. এ কথা আপনাকে জানাব আগে থাকতেই স্থির ছিল। এই জন্যে এই চিঠি লিখলাম।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫০

২৬ মে ১৯৪১

২৬শে মে, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার নূতন গল্পটি পেয়ে একান্ত অনুগৃহীত বোধ করছি। এত বড় আনন্দের কারণ আমার ঘটবে তা কল্পনা করিনি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫১

২৯ মে ১৯৪১

১নং উড স্ট্রীট,

২৯শে মে ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ২৭শে মে লেখা চিঠি এইমাত্র আজ ২৯শে মে পেলাম। চিঠিটি দেখ্‌ছি ২৮শে ডাকে দেওয়া হয়েছিল।

আপনার গল্পটির প্রুফ আজই আপনার কাছে পাঠান হবে। এর সংশোধন বা এর থেকে কিছু পরিবর্জন আপনি স্বয়ং করলে তা যে রকম মানানসই ভাবে করা হবে, আমার দ্বারা তা হবে না। সেইজন্যে সকলরকম অনাবশ্যক কাজ থেকে আপনাকে রক্ষা করবার ঔৎসুক্য আমার থাকলেও এই কাজটি আপনি যতটুকু পারেন করে বা করিয়ে দেবেন, আমার ইচ্ছা এইরূপ। আপনার কাছ থেকে প্রুফ ফেরত

এলে আমিও দেখব। কিছু করা দরকার হলে আমি ক'রব। তার অনুমতি আপনি দিয়েছেন, আমি জেনে রাখলাম।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫২

১ জুন ১৯৪১

১লা জুন ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ৩১শে মে'র চিঠি অনুসারে আপনার গল্পটির ছাপা বন্ধ করিলাম। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৩

১ জুন ১৯৪১

১নং উড স্ট্রীট,

Dated the 1st June 1941.

রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

আজ দিনের বেলা আপনার চিঠি পেয়েই উত্তর দিয়েছি যে, গল্পটি আপনার ইচ্ছা অনুসারে ছাপা হবে না।

এর থেকে আপনি মনে করবেন না যে, আমি গল্পটিতে কোনো গুণ দেখিনি বা রস পাইনি। গুণ দেখেছিলাম, রসও পেয়েছিলাম। তবে সাহিত্যিক কোন বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তের উপর কথা বলার অভ্যাস আমার নেই, সেইজন্যে

প্রেসে লিখে দিয়েছি গল্পটি না ছাপতে। গল্পটিতে আপনি যে আক্রমণ আছে বলেছেন, তা আছে বটে। কিন্তু আমি তা বাদ দিয়ে বা বদলে সেটিকে আইনের ও বে-আইনী আইনের কবলের শঙ্কা থেকে মুক্ত করতে পারতাম।

যাক্— । আপনি যখন বলেছেন, ওটি করবেন না, তার উপর কথা নেই।

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৪
৪ জুন ১৯৪১

১নং উড স্ট্রীট
কলিকাতা
৪ঠা জুন ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

"বদনাম" গল্পটি সম্বন্ধে আমার ত্রুটি হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ এইরূপ মনে হওয়ায় আপনাকে এই চিঠি লিখিতেছি। ইহার দৈর্ঘ্যের জন্য আগেই ক্ষমা চাহিতেছি।

আপনার ২৭শে মে'র চিঠিতে আপনি লিখিয়াছিলেন, "... আমার অনুরোধ এই,—এই লেখার যে সকল জায়গায় উত্তেজনার কারণ আছে সেখানে যথোচিত পরিবর্তন করাই উচিত। আপনি যদি এই সংশোধনে মনোযোগ করেন তবে আমি নিশ্চিন্ত হই।" আপনার এই আদেশ পালন করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমার নিজের

সাহিত্যিক বিচারশক্তি ও রচনাশক্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাস প্রযুক্ত এবং আপনার সাহিত্যিক বিচার ও শক্তির উপর গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকায় আমি নিজে গল্পটিতে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন না করিয়া প্রুফে তাহা করিবার ভার আপনাকেই দিয়াছিলাম। তাহাতে আপনি হয়ত মনে করিয়া থাকিবেন যে, আমার মতে গল্প প্রকাশযোগ্য নহে। বাস্তবিক কিন্তু আমার মত সেরূপ নহে। আপনি প্রুফ পাইবার পর ৩১শে মে আমাকে লেখেন, "...এই গল্পটি এখনকার মত বন্ধ রাখাই ভালো মনে করি।" আমি ১লা জুন আপনার এই চিঠি পাইয়াই আপনাকে জানাই যে, গল্পটির প্রকাশ বন্ধ করিলাম। তাহাতেও আপনি মনে করিয়া থাকিতে পারেন যে, আমার মতে গল্পটি প্রকাশযোগ্য নহে। বাস্তবিক কিন্তু আমি কখনও সেরূপ মনে করি নাই। আমি ১লা জুন দিনের বেলাকার চিঠিতে লিখিয়াছিলাম যে, গল্পটির প্রকাশ বন্ধ করিলাম, কিন্তু রাত্রে আমার প্রকৃত মত জানাইয়া আপনাকে একটি চিঠি লিখিয়া খামে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম পরদিন ২রা জুন ডাকে দিব বলিয়া; কিন্তু diffidence বশতঃ তাহা ডাকে দেওয়া হয় নাই (তাহা এই চিঠির মধ্যে দিতেছি।)

আমার সামান্য যাহা সাহিত্যিক বিচারশক্তি ও রসানুভূতি আছে, তদনুসারে গল্পটি প্রকাশযোগ্য। উহার রস আমি আস্বাদন করিয়াছি। উহার অন্য উপযোগিতা এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষও যথেষ্ট আছে। উহার দুই এক জায়গায় অল্প যে

পরিবর্তন আবশ্যক তাহা আমিই হয়ত করিতে পারিতাম। জায়গাগুলি আমি দাগও দিয়াছিলাম, কিন্তু diffidence বশতঃ পরিবর্তন করি নাই। পরিবর্তন করিয়া দিলে, গল্পটি সম্বন্ধে আপনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা থাকিত না।

আমি এ সকল কথা লিখিলাম গল্পটি সম্বন্ধে আমার মত জানাইবার নিমিত্ত এবং আপনার আদেশ পালন না করায় আমার যে ত্রুটি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিবার নিমিত্ত। "গল্পটি প্রকাশ করিতে অনুমতি দিন," এই চিঠিটিকে এরূপ কোন আবেদন বা অনুরোধ মনে না করিলে বাধিত হইব। আপনি উহার প্রকাশ বন্ধ করিতে বলিয়াছেন, ইহা আমি চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

ছোট খামের ভিতর, ১লা জুন রাত্রে লিখিত যে চিঠিটা আছে, তাহা মনের বিচলিত ও ব্যস্ত অবস্থায় লেখা। তার অসংযমের ক্ষমা চাহিতেছি। গল্পটি প্রকাশ করিতে না পারায় আশাভঙ্গজনিত চিত্তচাঞ্চল্য হইয়াছিল। চিঠিটা সেই অবস্থায় লেখা। এখন মনের সে অবস্থা নাই। দীর্ঘ চিঠির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪ঠা জুন, ১৯৪১।
রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত আপনাকে একটি কথা জানাইতেছি। আপনি বিবেচনা করিলে উপকৃত ও সুখী হইব।

আপনার "সাহিত্য, গান, ছবি" শীর্ষক যে প্রবন্ধের প্রুফ আপনার নিকট আজ গিয়াছে, তাহার এক জায়গায় আছে, "তখন দেখতুম মেয়েদের সতীত্বধর্মর দুরন্ত তেজ", ইত্যাদি। আপনি যে প্রকৃত সতীত্বধর্মকে উপহাস করেন নাই, তাহা আমি বুঝি। কিন্তু বাংলাদেশে এখন একদল লেখক আছে যাহারা, কি পুরুষ কি নারী, সকলেরই চারিত্রিক শুচিতা মূল্যহীন মনে করে; আমার আশঙ্কা এই যে, তাহারা আপনার উক্তিটিকে তাহাদের মতের সমর্থক মনে করিতে পারে। এই আশঙ্কাও আমার আছে যে, আপনার এই কথাগুলি অবলম্বন করিয়া আপনার নিন্দুকেরা আপনার বিরুদ্ধে propaganda চালাইতে পারে। ইহারা এখনও সক্রিয় আছে। তাহাতে অবশ্য আপনার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহাতে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবান লোকেরা ব্যথা পাইবেন এবং নিরপেক্ষ এমন অনেক লোক আপনাকে ভুল বুঝিতে পারেন, তলাইয়া চিন্তা করিয়া কোন জিনিষ

বুঝিতে যাঁহারা অভ্যস্ত নহেন।

এই জন্য আমার মনে হয়, আপনি "সতীত্বধর্মর দুরন্ত তেজ" শব্দগুলি ব্যবহার না করিয়া অন্য প্রকারে আপনার বক্তব্য বলিলে ভাল হয়। আমার নিজের মতে আপনার কথাগুলি সুপ্রযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময়, লোকে যাহাতে ভুল না বুঝে বা কুব্যাখ্যা করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে লেখার সাহিত্যিক উৎকর্ষ (literary excellence) বলি দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে।

আমার আশঙ্কা অমূলক হইতে পারে। কিন্তু যাহা মনে হইয়াছে তাহা আপনাকে জানান আবশ্যক বোধ হওয়ায় জানাইলাম।

এই প্রবন্ধটিতে আপনি এক জায়গায় বিষ্ণু ওস্তাদের উল্লেখ করিয়াছেন। আমার মনে হইতেছে, আপনি আপনার অন্য একটি রচনায় যদুভট্ট ওস্তাদের আপনাকে ধরিবার চেষ্টার কথা লিখিয়াছেন। হয়ত উভয় ওস্তাদই ঐরূপ চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। ইতি—

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৬

৫ জুন ১৯৪১

৫।৬।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

"বদনাম" গল্পটি সম্বন্ধে আপনাকে আগে দু'খানা চিঠি

লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম, আপনার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা না জানিয়া সে দুটা ডাকে পাঠাইতে ভরসা হয় নাই। আজ আপনার ৪ঠা জুনের চিঠি পাইয়া সেই দুটা চিঠি পাঠাইতেছি। গল্পটি সম্বন্ধে আমার মত সেই দুটাতে পাইবেন। উহা নিশ্চয়ই প্রকাশযোগ্য। আমি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। সামান্য পরিবর্তন আবশ্যক। তাহা আপনার দ্বারা অনুমোদন করাইয়া আনিতে অল্প সময় লাগিবে, এবং তখন আষাঢ়ের প্রবাসীতে স্থানও থাকিবে না, বা যথেষ্ট থাকিবে না। অতএব, আপনার মত হইলে আমি উহা আপনার সংশোধন ও অনুমোদনান্তে শ্রাবণের প্রবাসীতে ছাপিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, ইহাতে আপনার আপত্তি হইবে না।

যদি আষাঢ়েই ছাপানো একান্ত আবশ্যক মনে করেন, টেলিগ্রাফ করাইবেন; চেষ্টা দেখিব। কিন্তু দুঃসাধ্য হইবে।

বুদ্ধদেব বাবুকে লেখা চিঠিটির প্রুফ আপনার কাছে আগেই চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহা আষাঢ় সংখ্যায় ছাপিব। সে সম্বন্ধে একটি চিঠিও আপনাকে আজই পাঠাইয়াছি। বুদ্ধদেব বাবুকে আপনি সাহিত্য, গান ও ছবি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব মূল্যবান। সমস্তই সাহিত্যে স্থায়ী স্থান পাইবে। তাঁহাকে আপনি দু-এক জায়গায় যে certificate দেওয়া গেছে [গোছের] প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার দোকানদারী অপব্যবহার তিনি ও তাঁর

গ্রুপের লোকেরা করিতেও পারেন। এইজন্য সেগুলি, আপনি অনুমতি দিলে, বাদ দিতে পারি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৭

৫ জুন ১৯৪১

৫।৬।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনি মিস্ রাথবোনের চিঠিটা উপেক্ষা না করায় ভারতবর্ষের কল্যাণ হইয়াছে—সত্যপ্রিয়, ন্যায়পরায়ণ ও মানবজাতির-স্বাধীনতাপ্রিয় সমুদয় বিদেশী লোকেরাও সত্যকথা জানিয়া উপকৃত হইবে, যদি আপনার কথা তাহাদের নিকট পৌঁছিতে দেওয়া হয়। আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন যে, মিস্ রাথবোন "ভারতহিতৈষী" ইংরেজদের মুখপাত্র।

আপনি যাহা লিখিয়াছেন অন্য কেহ তাহা লিখিতে পারিতেন না, লিখিলেও তাহা খবরের কাগজে ছাপা হইত না—ভারত "রক্ষা" (!) আইন অনুসারে চাপা পড়িত।

ইংরেজী বিবৃতিটির আপনার অনুমোদিত কোন অনুবাদ থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া তাহা পাঠাইয়া দিতে বলিবেন। মাসিক কাগজে তাহা থাকিলে ভবিষ্যতের বাঙ্গালীরাও তাহা পড়িতে পারিবে। তাহাতে তাহাদের জ্ঞান ও আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বাড়িবে। ইতি—

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৫৮

৬ জুন ১৯৪১

১নং উড্ স্ট্রীট,
৬।৬।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

গল্পটির প্রুফ পাইলাম। আবার আগাগোড়া কম্পোজ করিয়া আমাকে প্রুফ দিতে প্রেসে লিখিয়া দিলাম। আপনার নিকট আবার প্রুফ পাঠাইবার সময় হইবে না। ইতি—

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ একটি ফর্মা (৮ পৃষ্ঠা) অতিরিক্ত ছাপিতে হইবে। কারণ, আপনার গল্পটির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অন্য গল্প ছাপা হইয়া গিয়াছে।
এই কারণেও এখন আর সময় নাই বলিয়া আপনাকে আর প্রুফ পাঠান চলিবে না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৯

৭ জুন ১৯৪১

৭।৬।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

"সাহিত্য, গান ও ছবির" প্রুফ পেয়েছি। আপনার চিঠি পেয়েছি।

লেখাটির প্রুফ আমি একবার দেখে দিয়ে ছাপতে বোলবো। আপনার অনভিপ্রেত কিছু যাতে না থাকে, তার চেষ্টা আমি ক'রবো।

গল্পটি আষাঢ়ের প্রবাসীতেই ছাপা হবে। অন্য লেখা কিছু কিছু শ্রাবণের প্রবাসীর জন্যে রেখে দিচ্ছি। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬০

৯ জুন ১৯৪১

1 Wood Street

Dated, the 9th June 1941

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ৮ই জুনের চিঠি ও তার মধ্যে সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে আপনার নূতন লেখাটুকু পেয়েই প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রুফ আমি দেখব।

আমি যথাসাধ্য আপনার ইচ্ছার অনুযায়ী কাজ করতে চেষ্টা করব। আশা করি, কিছু ত্রুটি হ'লেও গুরুতর কিছু হবে না।

ব্যারামের ভোগের উপর আপনার এই সব দুর্ভোগ নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৬১

২৫ জুন ১৯৪১

1 Wood Street,
Dated, the 25th June 1941.

ভক্তিভাজনেষু

আপনার কন্যাকার চিঠি পেয়ে আমার মন থেকেও একটা বোঝা নেমে গেল। এই চিঠিটি শ্রাবণের "প্রবাসীতে" আপনার যে পত্রাবলী বেরবে, তার গোড়াতেই ছাপা হবে।

আপনার যে ভ্রমণবৃত্তান্তটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা বাংলায় হ'লে "প্রবাসী"তে, ইংরেজীতে হলে "মডার্ন রিভিয়ু"তে ছাপা হতে পারবে অবশ্য, যদি আপনার ইচ্ছা সেইরূপ হয়। আমার কোন দাবী নাই। কেবল যা মনে হল, তাই লিখলাম। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬২

৮ জুলাই ১৯৪১

৮ই জুলাই, ১৯৪১

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ৭ই জুলাইয়ের চিঠি পেলাম।

সকালে সুধাকান্ত ও সুধীরবাবুর চিঠি পেয়েই আমি সুধীরবাবুর প্রেরিত প্রবন্ধটি ছাপতে নিষেধ ক'রে দিয়েছি। আপনার সম্মতি ভিন্ন সেটি কোনমতেই ছাপা হ'ত না।

এর জন্যে যে আপনাকে চিঠি লিখতে হয়েছে, এতে আমি বড় দুঃখিত।

আমাকে লেখা আপনার যে-সব চিঠি প্রবাসীতে ছাপা হচ্ছে, তার দু-একটিতে শান্তা ও সীতার নাম আছে তাই দেখে শান্তার এক কন্যা তাঁর মার কাছে দুঃখ জানিয়েছেন, "চিঠিতে কেমন তোমাদের নাম ছাপা হয়, আমাদের হয় না।" তাতে শান্তা কন্যাকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, "তোমরা বড় হও, তখন তোমাদেরও নাম বেরবে" তাতে কন্যাটি বললেন, "ওঁর (অর্থাৎ আপনার) চিঠিতে তো বেরবে না।" ইতি।—

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬৩

ভক্তিভাজনেষু

শ্রীমতী লীলাবতী রায়কে আমি কয়েক বৎসর আগে হইতে জানি এবং ঢাকায় তাঁহার অনুষ্ঠিত শিক্ষাদান কার্য্য ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় দেখিয়াছি। এইরূপ কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। আপনিও বোধ হয় নামে তাঁহাকে চিনেন এবং তাঁহার কাজের কথাও শুনিয়া থাকিবেন। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্র-রামানন্দ-প্রসঙ্গ

প্রবাসী- ও মডার্ন রিভিয়ু-সম্পাদক রামানন্দ. চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৩) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ প্রায় চুয়াল্লিশ বছরের। রামানন্দ-সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বিদায়' ('কল্পনা' কাব্যে সংকলিত) ১৩০৫ এর বৈশাখে যখন প্রকাশিত হয়, তখনও দুজনের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় নি। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে জানতেন। রামানন্দ সিটি কলেজে অধ্যাপক থাকার সময় 'দাসী' (প্রকাশ ১৮৯২) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাতে গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' (১৩০২ ফাল্গুন) কাব্যের সমালোচনা করেন। পরের মাসেই (১৮৯৬ মার্চ) রামানন্দ নিজেই রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতাটির একটি সমালোচনা লেখেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে এলাহবাদে আসেন। এখানে আসার কিছুদিন পর তিনি 'দাসী'র সম্পাদনাভার ত্যাগ করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'প্রদীপ' পত্রিকা। রামানন্দ তার সম্পাদকপদ গ্রহণ করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ 'প্রদীপে' প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রদীপ' উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। সেকালের প্রায় সব বিখ্যাত লেখকই এতে লিখতেন। 'প্রদীপে'র বৈশিষ্ট্য ছিল ত্রিবর্ণচিত্র মুদ্রণ। যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাদম্বরী' চিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-জীবনীকার অনুমান করেন রামানন্দই রবীন্দ্রনাথের কাছে এই চিত্রের ব্যাখ্যামূলক

একটি প্রবন্ধ চেয়ে থাকবেন।[1]

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে একবার এলাহবাদে যান। মৃত বলেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। তখনই রামানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় (১৯০০) রামানন্দের বাড়িতে।

১৩০৬ মাঘ মাসে রামানন্দ 'প্রদীপে'র সম্পাদনাভার ত্যাগ করেন। ১৩০৮ সালের বৈশাখে (১৯০১ এপ্রিল) প্রকাশিত হল সুবিখ্যাত প্রবাসী। রামানন্দ আমৃত্যু এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই পত্রিকার দানের কথা সকলেই জানেন। এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ কত ঘনিষ্ঠ ছিল, রামানন্দকে লেখা পত্রেই তার প্রমাণ। তাঁর অজস্র কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে প্রবাসীতে। সবুজপত্র বা বিচিত্রায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হলেও প্রবাসীর দাবী ছিল সর্বাগ্রগণ্য। শুধু নিজের লেখা নয়, প্রবাসীতে সংকলনের জন্য তিনি নিজে অথবা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের দ্বারা বিদেশী পত্রিকার রচনার অনুবাদ করিয়ে পাঠাতেন। রামানন্দ লিখেছেন—

'রবীন্দ্রনাথ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবাসীর জন্য বিলাতী ও আমেরিকার বহু মাসিক পত্রের ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া তাহার কোন কোন অংশ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাহাকে কাহাকেও অনুবাদ করিতে দিতেন, সমুদয় অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন এবং কোন কোন অনুবাদ সন্তোষজনক না হইলে স্বয়ং সমস্তটি লিখিয়া দিতেন, তখন তিনি অজ্ঞাত অখ্যাত ছিলেন না।'[2]

---

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড, ১৯৭০. পৃ. ৫০৪

২ প্রবাসী ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৬০-৬১

রবীন্দ্রনাথ সাময়িক পত্রে লিখে দক্ষিণা পান প্রবাসীতেই প্রথম। একথা রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে স্মরণ করেছেন। প্রবাসীর দক্ষিণা দেওয়া নিয়ে ভারতী পত্রিকা কটাক্ষ করলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

'এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার। তারপরে এই ইতিহাসের ধারা আর অধিক বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই।

প্রবাসী-সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন, তবে তার কারণ এ নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে ; এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।

কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুঃকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম ; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয়

দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্ম্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।'[৩]

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ প্রকাশ করলেন মডার্ণ রিভিয়ু। এই পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের মূল অথবা অনুবাদিত রচনা প্রকাশিত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন—

'রবীন্দ্রনাথ ও কুমারস্বামীর যুগ্মনামে কবির ইংরেজি অনুবাদকবিতা দুইটি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯১১ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, শিশুকাব্যের "জন্মকথা" ও "বিদায়"। সেই সময় হইতে প্রায় প্রতি মাসে রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো রচনার তর্জমা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বাহির হইতে থাকে। এই অনুবাদকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হইতেছে পাটনা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। ১৯১১ হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে মডার্ন রিভিউতে তাঁহার বহু অনুবাদ মুদ্রিত হয়।...

১৯১০ সালের মার্চ মাসের মডার্ন রিভিউতে পান্নালাল বসু-কৃত 'ক্ষুধিত পাষাণ' এর অনুবাদ মুদ্রিত হয়।'[৪] স্মরণ করা যেতে পারে যে, এর পূর্বে ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে 'সমস্যা-পূরণ' গল্পটি ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমারের দ্বারা অনুবাদিত হয়ে মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এণ্ডরুজ লিখিত যে প্রবন্ধটি রামানন্দ মডার্ণ রিভিয়ুতে (অগস্ট ১৯১২—An Evening with Rabindra) প্রকাশ করেন সেটি তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজের লেখনী-নিঃসৃত সর্বপ্রথম রচনা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকারের মন্তব্য—

৩ সবুজপত্র ১৩৩৩ আশ্বিন পৃ ৬-৭

৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয়খণ্ড ১৯৭৭, পৃ ৩১৪

'তখন কবি সম্বন্ধে বাংলার বাহিরে কেহই বিশেষ কিছু জানিত না·—জীবনস্মৃতির ইংরেজি তর্জমা তখনো হয় নাই। কবি সম্বন্ধে কোনো বই প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং নানা কারণে এই প্রবন্ধটিকে সময়োপযোগী রচনা বলিতে হইবে।'[৫]

প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকা বঙ্গদেশে, বঙ্গের বাইরে ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে মডার্ণ রিভিয়ু রবীন্দ্রনাথের নানা রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেশে ও বিদেশে কবির অভিমত পৌছে দিয়েছে।

রামানন্দ শুধু রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারেই প্রয়াসী হন নি, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ প্রচারেও সাহায্য করেছিলেন। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। ১৯০৮ সালে রামানন্দ এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় স্থায়িভাবে চলে আসেন। ১৯১১ সালে তিনি 'রাজা' নাটকের অভিনয় উপলক্ষে ছেলেমেয়েদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রথমে আসেন। ১৯১৭ তে রামানন্দ শান্তিনিকেতনে বেশ কিছুদিনের জন্য বাস করতে আসেন। কনিষ্ঠ পুত্র মুলুকে তিনি এখানেই ভরতি করে দেন। মুলুর অকালবিয়োগের (১৯১৯ সেপ্টেম্বর) পূর্বেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। শান্তিনিকেতনে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা প্রবর্তনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হত—একথা রামানন্দ বলে গিয়েছেন। ১৯২৫-এ রামানন্দ বিশ্বভারতীর কলেজ-বিভাগে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন; তবে কোনো কোনো বিষয়ে মতান্তরের জন্য পদত্যাগ করলেও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের আদর্শ প্রচারে কখনোই ক্ষান্ত হননি। বস্তুত প্রবাসীর সর্বজন-পঠিত

৫ তদেব পৃ ৪৩৫

'বিবিধ প্রসঙ্গ'টিতে এ সম্পর্কে সংবাদ প্রায়শঃ দেখা যেত।[৬] রামানন্দের বিশেষ সতর্কতা ছিল রবীন্দ্রনাথের কার্যধারার যেন কখনোই ভুল ব্যাখ্যা না হয় এবং শান্তিনিকেতনের উৎসব-অনুষ্ঠান, শিক্ষাক্রম যেন সর্বজন-গোচর থাকে।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯১২তে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তখন রামানন্দ ছিলেন নেপথ্যে সক্রিয়। ১৯৩১-এ কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রশস্তি-গ্রন্থ 'Golden Book of Tagore' রামানন্দই সম্পাদনা করেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রপরিচয়-সভা প্রকাশিত জয়ন্তী-উৎসর্গ গ্রন্থে (১৩৩৮) রামানন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটি রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত তাঁর বহু রচনার অন্যতম ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

৬ দ্রষ্টব্য, সোমেন্দ্রনাথ বসু, প্রবাসী : সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, ১৯৭৬।

পত্র ১। 'প্রদীপ' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত (পৌষ ১৩০৪—মাঘ ১৩০৬) মাসিক পত্রিকা। 'প্রদীপ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত ১৩০৫ সালের আশ্বিন-কার্তিক মাসের যুগ্ম সংখ্যা সম্পর্কে। এই পত্রে উল্লিখিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ এবং নগেন্দ্র গুপ্তের গল্প 'হীরার মূল্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকার 'সাময়িক-সাহিত্য' বিভাগেও (অগ্রহায়ণ ১৩০৫ পৃ ৭৬৪-৬৫) প্রশংসা-সূচক মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'রাসায়নিক পরিভাষা' এই সংখ্যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

পত্র ২। জার্মান কাগজগুলির পরিচয় জানা যায় না। প্রবাসী পত্রিকার 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে বিভিন্ন বিষয় অনুবাদ করে পাঠাতেন।

পত্র ৩। 'ইংরেজি পত্রখানি'। এটি ৪ জানুয়ারি ১৯০৯-এ নিউইয়র্কের আইনজীবী M. H. Phelpsকে লিখিত পত্র। ভারতবর্ষের তৎকালীন সমস্যা কি ছিল এবং তিনি কিভাবে ভারতকে সাহায্য করতে পারেন জানতে চেয়ে ফেল্‌প্‌স্ রবীন্দ্রনাথকে পত্র দিয়েছিলেন। তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাসের ধারা ব্যাখ্যা করে ভারতের তৎকালীন সমস্যাটি উপস্থাপিত করেন। পত্রটি মডার্ন রিভিয়ু, অগস্ট ১৯১০-এ মুদ্রিত হয়।

লক্ষণীয়, এই পত্রটি যে-সময়ে লেখা হয় তখনও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত হন নি। কিন্তু তখনই আমেরিকার এই বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ চলেছে। অনুমান করা যায় ইলিনয়ে অধ্যয়নরত রথীন্দ্রনাথের সূত্রে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে ফেল্পস-এর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ

১৯০৬ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ইলিনয়ে ছিলেন। এই সময়ে ইলিনয়ে তিনি 'কসমোপলিটান' ক্লাব গঠন করেন এবং এর সভাপতি হন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এই রকম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য রথীন্দ্রনাথ 'অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবস্' গঠন করেন। সম্ভবত এরই সূত্র ধরে ফেল্পস্ ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্পর্কে কৌতূহলী হন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৯২২ সালে ফেল্পস্ ভারত ভ্রমণে এসে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথের কৃষি-ফার্ম পরিদর্শন করেছিলেন। ফেল্পসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের মুখ্যাংশ নিম্নে মুদ্রিত হল :

'... I need not dwell at length on the evils of the resulting caste system. ... It has largely contributed to the freedom from narrowness and intolerence which distinguishes the Hindu religion and has enabled races with widely different culture and even antagonistic social and religious usages and ideals peaceably side by side—a phenomenon which cannot fail to astonish Europeans who, with comparatively less jarring elements have struggled for ages to establish peace and harmony among themselves. But this very absence of struggle, developing into a ready acquiescence in any position assigned by the social system, has crushed individual manhood and has accumstod us for centuries not only to submit to every form of domination, but sometimes actually to venerate the power that holds us down. The assignment of the business

of government almost entirely to the military class reacted upon the whole social organism by permanently, excluding the rest of the people from all political co-operation, so that now it is hardly surprising to find the almost entire absence of any feeling of common interest, any sense of national responsibility, in the general consciousness of a people of whom as a whole it has seldom been any part of their pride, their honour, their dharma, to take thought or stand up for their country. This completeness of stratification, this utter submergence of the lower by the higher, this immutable and all-pervading system, has no doubt imposed a mechanical uniformity upon the people but has at the same time kept their different sections inflexibly and unalterably separate, with the consequent loss of all power of adaptation and re-adjustment to new conditions and forces....

The mechanical incompatibility and consequent friction between the American colonies and the parent country was completely done away with by means of a forcible severance. The external force which in the eightneenth-century-France stood to divide class from class had only to be overcome by *vis major* to bring emancipation to a homogeneous people. But here in India are working deep-seated social forces, complex internal reactions, for in no other country under the sun has such a juxtaposition of races, ideas and religions occured ; ··· At the sacrifice of her own political welfare she has through long ages borne this

great burden of heterogeneity, patiently working all the time to evolve out of these warring contradictions a great synthesis. ··· For us, there can be no question of blind revolution, but of steady and purposeful education. If to break up the feudal system and the tyrannical conventionalism of the Latin Church which had outraged the healthier instincts of humanity, Europe had needed the thought-impetus of the Renaissance and the fierce struggle of the Reformation, do we not in a greater degree need an overwhelming influx of higher social ideals before a place can be found for true political thinking? Must we not have the greater vision of humanity which will impel us to shake off the fetters that shackle our individual life before we begin to dream of national freedom? ····

We have begun to be dimly conscious of the value of the time we have allowed to slip by, of the weight of the clogging effete matter which we have allowed to accumulate, and are angry with ourselves. We have also begun to vaguely realize the failure of England to rise to the great occasion, and to miss more and more the invaluable co-operation which it was so clearly England's mission to offer.'

'চারুকে ··· পাঠাইয়াছি'। প্রবাসীর সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রেরিত এই তিনটি কবিতা 'প্রণতি' (যেথায় থাকে সবার অধম), 'সাধন' (ভজন পূজন সাধন আরাধনা), এবং 'রাজবেশ' (রাজার মত বেশে)। প্রবাসী,

ভাদ্র ১৩১৭ সালে প্রকাশিত।

পত্র ৪। 'বক্তৃতার দিনটা'—মৌখিক ভাষণ 'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা' বৃহস্পতিবার ১২ মাঘ ১৩১৭ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভায় কথিত। এটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩৩ শক এবং প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮ তে মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ৫। আনন্দ কে. কুমারস্বামীর (১৮৭৭-১৯৪৭) মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল বিংশ শতকের প্রথম থেকেই জাগ্রত ছিল। ১৯০৭ সালে তিনি যখন প্রথম ভারতভ্রমণে আসেন, তখন থেকেই হ্যাভেল প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা আর্ট স্কুল' এবং এর তৎকালীন সহ-অধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ১৯০৯ এর জানুয়ারিতে কুমারস্বামী জোড়াসাঁকোতে অবনীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে কিছুকাল বাস করেন। মনে হয় এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে।

কুমারস্বামী ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আভাসিত ভারতের নিজস্ব জীবনদর্শনকে জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করবার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি তর্জমা করতে আগ্রহী হন।

১৯১১-র মার্চ-এপ্রিলে মডার্ণ রিভিয়ুতে অজিত চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় কুমারস্বামীর অনুবাদিত 'Janmakatha' ও 'Biday' (Farewell) প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, কুমারস্বামী তাঁর 'Art and Swadeshi' (1911, Madras) গ্রন্থের 'Poems of Rabindranath Tagore' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী-

কৃত কয়েকটি রবীন্দ্র-কবিতার তর্জমা পরিমার্জনা করে ঐ গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এইগুলি হল: (১) The Touch Stone—খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর (২) The way of Salvation—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি (৩) The Meta-Physics of a Poet—যার খুসি রুদ্ধ চক্ষে (৪) Salvation—চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি (৫) The Guide—অদৃষ্টেরে শুধালেম, (৬) Death—ওগো মৃত্যু তুমি যদি (৭) The Creation of Woman—শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী (৮) Is it true—এ কি তবে সবই সত্য—ইত্যাদি। এই অনুবাদ প্রসঙ্গে কুমারস্বামী ঐ প্রবন্ধে বলেন: 'The translations convey only a shadow of the original poetry, they give only meaning, that in the songs themselves is inseparable from their music. Some are based on versions supplied to me by Mr. A. K Chakravarti, others on translations given to me by the author himself'.
(Ananda K. Coomaraswamy. Art and Swadeshi, p. 126).

ভগিনী নিবেদিতাকৃত 'কাবুলীওয়ালা'র ইংরেজি তর্জমা জানুয়ারি, ১৯১২ সালে মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত এবং ১৯১৬ সালে 'Hungry Stones and Other Stories' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।
'ছুটি'র তিনটি অনুবাদ হয়েছিল। নিবেদিতাকৃত তর্জমাটি পাওয়া যায় নি। 'Hungry Stones' (১৯১৬) গ্রন্থে 'ছুটি'র যে ইংরেজি অনুবাদটি 'The Home Coming' নামে সংকলিত হয়েছে সেটি

এণ্ড্রুজকৃত। 'ছুটি'র অপর অনুবাদ 'The School Closes' রজনীরঞ্জন সেনের 'Glimpses of Bengali Life (১৯১৩) গ্রন্থে সংকলিত।

পত্র ৬। 'তত্ত্ববোধিনীতে…চাহিয়া ছিলেন'। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা'।

'ইংরেজি গল্পের তর্জমা'—মাধুরীলতার অনুবাদিত এই গল্পটি 'মামাভাগ্নী'—প্রবাসীতে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সালে মুদ্রিত।

'ব্যাকরণের প্রথমাংশ'—'বাংলা ব্যাকরণের তির্যকরূপ'—প্রবাসীতে আষাঢ়, ১৩১৮ সালে মুদ্রিত।

'বোলপুরে কলেজ স্থাপন'—শান্তিনিকেতনে এই কলেজ বা 'শিক্ষাভবনে'র প্রতিষ্ঠা হয় আরও অনেক পরে' ১৯২৫ সালে। এর প্রথম অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দ্রঃ রামানন্দের পত্র ৪ ও ৫।

পত্র ৭। 'জীবনস্মৃতি'—প্রবাসীতে জীবনস্মৃতির প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩১৮ থেকে ধারাবাহিকরূপে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত।

'অত্যুৎসাহী শিক্ষক'—সম্ভবত কালীমোহন ঘোষ। দ্রঃ পত্র ৮

'অজিতের লেখাটা'—১৩১৮ সালে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত 'রবীন্দ্রনাথ'—এই বৎসর প্রবাসীর আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত।

'বড়দাদার লেখাটা'—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ'—যুগপৎ প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনীতে আষাঢ় ১৩১৮ থেকে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত।

পত্র ৮। 'অ জিতেরই লেখার'—পূর্বপত্রে উল্লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ।

'জীবনস্মৃতি'—১৩১৮ সালের ২৫ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে একটি ঘরোয়া আসরে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন এর 'বালক' অংশ পর্যন্ত রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই লেখাটিই সংশোধন করে, সম্পূর্ণ করে প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। জীবনস্মৃতির এই পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত খসড়াটি সীতাদেবীর কাছে রক্ষিত ছিল। বর্তমানে এটি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

পত্র ৯। 'প্রতীক্ষা'—সম্ভবত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্রের রচনা। প্রকাশকালে গল্প রচয়িতার নাম ছিল 'রতন'। এটি একটি ইংরেজি গল্প অবলম্বনে লিখিত এবং প্রবাসীতে আষাঢ় ১৩১৮ সালে প্রকাশিত।

'নিজের সম্পাদকী দপ্তরের'—রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বৈশাখ ১৩১৮ থেকে চৈত্র ১৩২১ পর্যন্ত।

পত্র ১১। 'হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ৭ কার্তিক, ১৩১৮ সালে রিপণ কলেজ হলে পঠিত হয়। এটি প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সালে মুদ্রিত ও পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ১২। 'নিবেদিতা'—নিবেদিতার মৃত্যুতে (অক্টোবর ১৯১১) রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য, প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সালে মুদ্রিত।

পত্র ১৩। 'জয় পরাজয়ের তর্জমাটি'—যদুনাথ সরকারের অনুবাদিত 'Victorious in Defeat,' মডার্ণ রিভিয়ুতে, ডিসেম্বর ১৯১১ সালে মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথকৃত এর অপর তর্জমা 'The Victory'—

'Hungry Stones and Other Stories' (১৯১৬) গ্রন্থে সংকলিত।

'গোপন রাজদণ্ডপাত'—নবেম্বর ১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গ-আসাম সরকার এক গোপন ইস্তাহারে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়কে সরকারী কর্মচারীদের পুত্রদের পক্ষে অনুপযোগী বলে ঘোষণা করেন। এই সম্পর্কে মডার্ণ রিভিয়ু, ফেব্রুয়ারি, ১৯১২ এবং Myron H. Phelps এর বিবৃতি, অমৃতবাজার পত্রিকা, ২, ফেব্রুয়ারি ১৯১২ দ্রষ্টব্য।

পত্র ১৪। 'দৌহিত্রের', —নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১১-১৯৩২)

'রূপ ও অরূপ'—প্রবাসী পৌষ ১৩১৮তে মুদ্রিত। 'হেমলতা বৌমার কবিতাটি'—কবিতাটি 'মহান', প্রবাসীর উপরিউক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত।

পত্র ১৫। 'ধর্মশিক্ষা প্রবন্ধটি'—সিটি কলেজে একেশ্বরবাদীদের সম্মিলনীতে ১১ পৌষ সকালে এটি পঠিত হয় এবং 'তত্ত্ববোধিনী', মাঘ ১৩১৮ সালে মুদ্রিত হয়। পরে এটি পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত ও 'সঞ্চয়' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

পত্র ১৬। 'বড়দিদির লেখা'—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীর লেখা 'পিতৃস্মৃতি' প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮ সালে মুদ্রিত হয়। 'ধর্মের অধিকার' ও প্রবাসীর উক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৮। 'আমার মেয়াদ ··· যাইতে হইবে।' এই অনবকাশের কারণ,—এই বৎসর ১৯ মার্চ তারিখে কবির বিলাত যাত্রা স্থির হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই যাত্রা পণ্ড হয়। পরে ২৪ মে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কবির

প্রথম বিলাত যাত্রা ঘটেছিল উচ্চশিক্ষার প্রয়াসে ১৮৭৯ সালে। দ্বিতীয়বার ১৮৯০ সালে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। এবারে এই তৃতীয়বার বিলাত যাওয়ার মূলে একদিকে ছিল বাইরে বেরিয়ে পড়বার জন্য অন্তরের দুর্নিবার স্পৃহা অন্যদিকে তাঁর গল্প ও কবিতার তর্জমা পাঠে মুগ্ধ শিল্পী রোটেনষ্টাইনের একান্ত আগ্রহ। বস্তুত, রোটেনস্টাইনের আগ্রহে ও অনুরোধে লণ্ডন থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও প্রমথলাল সেন রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডন যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এই সঙ্গে তাঁরা জানান যে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন গেলে তাঁর 'মনের মত' লোকের অভাব হবে না।

দ্র: W. Rothenestine, Men and Memories p. 263

পত্র ২৯। 'পাঠ্যবহিটা'—পাঠসঞ্চয়, ১৩৩৯ সালে ব্রাহ্ম মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত।

'আর একটি বই'—'গল্প চারিটি', 'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা', 'দর্পহরণ' ও 'মাল্যদান' এর সমষ্টি ; এটি আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮ মার্চ ১৯২২-এ প্রকাশিত।

'সাক্ষ্যদান'—'আটটি গল্প' গ্রন্থে (১৩১৮, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত) গল্পটির নাম ছিল 'সাক্ষী'। গল্পগুচ্ছে এর পুনর্নামকরণ হয় 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'।

পত্র ২৩। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস ·· দিয়াছি'—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'। পরবর্তী পত্রপরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ২৪। 'শিক্ষা সম্বন্ধে ··· লিখিয়াছিলাম'—এই লেখা 'আমেরিকার একটি বিদ্যালয়'—প্রকাশ, প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৬।

'প্রবন্ধ পাঠ সভায় ··· ভাবনার কথা।' এই প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষে ৩ চৈত্র ১৩১৮ সালে ওভার্টুন হলে পঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন আশুতোষ চৌধুরী। এ বিষয়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সংবাদ এইরূপ: 'A meeting of the Chaitanya Library will be held in the Overtoune Hall, on Saturday next at 5-30 P.M. when Babu Rabindranath Tagore will read a paper on "The Evolution in Indian History" Mr. Justice Chowdhury will preside' (The Statesman, Tuesday, March 14, 1912).

এই প্রবন্ধটির যদুনাথ সরকারকৃত ইংরেজি অনুবাদ 'My Interpretation of Indian History'—মডার্ন রিভিয়ু, অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯১৩-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ সম্পর্কে নানারূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯ এ মুদ্রিত হয়।

এই প্রবন্ধটি ১৩২৩ সালে 'পরিচয়' গ্রন্থে প্রথম সংকলিত হয়, পরে 'সমাজ' (১৩৪৪ সং) ও 'ইতিহাস' (১৩৬২) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই প্রবন্ধের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ পুনরায় আলোচনা করেন 'A Vision of India's History'-তে। এটি এপ্রিল ১৯২৩-এ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে ও পরে ১৯৫১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পত্র ২৫। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে ১০ বৈশাখ (১৩১৯) মঙ্গলবার

'রাজা ও রাণী' অভিনীত হয়েছিল। রামানন্দ শাস্ত্রী ও সীতাদেবীকে নিয়ে এই অভিনয় দর্শনে এসেছিলেন। দ্রঃ সীতাদেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ. ১০৪, প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন পৃ. ৫০৪।

পত্র ২৬। তৃতীয়বার বিলাতযাত্রার জন্য কবি বোম্বাই রওনা হন ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (১২ মে ১৯২৪) সালে। বোম্বাই থেকে বিলাতের জাহাজ ছেড়েছিল ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (২৭ মে ১৯২৪) সালে।

পত্র ২৭। ১৬ জুন (১৯১২) লণ্ডনে পৌছানোর কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনের বাড়ির কাছে হাম্পস্টেডহীথ অঞ্চলে বাসা ভাড়া করেন। অল্পদিনের মধ্যেই রোটেনস্টাইনের বাড়িতে তিনি ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের সঙ্গে পরিচিত হন। রোটেনস্টাইনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস্ স্টফোর্ড ব্রুকস, ব্রাডলে, মেসফিল্ড, আর্নেস্ট রীস, ফক্স ষ্ট্রাঙ্গওয়েজ, স্টার্জ মুর, রবার্ট ব্রিজেস, এজরা পাউণ্ড, ঈভলীন আণ্ডারহিল, এণ্ড্রুজ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এঁদের নিয়ে রোটেনস্টাইন তাঁর বাড়িতে গীতাঞ্জলির কবিতা পাঠের এক সান্ধ্য আসর বসান।

এঁদেরই উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকের ইংরেজি তর্জমা হয়। জর্জ ক্যালডেরন 'দালিয়া' গল্পের নাট্যরূপ দান করেছিলেন 'The Maharani of Arakan' নামে। অ্যালবার্ট হলে ৩১ জুলাই এটি অভিনীত হয়েছিল। এই উপলক্ষে রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। এরপর ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় 'The Post Office' (ডাবলিন

অ্যাবি থিয়েটারে অভিনীত মে, ১৯১৩), 'Chitra,' 'Malini' এবং 'The King of the Dark Chamber'। পাণ্ডুলিপি থেকে এই অনুবাদিত নাটকগুলি কবি নিজেই শ্রোতাদের পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

"Meanwhile Tagore was translating some of his own plays, one of which, 'The Post Office,' was acted later in Dublin, ... I most admired 'Chitra' and next to this 'The king of the Dark Chamber' which he read one evening to a number of friends at our Hampstead house'—W. Rothenstein, Men and Memories Vol. 2, (1932) p 264.

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানান যে এই সময়ে ইণ্ডিয়া সোসাইটির সেক্রেটারি ফক্স স্ট্রাঙ্গওয়েজ অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজ থেকে রবীন্দ্রনাথকে কোন সম্মানসূচক উপাধি দেওয়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু ভারতের তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাধিকার দিতে অসম্মত হওয়ায় সে প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। রোটেনস্টাইনই 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'কে রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বকৃত তর্জমাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুরোধ করেন। ইণ্ডিয়া সোসাইটি এই পুস্তক প্রকাশে সম্মত হলে এই অনুবাদগুলি নিয়ে ইংরেজি গীতাঞ্জলির পরিকল্পনা হয়। এরপর রোটেনস্টাইনের অনুরোধে ইয়েটস এর ভূমিকা লিখে দেন। ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে 'Gitanjali' বা 'Song Offerings' এর ৭৫০টি কপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হল ১০ নভেম্বর ১৯১২ সালে। এর মধ্যে মাত্র ২৫০ খানা ছিল

বিক্রয়ের জন্য।

'দুইটি লেখা' — লণ্ডন যাত্রার পথে জাহাজে ১৬ জ্যৈষ্ঠ লিখিত 'জলস্থল' এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯-এ লিখিত 'দুই ইচ্ছা' শ্রাবণ ১৩১৯ সালে প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

পত্র ২৯। 'পাঠসঞ্চয়'—১৩১৯ সালে ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশ সরকারের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এটি ১৯, ২০, ২৩ ও ২৪ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত পাঠ্যবই। বইটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্যতম বাংলা পাঠ্যগ্রন্থরূপে নির্বাচনের জন্য পেশ করা হয়, কিন্তু অনুমোদিত হয়নি।

'সুরুলের বাড়িটি'—বাড়িটিকে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা হয়েছিল। গৃহপ্রবেশ হয় ১ বৈশাখ ১৩২১-এ। পরে শিলাইদহস্থিত রথীন্দ্রনাথের কৃষি-গবেষণাগারটি এখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এটি বর্তমানে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কেন্দ্র।

'গীতাঞ্জলির ··· হইয়াছে'। রোটেনস্টাইন অঙ্কিত কবির প্রতিকৃতিসহ ইংরাজি গীতাঞ্জলি ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

GITANJALI

(SONG OFFERINGS)

BY

RABINDRA NATH TAGORE

A COLLECTION OF PROSE TRANSLATIONS MADE
BY THE AUTHOR FROM THE
ORIGINAL BENGALI

WITH AN INTRODUCTION BY

W. B. YEATS

LONDON
PRINTED AT THE CHISWICK PRESS FOR
THE INDIA SOCIETY
1912

Gitanjali প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

GITANJALI

(SONG OFFERINGS)

BY

RABINDRANATH TAGORE

A COLLECTION OF PROSE TRANSLATION MADE
BY THE AUTHOR FROM THE
ORIGINAL BENGALI

WITH AN INTRODUCTION BY
W. B. YEATS.

LONDON
PRINTED AT THE CHISWICK PRESS FOR
THE INDIA SOCIETY
1912

উল্লিখিত প্রশংসিত সমালোচনা ঐ বৎসর ৭ নভেম্বর 'Times Literary Supplement' পত্রিকায় এবং ৬ নভেম্বর 'Nation' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৩০। 'Race Conflict'—বক্তৃতাটির প্রকাশ মডার্ণ রিভিয়ু, এপ্রিল, ১৯১৩ সালে। অজিত চক্রবর্তীকৃত এর অনুবাদ 'জাতিসংঘাত' প্রবাসীতে এবং প্রিয়ংবদা দেবীকৃত অনুবাদ 'জাতিবিরোধ' 'ভারতী' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সালে মুদ্রিত হয়েছিল।

অয়কেনের নিকট থেকে সমাদর লাভের বিবরণ প্রাপ্তব্য 'রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী' প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪২। এই চিঠিতে উল্লিখিত অয়কেনের পত্রটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় ভাদ্র ১৩৪৯ সালে মুদ্রিত হয়।

Abercrombie কৃত গীতাঞ্জলির সমালোচনা 'ম্যাঞ্চেষ্টার' গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ১৪ জানুয়ারি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

এই পত্রে উল্লিখিত অন্যান্য ইংরেজি বক্তৃতার প্রসঙ্গ পরবর্তী ৩১ ও ৩২ সংখ্যক চিঠিতেও আছে। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত এই প্রবন্ধগুলি পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে লণ্ডনে ক্যাক্সটন হলে যে ১৯১৩ সালে পঠিত হয়। এইগুলি এবং আরও দুটি প্রবন্ধ 'Sadhana' (ম্যাকমিলান ১৯১৩) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।

পত্র ৩২, ৩৩। এই পত্রদ্বয়ে উল্লিখিত প্রবন্ধ সম্পর্কে পূর্বের পত্র-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ৩৫। 'কণিকার তর্জমা'—'Poems' নামে অনুবাদিত 'কণিকার' (১৮৯৯) পঁচিশটি কবিতা মডার্ণ রিভিয়ুতে নভেম্বর ১৯১৩ সালে মুদ্রিত হয়। এই কবিতাগুলির কয়েকটি 'Stray Birds' (১৯১৬) গ্রন্থে সংকলিত।

'Ernest ··· পাইয়াছি।' রীহস্ ও এণ্ড্রুজের পত্রের তারিখ যথাক্রমে ১১ এবং ২৯ অক্টোবর, ১৯১৩। এগুলি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ 'Chitra' রামানন্দের ভূমিকাসহ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে লণ্ডন থেকে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৩৬। রবীন্দ্রনাথের কাছে লিখিত অ্যাণ্ডারসনের একাধিক পত্রে 'চোখের বালি' তাঁর প্রিয় গ্রন্থরূপে উল্লিখিত হয়। ১২ মে ১৯১৩-তে তিনি রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন তাতে জানা যায় যে 'Asiatic Quarterly'-তে প্রকাশের জন্য 'চোখের বালি' সম্পর্কে তিনি একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি 'CHOKHER BALI' নামে 'Asiatic Quarterly'-র জুলাই (১৯১৩) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এতে মূল উপন্যাসটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পরে পরিচিতি হিসাবে মূল উপন্যাসের শেষাংশ থেকে কিছু অংশ—প্রবাসযাপনের পর মহেন্দ্রর প্রত্যাবর্তন, রাজলক্ষ্মীর আসন্ন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আশা ও মহেন্দ্রর পুনর্মিলন পর্যন্ত তর্জমা করে দেওয়া হয়। উপসংহারে লেখক জানান: 'I am conscious that this is but a rough rendering of a poet's prose, and it needs some daring to attempt a translation of the work of one who can put his own verses into English which has almost all the charm of the original ··· I do not pretend that my version retains any reflection of the simple charm of style of the original. But it may serve to show in what fashion Mr. Tagore deals with the pathos of life and death, common to all humanity in East and West ··· A musician, a critic, an essayist, a poet, a dramatist, a novelist, a philosopher, a grammarian, he is also as his poems show, a

mystic, filled with a strong sense of the riddle of life'. —Asiatic Quarterly, July 1913.

পত্র ৩৭, ৩৮। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত 'চোখের বালি'র ইংরেজি তর্জমা 'Eye Sore' মডার্ন রিভিয়ুতে জানুয়ারি ১৯১৪ থেকে ধারাবাহিকরূপে ডিসেম্বর ১৯১৪ পর্যন্ত প্রকাশিত।

পত্র ৪০। অচলায়তন নাটকখানির রচনাকাল ১৩১৮। শান্তিনিকেতনে এর প্রথম অভিনয় হয় ১৩২১ এর ১৩ বৈশাখ। গ্রীষ্মের ছুটির জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পূর্বে সি. এফ. এণ্ড্রুজের সংবর্ধনা উপলক্ষে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং পিয়ার্সনও যোগদান করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য, এই অভিনয় উপলক্ষেই শিল্পী নন্দলাল প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। দ্র: The Ashram, Vol. I. No. 10—published from Brahma Vidyalaya, Santiniketan, p. 39., প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ পৃ. ১৫২-১৫৩।

পত্রে উল্লিখিত '১৩১৫' অনবধানজনিত।

পত্র ৪২। 'ইংরেজি কবিতা'। কবিতাটি 'Hymn', মডার্ন রিভিয়ুতে নভেম্বর ১৯.৪ সালে মুদ্রিত।

'প্রবাসীর জন্য···পারিবেন।' এই গানগুলির আটটি গান 'শরতের গান' নামে প্রবাসীতে কার্তিক ১৩২১ সালে প্রকাশিত। রচনাকাল ৬ ভাদ্র—১৪ আশ্বিন ১৩২১। শেষের গানটি (আলো যে আজ গান করে) শান্তিনিকেতনে রচিত। অন্যগুলি সুরুলে। অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে 'গীতিগুচ্ছ' নামে আরও চব্বিশটি গান প্রকাশিত হয়। রচনাকাল শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২১, স্থান সুরুল ও

শান্তিনিকেতন।

পত্র ৪৪। উল্লিখিত গানটির তর্জমা 'Thou hast come again to us in the burst of a sudden storm',—মডার্ণ রিভিয়ুতে, ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে প্রকাশিত। এইসঙ্গে কবিতাটি অবলম্বনে অসিতকুমার হালদারের অঙ্কিত একটি চিত্রও মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ৪৫। কবিতাটি (জানি আমার পায়ের শব্দ) ২৭ মাঘ ১৩২১-এ পদ্মাতীরে রচিত। এটি 'প্রেমের বিকাশ' নামে প্রবাসীতে চৈত্র ১৩২১ সালে মুদ্রিত ও পরে বলাকা কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।

'মার্কাস অরেলিয়সের আত্মচিন্তা'—গ্রীক ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বঙ্গানুবাদ করেন। এটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৩১৪ ফাল্গুন থেকে ১৩১৬র ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে। এ ছাড়া মূল গ্রীক থেকে 'মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা'র রজনীকান্ত গুহকৃত বাংলা অনুবাদ রামানন্দ কর্তৃক ১৩২০ সালে প্রবাসী কার্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির পরিচয় ও সমালোচনা প্রবাসীর (ভাদ্র ১৩২০, পৃ ৫৮৩) পুস্তক পরিচয় বিভাগে মুদ্রিত হয়েছিল।

সম্ভবত রজনীকান্ত গুহের এই গ্রন্থ সম্পর্কেই রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি সমালোচনা চেয়েছিলেন।

পত্র ৪৬। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা' ও 'তোড়া' কবিতা দুটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবিতা দুটি যথাক্রমে 'Champa' এবং 'A Posy' নামে মডার্ণ রিভিয়ু নভেম্বর ১৯১৫তে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক হিসাবে পরিচিতি

ছিল 'Translated by a Poet'। কবিতা দুটি পরে কবির 'Lover's Gift and Crossing' (1918) গ্রন্থে স্বীকৃতিসহ সংকলিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দুটি কবিতার রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি তর্জমা ওই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৩ এবং ৪৬।

পত্র ৪৭। 'ছাত্রদের এই প্রবন্ধটা', এটি 'Indian Students and Western Teachers', মডার্ণ রিভিয়ুতে এপ্রিল ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক E F. Oaten ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত হলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তদুপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধটি 'সবুজপত্রে' (চৈত্র ১৩২২) মুদ্রিত হয়। এটি অবলম্বনে উপরিউল্লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধটি রচিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত 'জীবনস্মৃতি'র তর্জমা মডার্ণ রিভিয়ুতে, জানুয়ারি ১৯১৬ থেকে ডিসেম্বর ১৯১৬ পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে 'My Reminiscences' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৪৮। 'ছাত্রশাসনের'—পূর্বপত্রে উল্লিখিত প্রবন্ধ 'ছাত্রশাসনতন্ত্র'।

পত্র ৫০। উল্লিখিত 'অভিভাষণ' চিত্তরঞ্জন দাশের। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ উগ্র-জাতীয়তাবিরোধী বক্তৃতাগুলির সমালোচনা করেছিলেন।

পত্র ৫১। 'আগামীকাল…আলোচনা করবেন।' এই আলোচনা সভায় 'Home University Library' এবং 'Cambridge

Manuals of Science and Literature' এর আদর্শে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়। এই সভায় গৃহীত এতৎসম্পর্কিত বিশদ নিয়মাবলী প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৪-এ মুদ্রিত হয়। পরিকল্পিত 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' ছয়ভাগে বিভক্ত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ প্রধান উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহক নিযুক্ত হন। এই ছয়টি বিভাগ ও তাহার সম্পাদকগণের পরিচয়:

(ক) দর্শন—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(খ) বিজ্ঞান—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রশান্ত মহলানবীস

(গ) ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি—যদুনাথ সরকার

(ঘ) সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস এবং ভাষা—প্রমথ চৌধুরী

(ঙ) কলা—অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(চ) শিক্ষাবিজ্ঞান—অস্থায়ী সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধারণ সম্পাদক যদুনাথ সরকার। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ. ৪২২-২৩।

উল্লেখ্য, নানা কারণে এই পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ১৩৫০ সালের ১ বৈশাখ গ্রন্থন-বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রকাশিত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ও উদ্যোগে প্রায় অনুরূপ উদ্দেশ্যে 'লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালে। এ সম্পর্কে ৯৩ সংখ্যক পত্র পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫২। 'কন্‌গ্রেসের সময় ··· লেকচার দিতে হবে।' এই বক্তৃতা

শেষ পর্যন্ত দিতে হয়নি। তবে কলকাতায় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি কবিতা 'Thou hast given us to live' এবং 'Our voyage is begun Captain'—পাঠ করেছিলেন।

'আমার ধর্ম'—'প্রবর্তক পত্রিকায় (বর্ষ ২, সংখ্যা ৯) প্রকাশিত 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে 'আমার ধর্ম' লিখিত এবং সবুজপত্র আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ ও প্রবাসী পৌষ ১৩২৪-এ প্রকাশিত হয়। পরে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে সংকলিত হয়।
রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে 'আমার ধর্মে'র ইংরেজি অনুবাদ করতে অনুরোধ জানান। দ্রঃ রামানন্দ পত্র সংখ্যা ২। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকৃত এর কোন পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাওয়া যায় নি। 'আমার ধর্মে'র ইন্দু দত্ত কৃত অনুবাদ 'My Religion' 'A Tagore Testament' (Meridian Books, London 1953) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

'আপনি যদি ... হত না'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোন অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিন-শ টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, না-ও যদি পারেন আমি কোনো দাবি করব না। এত বড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম, গোরা আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারও ফাঁক দিইনি।' প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, প্রভাতরবি 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৪৪।

পত্র ৫৩। 'ঐ গানটিকে'—'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি। এটি প্রবাসী ভাদ্র ১৩২৪ সালে মুদ্রিত হয়। দ্রঃ রামানন্দ পত্র-৩। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"র ইংরেজিটা,—"কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"র

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত তর্জমা 'Thou Shalt Obey' মডার্ন রিভিয়ু, সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে মুদ্রিত। এর অপর অনুবাদ 'The Master's Will Be Done,' 'Towards Universal Man' (১৯৬১) গ্রন্থে সংকলিত।

স্মরণ করা যেতে পারে যে প্রথমোক্ত তর্জমাটি প্রকাশিত হলে তৎকালীন শাষকসম্প্রদায় বিব্রত বোধ করেছিলেন। এজন্য তাদের অনুগ্রহপুষ্ট ইংরেজি কাগজগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের 'অপরিণত রাজনৈতিক বুদ্ধির' প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছিল। এর জবাবে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার গভীরতার প্রমাণ হিসাবে নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'A well wisher of the Empire' এই ছদ্মনামে 'Sir Rabindranath and Politics' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি স্টেটস্‌ম্যান কাগজে ৭ অক্টোবর ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। এর ফলে ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শনিবারের চিঠি আশ্বিন ১৩৪৮ (পৃ. ৮৫০-৮৫১)।

পত্র ৫৪। 'লেখা তো···চলেচে'—'ছোটো ও বড়ো' নামে প্রবন্ধটির রচনাকার্য।

'শচীন্দ্র দাসগুপ্ত···বন্ধনের'

রংপুরের উকিল যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র শচীন্দ্র দাশগুপ্ত পুলিশী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার কারণ বর্ণনা করে তিনি যে চিঠি লিখে গিয়েছিলেন সংবাদপত্রে তা প্রকাশের অপরাধে তার ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ঐ চিঠি প্রবাসীতে কার্তিক ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৫৫। 'প্রবন্ধটি'—'এটি ছোটো ও বড়ো', প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সালে মুদ্রিত, পরে কালান্তরে সংকলিত।

'এইটেকেই ইংরেজি করে'—এই প্রবন্ধটির সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত অনুবাদ 'The Small and the Great' মডার্ণ রিভিয়ু, ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। এটি পরিমার্জিতরূপে ঐ বৎসর বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকার মে-জুলাই সংখ্যায় 'The Great and Small' নামে মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটির রবীন্দ্রনাথকৃত সংক্ষিপ্ত ও সংশোধিত অনুবাদ 'India's Problem'—মডার্ণ রিভিয়ুতে, জানুয়ারি ১৯৪০ সালে প্রকাশিত। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে' প্রবন্ধটির কোনো তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

পত্র ৫৭। 'দু তিনখানা গরম চিঠি' জালিয়ানওয়ালাবাগে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন। এ ব্যাপারে ২৪ ও ২৫ এপ্রিল (১৯১৯) তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের দু'খানা চিঠি 'Visva-Bharati News'—মে, ১৯৬৯ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। ৫৭ সংখ্যক পত্রে উদ্ধৃত ইংরেজি চিঠিখানা মডার্ণ রিভিয়ু, মে ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৫৮। 'ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন সংবাদ'—প্রকৃতপক্ষে 'গান্ধারীর আবেদন' অভিপ্রেত। এটি ফাল্গুন ১৩০৪ সালে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে কবি কর্তৃক পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথকৃত এর ইংরেজি তর্জমা, 'Mother's Prayer' মডার্ণ রিভিয়ুতে জুন ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়। মডার্ণ রিভিয়ুর মুদ্রিত পাঠ থেকে কিছু পরিবর্তিত আকারে এটি প্রথমে 'Fugitive'

(For Private Circulation 1919) শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত হয়। পরে ম্যাকমিলানের 'Fugitive' (1921) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

পত্র ৫৯। 'ঘরে বাহিরের' (১৯১৬) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত তর্জমা 'Home and the World'। এর সমালোচনা যেসব বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: The Book Monthly (July 1919), The York Shire Post (July 1919), The Evening Sunday New York (24th June 1919), Illustrated London News (July 1919).

উল্লেখ্য, পাশ্চাত্য সমালোচকেরা উপন্যাসটিকে বিচার করেছেন, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে। এই প্রসঙ্গে Nation (August 1919) পত্রিকার মন্তব্য সংকলনযোগ্য: '.. as we read, we become more and more convinced ... that the real intention of the book is not at all to present a picture of the Swadishi movement, or of a Bengal Household or even of a mystic, a passionate and foolish woman and a rhetorical self-seeker. It is intended partly as a parable to ourselves and partly upon the true meaning and aim of life .... This philosophy is anti-nationalist, whether in the big nation or the small, the oppressor or the oppressed, and it speaks much for Mr. Tagore's wisdom and courage that he has not hesitated to apply it to his own country as well as the country of the Rowlatt Bills.

... Man's history Nikhil's old tutor declares, has to be built by the united effort of all the races.

in the world, and therefore 'this selling of conscience for political reasons—this making a fetich of one's country, won't do. I know that Europe does not at heart admit this, but there, she has not the right to pose as our teacher.' It is a hard lesson to learn for greed is always united to romanticism, but unless we learn it, we perish.'

পত্র ৬০, ৬১। 'মুলুর মৃত্যু'—রামানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র মুলু (মুক্তিদা প্রসাদ) ছিলেন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯ ভাদ্র ১৩২৬-এ কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। শান্তিনিকেতনে মুলুর শ্রাদ্ধবাসরে ৪ আশ্বিন ১৩২৬-এ রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষণটি 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা অগ্রহায়ণ ১৩২৬-এ মুদ্রিত হয়। এটি পরে রামানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত মুলু সম্পর্কিত স্মারকগ্রন্থ 'প্রসাদ' এর অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান সংকলনের পরিশিষ্টে এটি সংযুক্ত হয়েছে।

পত্র ৬২। 'শিলং প্রভৃতি ঘুরিয়া'—দ্রঃ কালিদাস নাগকে লিখিত, ৮ সংখ্যক পত্র।

'Education and War'—এনাতোল ফ্রাঁসের এই বক্তৃতাটি মডার্ণ রিভিয়ুতে, ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে সংকলিত হয়েছে। দিনেন্দ্রনাথকৃত এর তর্জমা 'শিক্ষার আদর্শ', 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৬৩। 'Autumn Festival'— 'শারদোৎসবে'র রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ, 'মডার্ণ রিভিয়ুতে নভেম্বর ১৯১৯ সালে প্রকাশিত।

পত্র ৬৪। সাংলি— পূর্বতন মহারাষ্ট্রের করদ রাজ্য। এটি অধুনা বোম্বাই ও মহীশূর রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত ধারওয়ার 'বেলগাঁও',

সোলাপুর, বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চল। দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নব জ্ঞান-ভারতী, ভৌগোলিক, (১৯৫৭), ৫১৮

সাংলির রাণীর ভগিনী ও তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত পটবর্ধন জানুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন কি না জানা যায় নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বৎসর মার্চ মাসে সাংলির উইলিংডন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীপরশুরাম লছমন বৈদ্য বিশ্বভারতীতে 'অভিধম্ম' অধ্যয়নের জন্য যোগদান করেন।

পত্র ৬৫। 'প্রার্থনামন্ত্র তিনটি': (১) Light the signal, Father, (২) Yet I can never believe (৩) If it is thy will—এইগুলি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের যথাক্রমে ৫৯ (আমরা কোথায় আছি), ৬২ (তব চরণের আশা) এবং ৪৮ (আঘাত সংঘাত মাঝে) সংখ্যক কবিতার ইংরেজি তর্জমা, মডার্ন রিভিয়ুতে, জানুয়ারি ১৯২০ সালে মুদ্রিত। কবিকৃত এই তর্জমাত্রয় নিতান্তই আক্ষরিক অনুবাদ ছিল না।

প্রথম দুটি তর্জমা কৃষ্ণ কৃপালানি-সম্পাদিত 'Poems—Rabindranath Tagore, (১৯৪২) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

পত্র ৬৬। উল্লিখিত এণ্ড্রুজের পত্রটি সম্ভবত পূর্ব আফ্রিকা থেকে ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এণ্ড্রুজের পত্র। ফেব্রুয়ারি ১৯২০ মাসের মডার্ন রিভিয়ুর 'Notes' অংশে উদ্ধৃত এই দুটি চিঠির দ্বিতীয়টিই সম্ভবত এই পত্রের অভিপ্রেত।

পত্র ৬৭, ৬৮। 'মুলুর সম্বন্ধে একটা লেখা'— এটি 'ছাত্র মুলু', স্মারক গ্রন্থ 'প্রসাদে' সংকলিত।

'কালীমোহনের লেখাটি'— 'মুক্তিদাপ্রসাদ', 'শান্তিনিকেতন'

পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক যুগ্মসংখ্যা ১৩২৬-এ মুদ্রিত ও পরে 'প্রসাদ' গ্রন্থে সংকলিত।

পুস্তিকা—মুলুর মৃত্যু উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'প্রসাদ'।

'একটি লেখা'— 'ছাত্রমুলু', এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে।

পত্র ৭০। 'পুস্তিকাটি'—'The Centre of Indian Culture'। ১৯১১ সালের ১০-১২ মার্চ রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজের অন্তর্গত আদৈয়ের ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'The Centre of Indian Culture' প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল। এটি 'The Society for the Promotion of National Education, Adyar', Madras (১৯১৯) থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রবন্ধটি ১৯২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ৩ মার্চ তারিখের Young Indiaতে (Vol II, No 8 এবং 9) সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। Young India তে এটি প্রকাশ করবার উপলক্ষ সম্বন্ধে ঐ পত্রিকার ২৫ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় (Vol II, No 8) সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয়: It is a happy augury that the leaders of Indian thought are directing their efforts towards determining what system of education would best help the development of the national being. Philosophers, historians, scientists, sociologists, captains of Industry and politicians must all combine in arriving at a proper solution of this all-important question. But it is given to the poet to look into the future and draw a prophetic picture for the

direction of the rest. The poet is able to sense things which others may not arrive at even by close search and subtle reasoning. Dr. Tagore has given his best thought and energy to the solution of the educational problem. His thoughts therefore command respect and careful consideration at the hands of every earnest worker. His thoughts on National education he has put together in a beautiful pamphlet under the title 'The Centre of Indian Culture.' He has dealt with the problem in all its phases in his usual poetic style wherever simile or metaphor comes with the force of an irrestible argument and the joy of an agreeable surprise. We wish our readers will not miss the delight and education which this pamphlet will yield to them. The only way open to us to tempt our readers to go to the original is rudely to tear a few sentences from their poetic setting and string them together into a summary which our readers will find elsewhere.'

"কর্ণকুন্তী সংবাদের' ইংরেজি— 'রবীন্দ্রনাথকৃত কর্ণকুন্তী সংবাদের ইংরেজি তর্জমা 'Karna and Kunti' এপ্রিল ১৯২০ সালের মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত হয় ও পরে 'Fugitive' (ম্যাকমিলান ১৯২২) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

উল্লেখ্য, টমাস স্টার্জ মুর 'কর্ণকুন্তী সংবাদে'র তর্জমা করেছিলেন 'The Foundling Hero'। এটি তাঁর 'Collected Works' (১৯৩১)-এর অন্তর্ভুক্ত।

'নৌকাডুবি'র ইংরেজি তর্জমা করা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জে. ডি. অ্যাণ্ডারসন তাঁর ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন 'as a matter of preference (I may be wrong) I had rather do চোখের বালি or best of all গোরা। Personally, I prefer the latter among all your novels. But it is long and I know not why, more difficult than your other books.'

প্রকৃতপক্ষে গোরার ইংরেজি তর্জমা করেন উইলিয়াম পিয়ারসন। এটি মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে জানুয়ারি ১৯২৩ থেকে ডিসেম্বর ১৯২৩ পর্যন্ত মুদ্রিত এবং ১৯২৪ সালে গ্রন্থকারে (ম্যাকমিলান) প্রকাশিত হয়।

পত্র ৭৩। 'একটি কাঁথা গোছের প্রবন্ধ'—এটি সম্ভবত রামানন্দ-সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ 'Welfare' এর জন্য। 'Welfare' (জানুয়ারি ১৯২৩) থেকে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধের কিছু অংশ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩-এর মডার্ণ রিভিয়ুতে উদ্ধৃত হয়েছে। 'তিনখানা কাগজের বোঝা'—রামানন্দ-সম্পাদিত এই তিনটি কাগজ— 'প্রবাসী' (১৯০১) 'Modern Review' এবং 'Welfare' (১৯২৩)।

পত্র ৭৪। 'মুক্তধারা' নাটকটি প্রবাসী পত্রিকায় বৈশাখ ১৩২৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই একই সময়ে এটি ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৭৫। 'যক্ষপুরী'—পাণ্ডুলিপিতে এর নাম ছিল 'নন্দিনী'। পরে সংশোধিতরূপে 'রক্তকরবী' নামে প্রবাসীতে আশ্বিন ১৩৩১ সালে মুদ্রিত হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৩৪ সালে কলকাতায় 'নাট্যনিকেতন' রঙ্গমঞ্চে 'The Tagore Dramatic Group' কর্তৃক নাটকটির

প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

'AE........ প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন'—মডার্ণ রিভিয়ু, অক্টোবর ১৯২৩, পৃষ্ঠা ৪৮৪ তে প্রবন্ধটি অংশত মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ৭৬। ১৯২৬ সালে রামানন্দ জেনেভায় জাতিসংঘের সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পান। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও ইতালী ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ে এক সময়ে যাত্রা করেননি। কবি রওনা হন মে মাসে, রামানন্দ অগস্টে।

পত্র ৭৭। এই পত্রপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রামানন্দের ৬ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথ "নটীর পূজা" নাটিকাটি প্রকাশার্থ বসুমতীতে দিয়েছেন এ সংবাদে রামানন্দ ক্ষুণ্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুযোগ করে পত্র দেন। তারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র। 'নটীর পূজা' বসুমতীতে বৈশাখ ১৩৩৩-এ প্রকাশিত হয়। এটি গ্রন্থাকারে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬-এ। লক্ষণীয় রামানন্দ তাঁর পত্রে 'নটীর পূজা'কে 'নটীর পুরস্কার' বলে উল্লেখ করেন।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের প্রতিষ্ঠা জুলাই ১৯২৩ সালে। ১৯২২ সালেই রবীন্দ্ররচিত সমস্ত বাংলা বইয়ের স্বত্ব বিশ্বভারতীতে অর্পিত হয়েছিল।

পত্র ৭৮। ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ সালে আগরতলায় থাকাকালীন কবি কিছু গান রচনা করেন। এই গানগুলি 'বৈকালী' নামে গ্রথিত করে তিনি প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠান। এইগুলি থেকে ৩২টি গান প্রবাসীতে আষাঢ়-কার্তিক মাসে (১৩৩৩) মুদ্রিত হয়। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে থাকা কালে বৈকালীর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সফল হয় নি। এর

বহুকাল পরে 'বৈকালী' গ্রন্থাকারে পাঠকলভ্য হয়। 'বৈকালী' সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়, বৈকালী (১৯৭৪)।

পত্র ৭৯। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে সেটি প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৩-এ প্রকাশিত কবির ইতালী-ভ্রমণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে কয়েকটি ঘটনা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, ইতালী-ভ্রমণ তার অন্যতম। এজন্য এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল।

১৯২৫ এর জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রবীন্দ্রনাথ ইতালীতে অল্পদিনের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে আবার তাঁর ইতালী যাওয়ার কথা হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তা হয় নি। ইতিমধ্যে অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকির মধ্যস্থতায় তৎকালীন ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী বেনিটো মুসোলিনী বিশ্বভারতীকে বহু মূল্যবান ইতালীয়ান গ্রন্থ উপহার পাঠান। ফর্মিকি ও জিউসেপ্পে তুচ্চি নভেম্বর ১৯২৫-এ অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্য মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ১৯২৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ ইতালী ভ্রমণে যান, সঙ্গে থাকেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিবদ্বয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথকে ইতালীতে প্রভূত সম্মান সহকারে আপ্যায়ন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার বিবরণ ইতালীর বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে কবি মুসোলিনী সম্বন্ধে যে-সব প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন তা যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এইসব পত্রিকায় স্থান পায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইতালী সফর এবং

ইতালীর প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস মনোভাব দেশবিদেশে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করে। ইতালী ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ জেনেভায় উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে রোলাঁর সাক্ষাৎকার হয়। রোলার মারফৎ ইতালীতে মুসোলিনীশাসনের স্বরূপ তাঁর কাছে উদঘাটিত হয়[১]। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট শাসনের কদর্য দিকটি প্রচ্ছন্ন রেখে তাঁকে শুধুমাত্র বাহ্যিক উন্নতির দিকটাই দেখানো হয়েছিল। অতঃপর ইতালীর ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের ফলে ঐ দেশের দেশত্যাগী অধ্যাপক সালভাদোরির স্ত্রীর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে বিবরণ শোনেন তাতেও ইতালীয় সরকারের বর্বর নিষ্ঠুরতার দিকটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল।[২] তখনই রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনী ও ইতালীর ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে নিজ অভিমত ব্যক্ত করে শান্তিনিকেতনে এণ্ড্রুজকে এক পত্র দেন। ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি এই পত্রের একটি প্রতিলিপি এল্মহার্স্ট্‌কেও পাঠান। এটি ম্যানচেস্টার গারডিয়ান (৫ আগস্ট ১৯২৬) পত্রিকায় মুদ্রিত হলে[৩] বিশ্বের মানুষের কাছে ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে কবির প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ পায়।

১ দ্রঃ অবন্তীকুমার সান্যাল, রমাঁ রলাঁ, 'ভারতবর্ষ' (১৩৭৬) পৃ ১০৩—১৫৯

২ দ্রঃ Rabindranath Tagore's Interview with an Italian Exile's wife, Visva-Bharati Bulletin, Oct 1926 P 299-203.

৩ পত্রটি বিশ্বভারতী কোয়ার্টালি, অক্টোবর ১৯২৬-এ আংশিক মুদ্রিত হয়। সম্পূর্ণ পত্রটি পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

এই পত্র উপলক্ষে প্রবাসী (আশ্বিন ১৩৩৩) এবং মডার্ণ রিভিয়ু (অক্টোবর ১৯২৬) পত্রিকার যথাক্রমে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'Notes' অংশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। প্রবাসীতে লেখা হয় '...... কবি পূর্ব্বে ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ও তৎপরে তাঁহাদিগের সমালোচনা করিয়া ইতালীয়দিগের মনে যে অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করিয়াছেন তাহা ভারতের পক্ষে কোন প্রকারেই লাভজনক হইতে পারে না। যে অতিথি ও যে আতিথ্য দান করে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারের যে আদর্শ তাহাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহাও না হইলেই ভাল হইত......যদি তিনি বা তাঁহার কর্ম্মসচিবগণ উন্মুক্ত চক্ষু অবস্থায় সঙ্কীর্ণ স্বদেশবাদের চরম উদাহরণ ইতালীর প্রভু মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রথমত: উন্নত ও উদার—বিশ্বপ্রেমবাদীর অনুপযুক্ত কার্য্য করেন ও দ্বিতীয়ত: যে কোন কারণ দেখাইযা তীব্র সমালোচনায় সেই মুসোলিনীর আতিথেয়তার প্রতিদান করেন ; তাহা হইলে অন্তত একথা বলিতে হয় যে, ব্যাপারটি সকল দিক হইতে দেখিলে আদর্শরূপে সম্পন্ন হয় নাই। দার্শনিক কবি সকল বাহ্যিক অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন,...কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ কর্মসচিবদ্বয় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (যাঁহারা যুবক, ইয়োরোপ-আমেরিকার বহু মনীষীর সহিত পত্রালাপে তৎপর এবং সুচিন্তা ও সুব্যবস্থায় বিচক্ষণ, তাহারা) কি বলিয়া কবিকে ইতালীর স্বেচ্ছাচারী নেতা ও মানব-স্বাধীনতার আদর্শের বিরুদ্ধাচারী মুসোলিনীর গৃহে অতিথি-রূপে লইয়া গেলেন ?...ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত সখ্য-স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা ইহাদিগের সেই মনোভাবেরই পরিচয় পাই,

যে-পরিচয় আমরা তাঁহাদিগের বিশ্বভারতীর সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টার মধ্যে পাইয়াছিলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ যে-বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার শিক্ষানীতির আজন্ম সমালোচক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যখন বিশ্বভারতীর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হয় তখন আমরা সে-চেষ্টার মধ্যে compromise বা আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া লাভের চেষ্টার পরিচয় পাই। এই অল্প লাভের আশা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহান ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত নহে। কারণ যে-কবি, যে-মহাপুরুষ স্থান কাল ও পাত্রের সকল প্রলোভন, অত্যাচার প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া দীর্ঘ পঞ্চাশ বর্ষাধিককাল নিজের জীবনের আদর্শের গতি শ্রেয়ের পথে রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কদাপি ক্ষুদ্র সুবিধার চেষ্টায় আদর্শকে বলিদান দিতে পারেন না। যে অদূরদর্শিতার ও আদর্শনিষ্ঠার অভাবের পরিচয় আমরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ঘটিত ব্যাপারে প্রথম পাই, আজ কবির কর্ম্মসচিবদিগের ইতালীয় 'এডভেনচারে' আমরা তাহারই পরিচয় দ্বিতীয় দফায় পাইলাম।'—প্রবাসী আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ ৯৮৯ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৯২৬, পৃ ৩৪৩-৩৪৪-এ 'Tagore's Condemnation of Fascism' এবং অক্টোবর ১৯২৬, পৃ ৪৭০-৪৭১-এ 'Dr. Tagore's European Tour' অংশেও অনুরূপভাবে মন্তব্য করা হয়।

৭৯ সংখ্যক পত্রের সূচনায় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুর এইসব মন্তব্যের কথাই কবি উল্লেখ করছেন।

'আপনার চিঠি'—প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত উল্লিখিত মন্তব্যের জন্য পত্রিকাদ্বয়ের তৎকালীন সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দায়িত্বক্ষালনের চেষ্টায় রামানন্দ জেনিভা থেকে

রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র দিয়েছিলেন। সম্ভবত এই পত্রই অভিপ্রেত। দ্র: নির্মলকুমারী মহলানবিশ, কবির সঙ্গে য়ুরোপে (১৩৭৬), পৃ ২১৫।

'সরলা যখন···দিয়েছি'— ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবী প্রবাসী সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁরা লেখকদের 'সরস্বতীর বিনা পণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন।' এই অভিযোগে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ন হয়ে প্রবাসীর পক্ষ সমর্থন করে সবুজপত্র আশ্বিন ১৩৩৩-এ একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে তিনি প্রবাসীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ করেন এবং প্রবাসীর পূর্বাপর আনুকূল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার কবে লেখেন 'প্রবাসী সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন···তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে, এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি। ···কিন্তু অর্থ ই তো একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্ব্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভার-পীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।'

'এমন কি ফর্মিকিও···করেননি।' ম্যাঞ্চেষ্টার গারডিয়ানে ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনী সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি প্রকাশিত হলে এর একটি উত্তর দেন ইতালীয় অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি। দ্র ম্যাঞ্চেষ্টার গারডিয়ান, ২৫ আগষ্ট, ১৯২৬।

রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণের বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য— অবন্তীকুমার সান্যাল, রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর ও রম্যাঁ রলাঁ,

এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪, পৃ ৬৩-১০৭।

'আপনি Forward এর···গ্রথিত।' রবীন্দ্রনাথ ভিয়েনায় থাকাকালে রামানন্দ কয়েকদিনের জন্য তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। এই সময়ে মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীতে প্রকাশিত মন্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে অনুযোগ করেন। রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করেই মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীর তৎকালীন সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় ঐ মন্তব্য করেছেন। পরে জেনেভা থেকে রামানন্দ যে চিঠিতে ঐ মন্তব্য সম্পর্কে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দায়িত্ব লাঘব করার চেষ্টা করেন তাতে তিনি লেখেন 'গত বছর ফরোয়ার্ডে যখন আপনার সম্বন্ধে সুধীন্দ্র বোসের (ইটালী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে) লেখা বেরোয় তখন কুদুই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার একটা লম্বা জবাব মডার্ন রিভিয়ুতে ছাপিয়েছিল। কাজেই তার সম্বন্ধে আপনি ভুল করবেন না।' দ্রঃ নির্মলকুমারী মহলানবিশ, কবির সঙ্গে য়ুরোপে পৃ ২১২-১৩। রামানন্দের এই চিঠির প্রসঙ্গেই কবির এই মন্তব্য।

'Forward' এর ঘটনাটি ছিল এই: ১৯২৫ এর ৬ ফেব্রুয়ারি মিলান থেকে Mary Blankenhorn রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণ সম্পর্কে আমেরিকার Nation পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করেন। সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইতালীর বিভিন্ন সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু বিরূপ মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল। ২২।৭।২৫ তারিখের 'Forward' পত্রিকায় সুধীন্দ্র বসু 'Tagore in Italy' প্রবন্ধে ইতালীর সরকারী পত্রিকার এই বিরূপ

মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করেন ও পরিশেষে লঘুভাবে মন্তব্য করে লেখেন যে রবীন্দ্রনাথের পরার্থবাদের (altruism) বাণী য়ুরোপের উপযুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ এ স্থলে এই লেখাটির কথাই উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইতালীয়রা রবীন্দ্রনাথকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন বলে যে ধারণা সুধীন্দ্র বসুর লেখা থেকে প্রতিপন্ন হয় তাকে খণ্ডন করে 'Forward' পত্রিকায় ২৫।৭।২৫ তারিখে সুধীরকুমার পাহিড়ীর একটি প্রতিবাদ 'Rabindranath Tagore in Italy' এবং Modern Review পত্রিকায় অগষ্ট ১৯২৫-এ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ 'Rabindranath Tagore and Italy' প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৮০। 'আমার পত্র'—সম্ভবত 'ফ্যাসীবাদ ও মুসোলিনী' সম্পর্কে ভিয়েনা থেকে ২০ জুলাই ১৯২৬ এ এণ্ড্রুজকে লিখিত পত্র— দ্র ৭৯ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

পত্র ৮৩। 'নটীর পূজার অভিনয়'—এই বৎসর মাঘোৎসবের পর ১৪, ১৫, ও ১৭ই মাঘ রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় জোড়াসাঁকোতে 'নটীর পূজা' নাটিকাটি অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং উপালির ভূমিকায় অভিনয় করেন। উপালির ভূমিকা এবারেই প্রথম সংযোজিত হয়। প্রথম অভিনয়ে এটি ছিল না। 'নটীর পূজা'র প্রথম অভিনয় হয় শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসব (১৩৩৩) উপলক্ষে।

পত্র ৮৪। জাভা ও বালী ভ্রমণের জন্য ঘনশ্যামদাস বিড়লা দশহাজার এবং নারায়ণদাস বিজরিয়া এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন জানা যায়। দ্রঃ Visva-Bharati Annual Report And Audited Accounts 1927, pp. 41.

পত্র ৮৬। এই পত্রে উল্লিখিত ছাপার বহি E. Thomson কৃত Rabindranath Tagore—His Life and Works (1921) Association Press, Y. M. C. A. Calcutta এবং Rabindranath Tagore – Poet and Dramatist (1926), Oxford, London.

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ 'বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়' ছদ্মনামে টমসনকৃত বইয়ের এক সমালোচনা প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৪-এ প্রকাশ করেন।

উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যশিক্ষানবিসী সুরু করেছিলেন কালিদাসের কুমারসম্ভব এবং শেকসপীয়রের ম্যাকবেথের অনুবাদ দিয়ে। ম্যাকবেথের আংশিক অনুবাদ 'ভারতী'র 'সম্পাদকের বৈঠকে' (আশ্বিন ১২৮৭) প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪-৭৫ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ম্যাকবেথের অনুবাদ করেন তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বৎসর। এ বিষয়ে তথ্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনস্মৃতি (১৩৫০) পৃ ৭০; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয় (১৩৫০), পৃ ৮৫-৮৯; প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, (১৩৭৭) পৃ. ৪৩-৪৪ সঙ্ঘমিত্রা বন্দোপাধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের আদি পর্ব (১৯৭৮), পৃ ১০২-১০৬, ১০৮, এবং প্রশান্তকুমার পাল রবিজীবনী, প্রথমখণ্ড (১৩৮৯), পৃ ২২৫-২২৬।

পত্র ৮৮। এইটি ও পরবর্তী পত্রটি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য রামানন্দলিখিত পত্র সংখ্যা ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১।

'বৃক্ষবন্দনা' ও 'বর্ষশেষ' প্রবাসী পত্রিকায় যথাক্রমে বৈশাখ

ও জ্যৈষ্ঠমাসে (১৩৩৪) প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৮৯। 'যখনি…বসেচি'। এই উপন্যাস 'তিন পুরুষ'। পরে এর নামকরণ হয় 'যোগাযোগ'। বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশের তাগিদে মে ১৯২৭-এ গ্রন্থটির রচনার সূত্রপাত হয়। এটি আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে চৈত্র ১৩৩৫ পর্যন্ত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'যোগাযোগ' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীর জন্য 'শেষের কবিতা' রচনা করেন। 'শেষের কবিতা' প্রবাসীতে ভাদ্র ১৩৩৫ থেকে চৈত্র ১৩৩৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৯০। 'চিঠি দুটো' চট্টগ্রামের মুনসেফ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (ভাদ্র ১৩২৪) পড়ে কবিকে যে পত্র লেখেন রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে ৬ ভাদ্র ১৩২৪ তাঁকে একটি পত্র দেন। পরে ভাদ্র ১৩২৯-এ প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধ পাঠ করে জ্ঞানচন্দ্র ৪ ভাদ্র ১৩২৯, ২১ অগস্ট ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথকে আর একটি চিঠি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দেন ৬ ভাদ্র ১৩২৯।

রবীন্দ্রনাথের এই দুটি পত্রই প্রবাসীতে শ্রাবণ ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।

'অরবিন্দ ঘোষ… দেব।' মাদ্রাজ থেকে কলম্বো যাওয়ার পথে শ্রীঅরবিন্দের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ২৯ মে ১৯৩০। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নির্মলকুমারী মহলানবিশ লেখেন: "কবি জাহাজে ফিরে এসে বললেন 'অরবিন্দকে দেখে খুব আশ্চর্য লেগেছে। একেবারে উজ্জ্বল চেহারা— চোখ দুটোর মধ্যে কী আছে বর্ণনা করা যায় না, এমন

আশ্চর্য চোখের ভাব। বুঝলুম অন্তরের মধ্যে কিছু একটা পেয়েছেন, তা না হলে চেহারার এ রকম দীপ্তি হয় না। বহুদিন পরে স্থাখা— খুশি হলুম দেখে।' এই সাক্ষাৎ এত বেশি মনকে নাড়া দিয়েছিল যে সমস্ত দিন কারো সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বললেন না।" নির্মলকুমারী মহলানবিশ, 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্য' (১৩৬৩)। অরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'অরবিন্দ ঘোষ' শ্রাবণ ১৩৩৫-এ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৯১। 'লেখন' (১৩৩৪) কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনা 'লেখন' প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৫ সালে মুদ্রিত হয়। ওই প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ জানান এই গ্রন্থে মুদ্রিত চারটি কবিতা ও অপর একটি কবিতার দুটি পংক্তি (১। তোমারে ভুলিতে মোর হ'ল নাক মতি, ২। ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে, ৩। আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন ৪। প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার ৫। শুধু এইটুকু মুখ অতি সুকুমার—প্রথম দুই পংক্তি) বস্তুত প্রিয়ম্বদা দেবীরই রচিত—ভুলক্রমে 'লেখন' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

'Fireflies সম্বন্ধে 'Dial' কাগজের সমালোচনা মডার্ণ রিভিয়ুতে নভেম্বর ১৯২৮ সালে মুদ্রিত হয়।

৯১ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত সাহিত্যিকদের সাহিত্য-রস-বোধের ভীরুতা সম্বন্ধে তুলনীয়: 'জাপানে ছোট কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটদের মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের, কেননা তারা জাত আর্টিস্ট। সৌন্দর্য বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না।···কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা

করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন—এখনো সে দলের লোকের অভাব নেই।'—লেখন, প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৫।

'নাম্নী' মহুয়ার অন্তর্গত সতেরটি কবিতা, ভাদ্র আশ্বিন ১৩৩৫-এ শান্তিনিকেতনে রচিত, প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৫-এ মুদ্রিত।

পত্র ৯২। এই পত্রটির পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের মধ্যে একটি সশ্রদ্ধ সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ বিদ্যমান ছিল। ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের গয়া ভ্রমণকালে যদুনাথ পাটনা থেকে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। পাটনা থেকে তিনি যে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে' আসতেন এবং আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতাদি করতেন তা যদুনাথের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে স্পষ্ট বোধগম্য। দ্রঃ প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৫২। উল্লেখ্য, 'অচলায়তন' নাটকটি আশ্বিন ১৩১৮তে প্রবাসীতে প্রকাশ-কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপে' এটি যদুনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। তারও পরে ১৩২০ পর্যন্ত যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের অন্তত সতেরোখানি প্রবন্ধ ও গল্পের ইংরেজি অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১৩২০তেই যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধের অনুবাদ করেন—'My Interpretation of India's History' নামে।

অতঃপর ১৯২১ পর্যন্ত যদুনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল এমন নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যদুনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতেও উৎসুক ছিলেন। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালে যদুনাথ অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ওই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বভারতীর

আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘপত্র (৩১ মে, ১৯২২ দ্র: প্রবাসী চৈত্র ১৩৫২) লেখেন। এই পত্র পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ সদস্যপদের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন।

১৯২৮-এ যদুনাথ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তখন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 'স্যার উইলিয়ম মেয়ার স্মারক' বক্তৃতা দেন। ওই বক্তৃতামালা পরে 'India Through the Ages' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। ৯২ সংখ্যক পত্রে কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তার উপস্থিত কারণ আর কিছু পাওয়া না গেলেও এই বক্তৃতামালার 'Rabindranath Tagore's World Mission of India' অংশে যদুনাথের নিম্নোক্ত মন্তব্যকে এর কারণ বলে অনুমান করা যেতে পারে : 'This latest form of the Hindu revival we owe to Rabindranath Tagore. It is a very close but unconscious copy of the movement which began in Russia in the 19th century, the very language of the Slavonic leaders being repeated by the Indian poet'—Jadunath Sarkar, India Through the Ages (1923) p. 125

পুনরায় উনিশ শতকের রাশিয়ার Slavophile আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য দেখিয়ে যদুনাথ বলেন, 'This latest form of Indian thought is based entirely on a new interpretation of our ancient Upanishads under the unconscious influence of Christianity'—ওই গ্রন্থ পৃ ১২৭।

এই পর্বে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হলেও ১৯৩১ সালেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। উভয়ের ঐ সময়কার চিঠিপত্রের সাক্ষ্য থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

'গাছের গল্পটা'—বলাই. এই বৎসর শান্তিনিকেতনে বর্ষা উৎসব উপলক্ষে রচিত, ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত; প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সালে মুদ্রিত। পরে গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত।

পত্র ৯৩। 'হোম য়ুনিভার্সিটির ··প্রয়োজন হবে।'[১], প্রবাসী পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৪৮-এ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার 'আহার ও আহার্য' গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে রামানন্দ লিখেছিলেন:

'আমরা অনেক বৎসর পূর্বে সর্বসাধারণের বাড়ীতে বসিয়া জ্ঞান লাভের সুবিধার নিমিত্ত বিলাতী হোম য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরির অনুরূপ কতকগুলি বাংলা বহি লিখাইবার ও প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। সেই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগিয়াছিল, একখানি চিঠিতে জানাইয়াছিলেন।' সম্ভবত ৯৩ সংখ্যক পত্রটিই রামানন্দ উল্লিখিত পত্র।

মনে রাখা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ১৯১৭ সালে 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ' গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা হলেও তা তখন কার্যকরী হয়নি। এই বিষয়ে ৫১ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য। ৯৩ সংখ্যক পত্রে 'হোম য়ুনিভার্সিটি'র আদর্শে পাঠ্যগ্রন্থ রচনার

---

(১) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: 'সেই যে বাংলা Home Library পর্য্যায়ের বই লেখাবার প্রস্তাব করেছিলে—সেটা ভুলো না। ভারি দরকার'—চিঠিপত্র-৫, পত্র-৫৩, পৃ ২১৯।

আশু প্রয়োজনের কথা উল্লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে কবির এই অভিপ্রায় সফল হয়েছিল ১৯৩৯ (১৩৪৬) সালে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রথম প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

'অপূর্ব্বকে···দিয়েছি।' মূল চিঠি 'এসিয়া ও য়ুরোপ'—প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত। অপূর্বকুমার চন্দ-কৃত এর ইংরেজি তর্জমা 'Europe Asia and Africa' নামে মডার্ন রিভিয়ুতে ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে মুদ্রিত।

পত্র ৯৪। 'গাছের গল্প'— বলাই, ৯২ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত।

'অপূর্ব্বর···পাঠাবেন'—এ বিষয়ে ৯৩ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ৯৫। 'মডার্ন রিভিয়ুর লেখাটি'—এটি নিশ্চিত করে জানা যায় না।

অক্টোবর ১৯২৮-এ মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত সন্ত নিহল সিং রচিত 'DONOUGHMORE DYARCHY FOR CEYLON' প্রবন্ধটি কবির অভিপ্রেত হতে পারে।

পত্র ৯৬। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার যে সূত্রপাত করেছিলেন প্রাচীন জরোথুস্ত্রীয় ধর্মালোচনাও ছিল তার অন্যতম। এজন্য তিনি বোম্বাইয়ের ধনী পার্শী সম্প্রদায়ের সহায়তা প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে Bombay Chronicle পত্রিকায় প্রকাশিত জে. কে. নরীম্যানের 'The Indian Institute of Parsis' প্রবন্ধে লেখা হয়: 'I was frankly against the Parsis making large donations to Visva-Bharati. And that for two reasons. In the first place an institution like Shantiniketan located in India,

can not have all the facilities ; the paraphernalia of research, such as are commanded by older universities in Europe and America. It lacked environs . It lacked the innate enthusiasm which time and not money can supply. The Manuscripts on which the young students guided by elders, are expected to work do not survive in a state of preservation the ravages of India's humid climate'

এই পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি পঠিতব্য । রামানন্দ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর জ্ঞাতব্য জেনে নরীম্যানের বক্তব্য খণ্ডন করে যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়েছিলেন ডিসেম্বর ১৯২৮ এর মডার্ন রিভিয়ুর 'Notes' অংশে ।

পত্র ৯৭ । ১৮ এবং ২১ অগস্ট ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-পরিষদের সভায় দুটি মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন— 'সাহিত্যের স্বরূপ' ও 'সাহিত্য-বিচার' । এই ভাষণ দুটি অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধ 'সাহিত্য-বিচার'—প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সংকলিত হয় ।

পত্র ৯৮, ৯৯ । এই পত্রদ্বয়ে উল্লিখিত 'লেখাটি' এবং 'প্রবন্ধ'— 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' । এটি শচীন সেনের 'The Political Philosophy of Rabindranath' গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা— প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত।

বরোদার বক্তৃতাটি হয়েছিল ২৭ জানুয়ারি, ১৯৩০ । বক্তৃতার বিষয় 'Man the Artist' । দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৯ ।

ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে ১৯৩০ এ প্রদত্ত হিবার্ট লেকচারের জন্য কবি এই সময়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ।

১০০। এই বৎসর নভেম্বর মাসের 'Prabuddha Bharat' পত্রিকায় প্রকাশিত রোম্যা রোলাঁর 'Ramkrisna and the king Shepherds of India' প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি তাঁর 'The Life of Ramkrisna' (১৯২০) গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদ। রোম্যা রোলাঁ এই গ্রন্থ রচনার উপকরণ পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণের ভক্ত ও শিষ্যদের কাছ থেকেই। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিজ্ঞতা জানতে চেয়ে রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে যে-পত্র (রামানন্দের পত্র ১৪) লেখেন তদুত্তরে এই পত্রে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ।

দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'র প্রথম খণ্ডে একাধিকবার পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (বিশ্ববাণী, পৌষ ১৩৮৫, পৃ ৫৩১-৫৩৮)।

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রে নিবেদিতার উল্লেখ বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকালে নিবেদিতার উপস্থিতির প্রশ্ন ওঠে না। মনে হয় পরবর্তীকালে নিবেদিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট কিংবা রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছ থেকে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনেছিলেন এবং কোন সময়ে রবীন্দ্র-সমীপে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন হলে সন্তোষ প্রকাশ করেননি।

এই পত্রের দ্বিতীয় বাক্য এবং তৃতীয় বাক্যের অর্থবোধে একটু সংশয় হতে পারে। বস্তুত প্রথম 'তিনি' দ্বারা নিবেদিতাকে

বোঝালেও দ্বিতীয় 'তিনি' শব্দে মহর্ষিকে বোঝানো হয়েছে। 'শপথ গ্রহণ'—এণ্ড্রুজের কাছে লেখা উল্লিখিত মূল পত্রের তারিখ অক্টোবর ১৯২৩। এই সময়ে এণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক গার্ল-গাইডের শাখা হিসাবে আশ্রমের মেয়েদের দ্বারা গঠিত 'সহায়িকা'র পক্ষে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়া উচিত হবে না। এণ্ড্রুজকে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত চিঠিটি লিখেছিলেন। এটি ডিসেম্বর ১৯২৯-এ মডার্ন রিভিয়ুতে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১০১। 'কোরীয়রবীন্দ্র সংবাদ'—'কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত'— প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬-এ মুদ্রিত হয়।

'দুটো ইংরেজি লেখা'— 'Organisation' এবং 'Wealth and Welfare'। এ দুটি মডার্ন রিভিয়ুতে যথাক্রমে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। 'Organisation'— বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলিতে, জুলাই ১৯২৬ সালে মুদ্রিত 'The Rule of the Giant' এর সংক্ষিপ্ত রূপ। 'Wealth and Welfare' বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি অক্টোবর ১৯২৪ সালে মুদ্রিত 'City and Village' এর সংশোধিত রূপ।

পত্র ১০২। রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত লেখাটি 'পঞ্চাশোর্দ্ধম্'। এটি সম্মেলনের শেষ দিনে ৪ ফেব্রুয়ারি স্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক পঠিত হয় ও পরে বিচিত্রায় ফাল্গুন ১৩৩৬ এবং প্রবাসীতে বৈশাখ ১৩৩৭ সালে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১০৩, ১০৪। ১৯৩০ সালের এপ্রিল-মে মাসে ভারতে এক অস্থির ও জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। লবণ আইন

অসহযোগ আন্দোলন, শোলাপুরে সামরিক আইনের সন্ত্রাস, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং গান্ধীজি ও জওহরলালকে কারাগারে নিক্ষেপ— এই পটভূমিকায় বিলাত থেকে ১০৩ ও ১০৪ সংখ্যক পত্র লিখিত হয়েছিল।

'ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়েনে যে প্রসঙ্গ'— ১৬ মে (১৯৩০) ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়েনে রবীন্দ্রনাথের 'India and England' বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন যে ভারত সরকারের দমননীতি ও প্রজা নিপীড়নের ফলে ইংলণ্ড সম্পর্কে ভারতের পুরাতন শ্রদ্ধার মনোভাবটি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ভারতের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব মতামত জানাতে গিয়ে বলেন :

'...' I have often been asked in England to offer my opinion about what should be done at the present juncture when things have become so critical. My answer has always been that I do not believe in any external remedy where inner relations have been so deeply affected. For this reason, I can not truly point to any short cut to win relief or any easy remedy to heal the deeply-seated disease. What is most needed is rather a radical change of mind and will and heart.

What I really believe in is a meeting between the best minds of the East and the West in order to come to a frank and honourable understanding. If once such an open channel of communication

could be cut whereby sincere thought might flow freely between us unobstructed by mutual jealousy and suspicion and unimpeded by self-interest and racial pride, then a reconciliation might be bridged over'.

'স্পেক্টেটরে একটা লেখা'—৭ জুন (১৯৩০) স্পেক্টেটর পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'India—An Appeal to Idealism' লেখাটি প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ভারতে যে সরকারী সন্ত্রাস ও দমননীতি চালানো হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইংলণ্ডের গণতন্ত্রী মানুষদের কাছে কবির এই আবেদন। ইংলণ্ড গণতন্ত্রের গৌরবময় আদর্শের ধারক। পরদেশের প্রতি আচরণেও ইংলণ্ড যেন এই আদর্শের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখে—কবির আবেদনের মূল বক্তব্য ছিল এই।

এখানে প্রসঙ্গত য়ুরোপকে সমালোচনা করে তিনি বলেন… "To-day Europe in the illumination of her intellect has brought her science and also her spirit of service. But unfortunalety she has not come to Asia to reveal the generosity of her civilization, but to seek an unlimited field for her pride and power, 'trying to make these things eternal.'

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য: '…the fact glimmers out that our people, with a pious determination, has kept unshaken the difficult ideal which they have accepted from their great leader Mahatma Gandhi who—the Spirit of Buddha

himself—upholds the noblest spirit of India,...None of us can cowardly claim immunity or mitigation of suffering, when, even if rashly, the subversive forces of history have been brought down upon our country in the hope of building her history upon a new foundation.'

পত্র ১০৪। 'ঢাকার উৎপাত ··নকল পাঠাই'—ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণে বৃটিশের নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র দেন তা ৩০ অগস্ট ১৯৩০-এ স্পেক্টেটর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত তিনি এতে লেখেন 'We have not the least doubt that the most expensively and elaborately organized power which the British Govt has in India is more than sufficient in checking at once any symptoms of violence in our communal relationship. ...I know from my own correspondence that this event at Dacca has alienated more than anything else in Bengal, the sympathies of those who were still clinging to their faith in British justice Other happenings had shaken public confidence but this has struck at its very foundation.'—এই পত্রের কিয়দংশ মডার্ণ রিভিয়ু অক্টোবর ১৯৩০ এর 'Notes' অংশে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১০৫। 'অতএব ইংরেজিতে·· ছাপাবেন'। 'রাশিয়ার চিঠি'র

(১৩৩৮) ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের বর্তমান পত্রের সমকালে হয় নি। শশধর সিংহকৃত অনুবাদ 'Letters From Russia' ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত হয়েছিল। অনুমান করা যায় ১৯৩১ এর পর, ১৯৩৪ এর পূর্বে এই অনুবাদ করা হয়েছিল যদিও তখন তা প্রকাশিত হয় নি।

'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহার (আদিতে নাম ছিল সোভিয়েট নীতি) পরিচ্ছেদটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ মডার্ণ রিভিয়ুতে 'The Soviet System' নামে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩৪ এর জুন মাসে ওই পত্রিকাতেই ওই পরিচ্ছেদের শশধর সিংহকৃত অনুবাদ 'On Russia' প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারী নিষেধাজ্ঞায় অনুবাদিত অন্যান্য সকল অংশের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে লণ্ডন কমন্স সভায় যে প্রশ্নোত্তর হয় তার বিবরণ টাইমস্ পত্রিকায় (১৩ নভেম্বর ১৯৩৪) প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে 'রাশিয়ার চিঠি'র (বিশ্বভারতী ১৯৭০) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পত্র ১০৬। 'একটা কবিতা লিখেছি'—এটি 'প্রাণলক্ষ্মী'। ৭ নভেম্বর ১৯৩০-এ কবিতাটি প্রথম রচিত হয় এবং প্রকাশের জন্য রামানন্দের কাছে প্রেরিত হয়। ঐ দিনই এটি বাতিল করে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতরূপে কবিতাটি প্রবাসীর জন্য পাঠানো হয়। এই পত্রে 'প্রাণলক্ষ্মী'র সংশোধিত তৃতীয় পাঠটি পাওয়া যায়। এই তিনটি পাঠই প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৮-এ মুদ্রিত হয়েছে। কবিতাটি (প্রথম স্তবক বর্জিত) 'তুমি' নামে পরিশেষ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে।

পত্র ১০৭। 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধটি প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৮ সালে মুদ্রিত এবং পরে কালান্তরে সংকলিত হয়।

পত্র ১০৯। 'ইংরেজি প্রবন্ধের···নেবেন।' সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত 'The Soviet System' এর প্রুফ। ১০৫ সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

পত্র ১১০। 'কলকাতায়···হয়েচে।' উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে কলকাতায় 'গীতোৎসবের' জন্য স্টেজের প্রয়োজন।

পত্র ১১২, ১১৩। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৮ সালে তাঁর আঁকা চারখানা ছবির মুদ্রণ প্রসঙ্গে এই পত্রদ্বয়লিখিত। মহুয়ায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রবাসীতে মুদ্রিত ছবি থেকে বিভিন্ন।

পত্র ১১৪, ১১৫। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র (২৭ জুন ১৯৩২) থেকে জানা যায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছবির একটি 'পোর্টফোলিও' মুদ্রণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য কেদারনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র-২।

পত্র ১১৮। উল্লিখিত গানটির সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত স্বরলিপি 'গীতলিপি' প্রথমখণ্ডে (১৯১০) পাওয়া যায়, পরে স্বরবিতান ৩৬ খণ্ডে সংকলিত হয়।

পত্র ১১৯। 'সেই সময়ে···প্রচার করচেন।' বস্তুত ১৯২০-২১ সালে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মধ্যে আদর্শগত ভেদ সুবিদিত। দেশে ফিরে এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করেন ১০ অগস্ট, ১৯২১-এ। এ সম্পর্কিত দ্বিতীয়

প্রবন্ধ 'সত্যের আহ্বান' তিনি পাঠ করেন কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে, ২৯ অগস্ট ১৯২১-এ। ইতিপূর্বে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কবির মনোভাব জানতে পেরে গান্ধীজি 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' (১ জুন ১৯২১) 'The Poet's Anxieiy' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

'সেই সময়ে···ছাপবেন।' জগদানন্দ রায়কে লিখিত চিঠি প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) প্রকাশিত হয়। তাতে প্রসঙ্গত তিনি লেখেন—'Non-Co-operation (নন্‌-কো-অপারেশন) অকাজতার আবির্ভাব অন্তিমে। শাস্ত্রে বলে কর্মের দ্বারাই কর্ম থেকে মুক্তি, নৈষ্কর্ম্যের দ্বারা নয়, পাস করার দ্বারাই স্কুল থেকে মুক্তি, আমার মত ইস্কুল ত্যাগ করার দ্বারা নয়। আজ সময় এসেছে নিজেদের সব কাজ নিজেরা মিলে করতে হবে···কাজের উপলক্ষে আমাদের যে মিল সেই মিলই সত্য মিল, সেই সত্য মিলই হচ্চে চরম লাভ। অ-কাজ করবার উপলক্ষে যে মিল সে কখনই স্থায়ী হোতে পারে না।'

পত্র ১২০। এই চিঠিটি কবির তৃতীয়বার সিংহল ভ্রমণের সময় কলম্বো থেকে লিখিত।

'রাশিয়ার চিঠি'র তর্জমা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ১০৫ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

১০ মে (১৯৩৪) কলম্বোর রোটারি ক্লাবে কবি ভারতীয় 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন।

পত্র ১২১। 'যে ইংরেজি কবিতাটি···হয়েছিল।' এটি 'Breezy April, Vagrant April' (*ওগো দখিন হাওয়া*)। দ্রষ্টব্য Edward Thompson, Rabindranath Tagore, Poet and Dra-

matist (1948) pp. 268-269.

'Supreme Man'—এটি মূলত 'মানুষের ধর্মে'র দ্বিতীয় অধ্যায় অবলম্বনে রচিত। ইংরেজি অনুবাদে কবিকে সাহায্য করেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। এটি সংশোধিতরূপে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Man' বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতারূপে কবি কর্তৃক পঠিত হয় ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৩ সালে। মডার্ন রিভিয়ুতে এর প্রকাশ অগস্ট ১৯৩৪-এ।

পত্র ১২২। 'ইংরেজিতে বক্তৃতা'—সম্ভবত কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন—ভাষণ রচনা।

পত্র ১২৩। ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালে নিউ বর্লিংটন আর্ট গ্যালারীতে ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ভারতীয় ললিতকলার একটি প্রদর্শনী হয়। ওই-দেশীয় শিল্পসমালোচকগণ 'ম্যাঞ্চেষ্টর গারডিয়ান', 'বর্লিংটন ম্যাগাজিন', 'সানডে টাইমস্' 'মর্ণিং পোস্ট' প্রভৃতি পত্রিকায় এই প্রদর্শনীর বিশেষ প্রশংসা করেন। কিন্তু ঐ প্রদর্শনী দেখে অমিয় চক্রবর্তীর মনে হয়েছিল যে প্রদর্শিত ছবিগুলির মান কোনক্রমেই প্রশংসাযোগ্য নয়, কেননা তা ভারতবর্ষের জীবনের রূপকে যথার্থরূপে প্রতিফলিত করতে পারে নি। এ বিষয়ে ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪-এ তিনি রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্রে প্রসঙ্গত তিনি লেখেন "আমরা যেন বিদেশী কাগজের দুচারটে স্তুতি মন্তব্য বা এমন কি ছবি বিক্রী থেকে আসল কথা না ভুলি। যাঁরা শ্রদ্ধাবশত চুপ করে থাকেন বা disappointment প্রকাশ করেন এদেশে তাঁরাই বন্ধু। কেননা যারা প্রশংসা করেন ভারতীয়ত্বের বা আমাদের কোনো অতি উচ্চ অমানবীয় শিল্প

প্রতিভার চিহ্নকে, তাঁদের যদি প্রশ্ন করা যায় এইসব বিশেষণের পরে তাঁরা তাদের কোনো বড় দরের শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে এই জাতীয় শিল্পকে সমাসনে বসাতে রাজি কি না—তাহলেই সব মুখোষ খসে পড়ে। এ রকম দুরাশা উন্মত্ততার প্রলাপ বলেই এই স্তুতিবাদকের দল গ্রহণ করবেন। কিন্তু patron হয়ে 'ভারতীয়' শিল্পকে অনেকেই সমাদর করতে রাজি। যাঁরা একটু art এর মর্মগ্রাহী তাঁরা একটুও পরিচয় পান নি এই ঘটা করে সাজানো প্রদর্শনীতে, যে ভারতবর্ষ আজ বেঁচে আছে।" (এই পত্র রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত)।

চিত্র প্রদর্শনী সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তীর এই চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠানোর পরেই ১২৩ সংখ্যক পত্র লিখিত হয়। এ বিষয়ে দ্রঃ চিঠিপত্র-১১, পত্রসংখ্যা ৭৩।

"পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু কিন্তু পাথেয় নাস্তি"

প্রকৃতপক্ষে এই চরণটিতে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'টঙ্কাদেবী' কবিতাটির প্রথম দুই পংক্তির দুই খণ্ডিত অংশ স্থান পেয়েছে।

প্রিয়নাথ সেনের কাছে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই পংক্তি দুটি উদ্ধৃত করেন নিম্নরূপে—

"ইচ্ছা সম্যক্ উপবন ভ্রমণে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী, মন উড়ু উড়ু, এ কি দৈবের শাস্তি!"

দ্রঃ চিঠিপত্র ৮, পৃ ৩৫।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' (১৩২২ ? পৃ ২৮) গ্রন্থে এই দুই পংক্তির রূপ হল—

'ইচ্ছা সম্যক্ জগদরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,

পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি।'

'সুপ্রভাত' (ভাদ্র ১৩১৭, পৃ ৭৫) থেকে প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ছন্দ' (১৩৬৯) গ্রন্থে উদ্ধৃত এর পাঠ এইরূপ—

'ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি

পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবোর শাস্তি।'

পত্র ১২৪। ১১ পৌষ, ১৩৪১ সালে 'অলবেঙ্গল মিউজিক কন্ফারেন্সের' উদবোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। এটি ১২ পৌষ আনন্দবাজার পত্রিকার 'রিপোর্টে' প্রকাশিত ও পরবর্তীকালে 'সংগীতচিন্তায়' গ্রথিত হয়। কলম্বোর কলাসদনে বক্তৃতার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ১২০ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

'অনেকগুলি চিঠি'—অমিয় চক্রবর্তী, অজিত চক্রবর্তী এবং দিনেন্দ্রনাথকে লিখিত মোট ৮ খানা পত্র, প্রবাসীতে যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও আশ্বিন ১৩৪২-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ১২৫। প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪২-এ প্রকাশিত নির্মলকুমার বসুর প্রবন্ধ 'বাঙালীর চরিত্র' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র লিখিত। উক্ত প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য: ইংরেজ আমলে পূবতন গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে যাওয়ায় সমাজে প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। ব্যক্তিত্বের অতিবৃদ্ধির ফলে সম্মিলিতভাবে কোনো বড়ো কাজ করা আর বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে লেখক তিনটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেন, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়', 'কংগ্রেসী করপোরেশন' এবং 'বোলপুরের শান্তিনিকেতন।' এ সম্পর্কে লেখকের অভিমত: 'ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এ তিনটির মধ্যে

ব্যক্তিত্ববাদী অসামাজিক বাঙালীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ই হউক আর করপোরেশনই হউক তাহা মোটামুটি এক একজন মহা শক্তিশালী বাঙালীর কীর্তি। আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন অথবা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই চরম ব্যক্তিত্ববাদের উপাসক। তাঁহারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা অসংখ্য লোকের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রকাশ নয়। অর্থাৎ তাহা কোনও সমাজের দ্বারা গড়া জিনিষ নয়। যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা হইয়াছে, তাহারা একান্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি।' লেখকের আশঙ্কা 'তাঁহাদের পরে তাঁহাদের অপেক্ষা নীরেস লোকের হাতে পড়িলে যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?'

পত্র ১২৬। 'তখনি একটা···পাঠিয়েছি'—এটি শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ 'Today I gain you truly'—মডার্ণ রিভিয়ু, জুলাই ১৯৩৫-এ মুদ্রিত। কবিতাটির নীচে স্থানকালের নির্দেশ—চন্দননগর ২৬. ৬. ৩৫।

পত্র ১২৮। 'কার্তিক সংখ্যার···উপায় নেই।' কার্তিকের প্রবাসীতে 'বিস্ময়' এবং 'মাটিতে আলোতে'—এ দুটি কবিতাই মুদ্রিত হয়েছে। প্রথমটি ২৫ অগস্ট, দ্বিতীয়টি ৪ মে ১৯৩৫-এ রচিত।

প্রেরিত স্বরলিপি 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম' গানটির। এটি প্রবাসী কার্তিক ১৩৪২-এ মুদ্রিত।

পত্র ১২৯। 'সাহিত্য অধ্যাপক···করেছেন।' অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৪১, পৃ ২৩২) এই মত ব্যক্ত করেন।

পত্র ১৩০। 'তার কবিতার···দিয়েছি।' এই তর্জমা দুটি 'I am singular (আনিলাম অপরিচিতের নাম) এবং 'Do you hear the rumbling of Time's Chariot' (কালের যাত্রার ধ্বনি)।

কৃষ্ণ কৃপালানিকৃত 'শেষের কবিতার' ইংরেজি তর্জমা 'Shesher Kavita' ১৯৪৪ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং কবিকৃত ইংরেজি তর্জমাদ্বয় এতে সন্নিবিষ্ট হয়।

পরবর্তীকালে কৃপালানিকৃত 'শেষের কবিতা'র তর্জমা লণ্ডন থেকে 'Farewell My Friend (The New India Publishing Co. Ltd, London 1946) নামে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে রবীন্দ্রনাথকৃত 'I am singular' তর্জমাটি আংশিকভাবে গৃহীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের 'Do you hear···Chariot' এর স্থানে কৃপালানিকৃত 'Can you hear the wheels of Time' তর্জমাটি গৃহীত হয়।

'কালের যাত্রার ধ্বনি' কবিতাটির রবীন্দ্রনাথকৃত উক্ত তর্জমা বিশ্বভারতী কোয়ার্টালিতে (নভেম্বর ১৯৩৫—জানুয়ারি ১৯৩৬) এবং 'Boundless Sky' (বিশ্বভারতী ১৯৬৪) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৩১। 'একটি কবিতা'—এটি 'পৃথিবী', প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সালে মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে 'দুইবোনে'র ইংরেজি অনুবাদ হয় নি। কৃষ্ণ কৃপালানিকৃত 'দুইবোনে'র অনুবাদ 'Two Sisters' (বিশ্বভারতী) ১৯৪৫ সালে এবং মালঞ্চের অনুবাদ 'The Garden' অগস্ট ১৯৫৬ সালে (Jaico Publishing, Bombay) প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৩৩। 'একটি কবিতা'—'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'একজন লোক' কবিতাটির

তর্জমা 'A Person An oldish up country Man'—মডার্ণ রিভিয়ু, এপ্রিল ১৯৩৬-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

'তাঁর সম্বন্ধে···চলে যায়।' ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬-এ দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের কার্যকরী সভায় আগা খাঁ (তৃতীয়) প্রদত্ত ভাষণ সম্পর্কে এপ্রিল ১৯৩৬-এ মডার্ণ রিভিয়ুতে 'Notes' অংশে যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তৎসম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের এই মন্তব্য।

পত্র ১৩৪। 'তর্জমা করতে···ঠেকে।' সম্ভবত মহুয়ার অন্তর্গত 'সবলা' কবিতার আংশিক তর্জমা 'Why Deprive me My Fate of My Woman's Right'—দ্র: মডার্ণ রিভিয়ু, জুন ১৯৩৬।

পত্র ১৩৫। 'মহিলাদের সম্মেলন'—লাবণ্যলতা চন্দের উদ্যোগে আয়োজিত নিখিলবঙ্গ মহিলা-সম্মেলন।

'কাহিনী···করেছি।' 'নাট্যগীতি' রূপে 'পরিশোধ', প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৩-এ প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে এই বছর ২৪ ও ২৫ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে এটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই নাট্যগীতি অবলম্বনে পুনর্বার রচিত নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' স্বরলিপিসহ ভাদ্র ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। 'শ্যামা'র পরিশিষ্টরূপে 'পরিশোধ' নাট্যগীতি রবীন্দ্ররচনাবলী ২৫ খণ্ডে সংকলিত।

পত্র ১৩৬। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই ১৯৩৬-এ কলকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার সভাপতিত্ব করেছিলেন।

পত্র ১৩৮। 'কাটাকুটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি'—এটি 'ঘটভরা' কবিতার পাণ্ডুলিপি। কবিতাটি মিলহীন পদ্যছন্দে লেখা, 'শেষ সপ্তকে'র

সাতাশ সংখ্যক কবিতার এটি পূর্বরূপ।

'আমার অভিভাষণ'—মহিলা সম্মেলনে পাঠ করবার জন্য 'নারী' রচিত হয় ১৬ আশ্বিন ১৩৪৩-এ। উল্লেখযোগ্য, কবি শেষ পর্যন্ত মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ২৬ আশ্বিন সেখানে একটি মৌখিক ভাষণ দান করেন। 'নারী' প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪৩-এ মুদ্রিত হয় ও পরে 'কালান্তরে' সংকলিত হয়।

পত্র ১৪০। 'তোমারি নামে নয়ন মেলিনু' এবং 'ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া' এ দুটি গানের ললিত চট্টোপাধ্যায়কৃত ইংরেজি তর্জমা যথাক্রমে 'Morning' এবং 'The Night Lamp' মডার্ণ রিভিয়ু, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হয়।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের অষ্টাশীতি কবিতার তর্জমাসহ একটি সংকলন গ্রন্থ 'SHEAVES' প্রকাশ করেন ১৯২৯ সালে (ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ)

পত্র ১৪১। '১৩ই কনভোকেশন'—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ পাঠ করেন নিয়ম-সম্মত 'গাউন' পরিধান না করেই। এই ভাষণ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায় ছাত্র-সম্ভাষণ'। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাল্গুন ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

'ইংরেজি তর্জমায়'—'বোষ্টমীর' প্রথম ইংরেজি তর্জমা করেন সি. এফ. এণ্ড্রুজ। ম্যাকমিলানের 'Hungry Stones and other Stories' (১৯১৬) গ্রন্থে এটি সংকলিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত

'বোষ্টমী'র অনুবাদ 'The way faring Woman' মডার্ণ রিভিয়ু ডিসেম্বর ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এই তর্জমাটিই এই পত্রের অভিপ্রেত।

পত্র ১৪২। অরবিন্দ বসুকৃত বলাকার ৩৮ সংখ্যক কবিতার অনুবাদ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত হয়। অরবিন্দ বসু পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আরও অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এগুলি হল: The Flight of Swans (John Murray, 1955), The Herald of Spring (John Murray 1957), Wings of Death (ঐ ১৯৬০), Later Poems of Rabindranath Tagore (Peter Owen 1974), এবং Lipika (ঐ ১৯৭৭)

'Suggestion শব্দের তর্জমা'—শান্তিনিকেতন পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (১৩২৬) থেকে ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় জনৈক পত্রলেখক এ বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তাঁর একটি জিজ্ঞাসা ছিল, 'By suggestion I can cure you. The Great Power latent in this form of suggestiveness is well known.—suggestion ও suggestiveness-এর প্রতিশব্দ কি ?' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানান :

"সাধারণত বাংলায় suggestion ও suggestiveness-এর প্রতিশব্দ ব্যঞ্জনা ও ব্যঞ্জনাশক্তি চলিয়া গিয়াছে। কোনো বিশেষ বাক্য প্রয়োগে শব্দার্থের অপেক্ষা ভাবার্থের প্রাধান্যকে ব্যঞ্জনা বলা হয়। কিন্তু এখানে "suggestion শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে,

আভাসের দ্বারা একটা চিন্তা ধরাইয়া দেওয়া। এস্থলে 'সূচনা' ও 'সূচনাশক্তি' শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে।"

পৌষ সংখ্যার 'শান্তিনিকেতনে' রবীন্দ্রনাথ লেখেন "পূর্ববারে লিখিয়াছি হিপ্নটিজম প্রক্রিয়ার অন্তর্গত suggestion শব্দের প্রতিশব্দ 'সূচনা'। আমরা ভাবিয়া দেখিলাম সূচনা শব্দের প্রচলিত ব্যবহারের সহিত ইহার ঠিক মিল হইবে না। তাই ইংরেজি suggestion এর স্থলে 'অভিসংকেত' শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি।"

পত্র ১৪৩। এই পত্র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা, প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ১১৪-১১৬ এবং 'সিটি কলেজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিঠি'—প্রবাসী উপরিউক্ত সংখ্যা পৃ ৩০০।

পত্র ১৪৪। 'জন্মদিন কবিতাটি প্রবাসীতে মুদ্রণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এ বছর পঁচিশে বৈশাখ কবি কালিম্পঙে ছিলেন। 'অলইণ্ডিয়া রেডিও'র অনুরোধে কবি 'জন্মদিনে' কবিতাটি টেলিফোনে আবৃত্তি করেন। কলকাতার বেতারকেন্দ্র থেকে কবির আবৃত্তি প্রচারিত হয়। এই আবৃত্তি অবলম্বনে কোন কোন সংবাদপত্রে অসম্পূর্ণভাবে এটি মুদ্রিত হয়। কবি কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে কবিতাটি প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ১৪৫। 'রবিরশ্মি …ছাপাবেন না।'—উল্লিখিত পত্রটি পরে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় এবং তাঁর অনুমতিক্রমে প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৫ সালে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৪৮। য়োনে নোগুচি (১৮৭৫-১৯৪৭) জাপানের জাতীয়তাবাদী কবি ও শিল্পরসিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'From the Eastern Sea' (১৯০৩) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক মহলে তাঁর খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের পর তিনি ইংরেজিতে অনুবাদিত রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থসমূহের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবসমন্বয়মূলক উদার মনোভাবের প্রতি আকৃষ্ট হন। আদর্শের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নোগুচির একটি বিষয়ে মিল ছিল এই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা প্রচার করলেও উভয়েই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের হাত থেকে স্বদেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে অক্সফোর্ডে 'The Wisdom of the East' বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নোগুচি বলেন 'The reason why Tagore is received with so much respect and acclaim [in the West] is that he expresses the soul of his people with traditional feeling and religiosity...He is a poet who sums up all the traditional literature of the past.'[১]

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে ভ্রমণ করছিলেন তখন কোবে থেকে ট্রেনে টোকিও যাওয়ার পথে রবীন্দ্রসন্দর্শনে অত্যুৎসাহী নোগুচি রবীন্দ্রনাথের কামরায় প্রবেশ করে তাঁকে অভিনন্দিত

১. Stephen. N. Hay, Asia, Ideas of East and West (1970) p 86.

করেছিলেন। সেইসময় তিনি তাঁর স্বরচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। নোগুচি-রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা 'Sir Rabindranath Tagore' এবং প্রবন্ধ 'Tagore in Japan' মডার্ণ রিভিয়ুতে যথাক্রমে অগস্ট ও নভেম্বর ১৯১৬তে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে তিনি জাপানী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের জীবনী 'Indo-no-shijin' (The Indian Poet, Tokyo 1926) রচনা করেন। তাতে প্রসঙ্গত তিনি লেখেন—

"Japan is now in a crisis....In trying to over come this crisis Tagore's teachings offer us many suggestions. I do not agree with him completely but I do believe that almost all his opinions can help us in saving contemporary Japan".২

১৯৩৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক-রূপে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন। ঐ বৎসর নভেম্বরের শেষে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। ৩০ নভেম্বর আম্রকুঞ্জে তাঁর সংবর্ধনা হয়। পর বৎসর অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর জাপানের চীন আক্রমণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও নোগুচির মধ্যে আদর্শগত বিরোধ ঘটে। 'এশিয়াকে রক্ষার জন্য জাপানের পক্ষে চীন অধিকার প্রয়োজন' এই মর্মে নোগুচি ২৫ জুলাই ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি দেন। চীনের

---

২. ঐ গ্রন্থ পৃ ৩৩-৩৪

বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধাভিযানকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করবেন এই চিঠিতে নোগুচি এ রকম আশা ব্যক্ত করেন। নোগুচির এই পত্রের কথাই ১৪৭ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে তীব্র নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ ১ সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) এই পত্রের উত্তর দেন। ২ অক্টোবর নোগুচি এর এক স্পর্ধিত উত্তর দেন এবং রবীন্দ্রনাথ পুনরায় তার যথাযোগ্য উত্তর দেন।

নোগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পত্রবিনিময় Visva-Bharati Quarterly পত্রিকার Vol IV, Part 3 তে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে The Sino-Indian Cultural Society থেকে এটি Pamphlet-5 রূপে প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৪৯, ১৫০, ১৫১। রামানন্দলিখিত ৩১ সংখ্যক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই তিনটি পত্র পঠনীয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল সম্ভবত ১৯১৭ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে 'বিচিত্রা'র আসরে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বেশ কয়েক বছর পূর্বেই শরৎসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল। ১৩১৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যখন লেখক-নামবিহীন 'বড়দিদি'র ধারাবাহিক প্রকাশ হতে থাকে তখন রচনাশক্তির নৈপুণ্যের জন্য অনেকেই এটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে মনে করেছিলেন। শোনা যায়, এই প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথ 'বড়দিদি' পাঠ করেন এবং লেখকের অপূর্ব রচনাকুশলতায় মুগ্ধ হন। ভারতীর 'আষাঢ়' সংখ্যায়

(১৩১৪) 'বড়দিদি'র লেখকের নাম প্রকাশ পায়। শরৎচন্দ্র তখন ব্রহ্মদেশে।

১৯১৪ সালে শরৎসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের একটি বিবরণ পাওয়া যায় কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অসিতকুমার হালদারের পত্রে: "আমার বেশ মনে আছে ১৯১৭ সালে যখন পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারু এবং আমরা কজন গয়া, প্রয়াগ, বরাকর গুহা প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন চারুর দ্বারাই সাহিত্য জগতের দুটি মহৎ শিল্পীর পরিচয় ঘটেছিল। ট্রেন চলেছে, রবীন্দ্রনাথ বাইরের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে বসে আছেন। চলন্ত ট্রেনে রবীন্দ্রনাথের সামনে চারু শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত-মশাই' বইখানি অতিশয় সন্তর্পণে রেখে দিলে রবীন্দ্রনাথ বইখানি তুলে নিলেন এবং পড়া শেষ করে চারুকে বললেন 'চারু, তুমি আজ আমাকে নতুন করে বাঙালীর মনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলে।' পরমুহূর্তেই তিনি শরৎচন্দ্রের বইখানির আদ্যোপান্ত মনস্তত্ত্ব-ঘটিত বিশ্লেষণ করে গুণগান করলেন।" রবীন্দ্রভাবনা বৈশাখ ১৩৮৫, পৃ ৫৮।

১৯০৭ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' 'বিরাজ বৌ,' 'পরিণীতা' 'পণ্ডিতমশাই' 'পল্লীসমাজ' 'চন্দ্রনাথ,' 'বৈকুণ্ঠের উইল,' 'অরক্ষণীয়া' 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) প্রভৃতি প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালেই তিনি ব্রহ্মদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সংযোগের সূত্র পাওয়া যায় ২৯ পৌষ ১৩২৪ সালে (জানুয়ারি ১৯১৮) বাজে শিবপুর

থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্রে: 'আজ আমরা আপনার কাছে যাইতেছিলাম কিন্তু পথে শ্রীযুক্ত প্রমথবাবুর কাছে টেলিফোঁ করিয়া শুনিলাম আপনি বোলপুরে।' স্বভাবতই মনে হয় এই সময়ের পূর্বেই উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই বৎসর ১৮ মার্চ বিচিত্রার আসরে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শরৎচন্দ্র বিচিত্রার পরবর্তী অধিবেশনে (২৮ মার্চ, ১৯১৮) স্বরচিত নূতন গল্প পড়ে শোনাতে প্রতিশ্রুত হন। ঐ সভায় তিনি পাঠ করেছিলেন 'একটি গল্প'। দ্র নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৮৪৩-৪৪ ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ (১৯৮২ সং) পৃ ৩৫৬।

প্রবাসীতে শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনীকার নরেন্দ্র দেব ও প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দের মধ্যে যে মতান্তর ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৬ 'আলোচনা', পৃ ৭০০-৭০৩।

পত্র ১৫২, ১৫৩। এই সময়ে রামানন্দ যুক্তপ্রদেশের বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পত্র দ্বারা অবহিত করেছিলেন এবং এই সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্যের অনুকূলে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৪৬ এর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রকাশিত 'আগ্রা-অযোধ্যায় বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় বাধা' শীর্ষক আলোচনায় রামানন্দ লিখেছিলেন:

'...ঐ প্রদেশে এমন স্থায়ী বাসিন্দাও অনেক আছেন যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দুস্থানী নহে। তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীদের

সংখ্যাই বেশী। হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের নিজের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিবার ও পরীক্ষা দিবার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, বাঙালী ছেলেমেয়েদেরও সেই স্বাভাবিক অধিকার আছে, কারণ তাহারাও ঐ প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা এবং তাহাদের অভিভাবকেরা হিন্দুস্থানী অভিভাবকদের মত ট্যাক্স দিয়া থাকেন এবং পৌর কর্ত্তব্য পালন করেন।

...যে যে শহরে বাঙালীর সংখ্যা বেশী—হয়ত কয়েক হাজার বাঙালী বাস করে, সেখানে বাঙালী ছাত্রদের জন্য বাংলার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিবার, অন্ততঃ বাংলাভাষা শিক্ষা দিবার, ব্যবস্থা দাবী করা অন্যায় নহে।

যুক্তপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট যদি তাহাতেও রাজী না হন, তাহা হইলে আর একটি দাবী তাঁহারা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কোন মতেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সেটি এই :

এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কানপুর প্রভৃতি বড় বড় শহরে বাঙালীরা নিজের ব্যয়ে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া চালাইয়া আসিতেছে। কয়েকটি গত শতাব্দী হইতে চলিতেছে। বাঙালীদের এরূপ বালিকাবিদ্যালয়ও আছে। এইগুলিতে বাংলা শিখান হয় এবং শিক্ষণীয় সকল বিষয়ই বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া শিখান যাইতে পারে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট এই বিদ্যালয়-গুলিকে তাঁহাদের 'জানিত' (recognised) বিদ্যালয় বলিয়া মানিয়া লউন এবং তাহাদের ছাত্রছাত্রীদিগকে সরকারী পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করুন।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, অনুমতি পাইলে বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা কোন্ ভাষায় উত্তর লিখিবে? ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নের

উত্তর তাহারা হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের মত ইংরেজিতে দিবে, অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর তাহারা বাংলায় দিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানা ভাষার ও নানা ভাষায় পরীক্ষা করেন; পরীক্ষার্থী অল্প হইলেও প্রশ্নপত্র রচনা করান। অবাঙ্গালী-দের প্রতি বঙ্গে এ বিষয়ে যে ন্যায্য ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা হয়, বাঙালীরা বাংলার বাইরে স্থায়ী বাসিন্দা হইলে যদি সেইরূপ ন্যায্য ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার আশা করে তাহা অস্বাভাবিক নহে।

বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য আমরা যে ন্যায্য সুবিধাটুকু চাহিলাম, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যদি তাহাও দিতে নারাজ হয়, তাহা হইলে অন্য রকম একটি সুবিধা তাঁহাদের এডুকেশন বোর্ডের একটি নিয়ম অনুসারে চাহিতে পারা যায়। এই নিয়মে আছে যে বোর্ডের চেয়ারম্যান বা তাঁহার নামিত কোন ব্যক্তি ("his nominee") ইচ্ছা করিলে কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার সকল বিষয়েরই উত্তর ইংরেজীতে দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। এই বৈকল্পিক নিয়মটি, যে-সব পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা ইংরেজী, তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত করা হইয়া থাকিবে। তাহাদের সম্বন্ধে যে সুবিবেচনা দেখানো হইয়াছে, বাঙালী ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সেই সুবিবেচনা করা অস্বাভাবিক বা অন্যায় নহে। এইজন্য আমরা বলি, 'বাঙালী ছেলেমেয়েদিগকে যদি উত্তর বাংলাতে লিখিবার অনুমতি না-দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইংরেজীতেই উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া হউক।' এবং এই অনুমতি প্রদান কাহারও মর্জিসাপেক্ষ না রাখিয়া এই নিয়ম অনুসারে করিবার ব্যবস্থা হউক যে, হিন্দুস্থানী যাহাদের মাতৃভাষা নহে, সেইরূপ পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা

করিলে পরীক্ষার সকল বিষয়ে তাহাদের উত্তর ইংরেজিতে লিখিতে পারিবে। তাহা হইলে এখন পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশের সমুদয় ভারতীয় ছাত্ররা যেমন নানা বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ইংরেজীতে দিয়া আসিতেছে, বাঙালী পরীক্ষার্থীরা অতঃপরও তাহা পারিবে।' প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৬, পৃ ৭১৫-৭১৬। এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য 'যুক্তপ্রদেশে বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য', 'যুক্তপ্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা'—প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৬ পৃ ৮৫৮-৮৫৯।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দ্বিভাষিক অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম কিভাবে নিরূপিত হবে এ বিষয়ে বরদৌলিতে ১১. ৩. ৩৯ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য Pattabhi Sitaramayya, The History of the Indian National Congress Vol II, p 89.

পত্র ১৫৫। রামানন্দের কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাবলী ১৯১১-১৯৪০ ধারাবাহিকভাবে প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪৮ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবাসীতে প্রকাশিত এই পত্রগুচ্ছ অন্যান্য পত্রসহ বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত। উল্লিখিত চিঠিসমূহ এই সংকলন-গ্রন্থে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পত্র ১৫৬। রথীন্দ্রনাথের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হয় বার্লিনে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে। এই সময়ে য়ুরোপভ্রমণে লর্ড সিংহ ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অন্য সঙ্গীরা ছিলেন শ্রীনিকেতনের কর্মী শ্রীলাল, তৎকালীন ত্রিপুরাধিপতির ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, প্রশান্ত মহলানবিশ এবং নির্মলকুমারী মহলানবিশ।

পত্র ১৫৮, ১৫৯। উল্লিখিত 'সেই চিঠিখানা' এবং 'এই লেখাটি' বর্তমান সংকলনের ১০০ সংখ্যক পত্র।

পত্র ১৬১। এই পত্র রামানন্দের ৪৭ সংখ্যক পত্রের উত্তরে লিখিত। এই প্রসঙ্গে রামানন্দের ৪৮ সংখ্যক পত্রও দ্রষ্টব্য। বস্তুত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি-তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায় না।

পত্র ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ও ১৬৬— এই কটি পত্রে উল্লিখিত গল্পটি 'বদনাম'। এটি প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৬৪। উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলি 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ও সাহিত্যের উৎস' নামে 'কবিতা' পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

পত্র ১৬৬। 'ওর মধ্যে···রাখবেন।' উল্লিখিত বিষয় 'সাহিত্য, শিল্প' প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮ সালে মুদ্রিত এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে 'সত্য ও বাস্তব' নামে সংকলিত হয়।

মিস্ র‍্যাথবোনকে লিখিত খোলা চিঠির মূলানুগ অনুবাদ, প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ মুদ্রিত হয়েছিল। সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে অনুবাদকের নাম অনুল্লিখিত থাকে।

পত্র ১৬৭। 'তাই চিত্র···পাঠিয়েছি'—এটি 'সাহিত্য গান ছবি' নামে প্রবাসীতে আষাঢ় ১৩৪৮ এ মুদ্রিত হয়েছিল। এর কিয়দংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী ১৯৭৬) ১৪ খণ্ডের 'গ্রন্থ পরিচয়ে' সংকলিত হয়েছে।

পত্র ১৬৮। উল্লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে দ্রষ্টব্য নির্মলকুমারী মহলানবিশ, কবির সঙ্গে য়ুরোপে, (১৩৭৬) ভূমিকা।

পত্র ১৬৯। দ্রষ্টব্য রামানন্দ-লিখিত ৬২ সংখ্যক পত্র।

সংযোজিত পত্র ১। গ্রন্থটি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা থেকে

সম্ভবত ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩১৮র 'প্রবাসী বিজ্ঞাপনী'তে গ্রন্থটির বিজ্ঞপ্তি এইরূপে পাওয়া যায়:

আরব্যোপন্যাস (সচিত্র) ১৷৷০ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, সম্পাদিত। অশ্লীল অংশ পরিবর্জিত। বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী করিয়া প্রকাশিত। উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

পত্র ২। শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর চিত্রকলা সম্পর্কে কবির অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য ক্ষণিকা, (দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সংখ্যা) ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৮০।

পত্র ৩। এই পত্রে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ১৩০ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ১। এই পত্র-কবিতাটি ১৯৩২ সালে কবির পারস্য ভ্রমণকালে তাঁর জন্মদিনে ৬ মে রচিত হয়। রচনাকাল ২৫ বৈশাখ ১৩৩৯ এর পরিবর্তে ভ্রমক্রমে '১৩৩২' লিখিত হয়েছে। এটি ঈষৎ সংশোধিত-রূপে 'পরিশেষ' (ভাদ্র ১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পত্র ২। 'ছবিগুলোর…হবে।' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রামানন্দকে লেখা ১১৪ ও ১১৫ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী হয় ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩১ (৯ পৌষ ১৩৩৮) সালে কলকাতা-টাউন হলে।

২০-২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ গভ: আর্টস্কুলে রবীন্দ্রনাথের অপর একটি চিত্র-প্রদর্শনী হয়। এই উপলক্ষে সেই সময়ে কুড়িটি চিত্র "Illustrated Catalogue"-এ মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রথম মুদ্রিত প্রকাশ 'চিত্রলিপি'। (বিশ্বভারতী সেপ্টেম্বর ১৯৪০)

অশোক চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ১। 'তোমার বিদ্রূপের···খুসি হই'— বাংলা সাহিত্যে বহু-নিন্দিত এবং বহু-প্রশংসিত 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই ১৩৩১ এর ১০ শ্রাবণ (১৯২৪, ২৬ জুলাই) প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি'র সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে প্রথম দিকে এর যোগ ছিল না। তখন সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাস এবং কর্মাধ্যক্ষ হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। এই পত্রিকা প্রধানত সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণের উদ্দেশ্য নিয়েই পরিকল্পিত হয়েছিল। অশোক চট্টোপাধ্যায় নিজেও ব্যঙ্গরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর লেখা 'আনন্দবাজার' গল্পসংগ্রহটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'শনিবারের চিঠি'তে যে-সব বেনামী ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশিত হত, তার অন্যতম লেখক ছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র কয়েকটি সংখ্যাতে উদীয়মান কবি নজরুল ইসলামের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষণ করে পদ্য প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' এবং 'কালিকলমে'র সঙ্গেও এই সূত্রেই 'শনিবারের চিঠি'র সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' ৯ ফাল্গুন ১৩৩১ সংখ্যাতেই শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তী পর্যায় মাসিকরূপে দেখা দেয়। কিন্তু অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৩৩২ এর কার্তিক সংখ্যাতেই এই পর্যায় শেষ হয়।

সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাস এবং সহকারী সজনীকান্ত দাস।

তৎপরবর্তী পর্যায় ৯ ভাদ্র ১৩৩৪ থেকে আরম্ভ হল। এই পর্যায়েই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। অশোক চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি এই সময়েরই। সজনীকান্তের আত্মস্মৃতিতে (১ম খণ্ড, ১৩৬১, পৃ ২৫৯-৬০) অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করে এই চিঠিটি মুদ্রিত হয়েছে। 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গকুশলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত তাঁর চিঠিতেও সপ্রশংস উল্লেখ করেন: "'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্টএর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট পদার্থের একটা গৌরব আছে—তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গ সাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্বজনীন মনুষ্য-লোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা গলিতে নয়।" দ্র শনিবারের চিঠি মাঘ ১৩৩৪।

অতঃপর ৪ ও ৭ চৈত্র ১৩৩৪-এ জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'য় আহূত বিখ্যাত সাহিত্যসভায় বাংলাসাহিত্যে 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সভার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'সাহিত্য সমালোচনা' প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ২২২-২২৭।

'শনিবারের··· হলেও' এ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস লেখেন "আমরা কার্তিক সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা' বিভাগে কোনও মহিলা লেখিকার গল্প হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া

তাঁহার সামাজিক লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে 'শনি-বারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে কিছু লিখিতে আহ্বান' করিলাম।" সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি (১৩৬১) ১ম খণ্ড, পৃ ২৬০।

পত্র ২। 'অক্টোবরের··· যোগ্য' Ernest Lothar রচিত লেনিন এবং গান্ধী সম্পর্কিত এই লেখাটি ভিয়েনার 'Neue Freie Presse' থেকে 'Living Age' পত্রিকায় উদ্ধৃত। এরই কিয়দংশ রবীন্দ্র-নাথের অনুরোধে মডার্ণ রিভিয়ু ডিসেম্বর ১৯২৭-এ মুদ্রিত।

'Mother India' সম্পর্কিত উল্লিখিত চিঠিটি মডার্ণ রিভিয়ু ডিসেম্বর ১৯২৭ এর 'Notes' অংশে মুদ্রিত।

শান্তাদেবীকে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ২। 'ডায়ারির কথা'—পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি।

পত্র ৫। 'ইংরেজি লেকচার — সম্ভবত প্রথম ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেসে প্রদত্ত অভিভাষণ। ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৫-এ রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে 'The Philosophy of Our People' পাঠ করেন। এইটি Visva-Bharati Quarterly Vol III তে (জানুয়ারি-মার্চ ১৯২৬, পৃ ২৯১-৩১১) এবং মডার্ণ রিভিয়ু, জানুয়ারি ১৯২৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৬। ঢাকায় বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে সংবর্ধনা জানানো হয় তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি এবং ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত বক্তৃতা। (৭-১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) আনন্দবাজার পত্রিকা (১৫ ফেব্রু '২৬)।

সবুজপত্র (চৈত্র ১৩৩২), প্রবাসী (মাঘ ১৩৩২) প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ১০। 'বৃক্ষ জন্মের কবিতা'—'বৃক্ষদেবের জন্মোৎসব' 'বৃক্ষবন্দনা' এবং তেজেশচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠি 'গাছপালার প্রতি ভালবাসা' প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩৪-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ১১। 'নববর্ষের বক্তৃতা'—শান্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ 'নববর্ষ' নামে প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৪-এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৪। 'একটি মেয়ে'—মহিমচন্দ্র সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কাদম্বিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর কয়েকটি পত্র পৌষ ১৩৩৪ থেকে ধারাবাহিকরূপে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ৭।

পত্র ১৫। 'সংস্কার' গল্পটি প্রবাসীতে আষাঢ় ১৩৩৫-এ মুদ্রিত হয় এবং পরে 'গল্পগুচ্ছে' সংকলিত হয়।

পত্র ১৬। এই বৎসর ১৭-২০ মার্চ কলকাতায় জুজুৎসু প্রদর্শনীর পরে রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় 'নবীন' এর অভিনয় হয়েছিল।

কালিদাস নাগকে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ১। ১৯১৬-১৭ সালে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম' সম্পর্কে বক্তৃতার পর এদেশের জাতীয়তাবাদী মহলে তার বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দাশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে যে ভাষণ দেন (বাঙ্গলার কথা, 'নারায়ণ' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪-এ প্রকাশিত, পরে পুস্তকাকারে 'দেশের কথায়' মুদ্রিত)

তাতে বলেন 'এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানব জাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে।

...এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ, এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় ওই মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন।'—দেশবন্ধু রচনাসমগ্র (১৩৮৪) দেশের কথা, পৃ ২১। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীয় সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করছেন। দ্রষ্টব্য—রামানন্দের কাছে লিখিত পত্রসংখ্যা ৫০ ও এই পত্রের পরিচয়।

পত্র ২। এই বৎসর (১৩২৪) জগদীশচন্দ্র বসু সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ সহ-সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পত্র ৫। 'বিশ্ববিদ্যাগ্রন্থ' প্রকাশ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য রামানন্দের ৫১ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

পত্র ৭। এই পত্রে উল্লিখিত অস্ট্রেলিয়ায় বক্তৃতাদান ও ইংরেজিচর্চার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৩ কার্তিক, ১৩২৬-এ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ; দ্র চিঠিপত্র ৫, পৃ ২৬৪।

রবীন্দ্রনাথের অস্ট্রেলিয়া যাওয়া শেষ পর্যন্ত ঘটেনি।

পত্র ৮। কবি এই বছর পূজাবকাশে ১১ থেকে ৩১ অক্টোবর শিলংএ কাটান। শিলং থেকে ৩১ অক্টোবর রওনা হয়ে তিনি ঐ দিন গৌহাটী পৌঁছেন। কবির গৌহাটী অবস্থানকালে (৩১ অক্টোবর—২ নভেম্বর) জনসাধারণের পক্ষ থেকে জুবিলী পার্কে, সাহিত্য

পরিষদের গৌহাটী শাখার পক্ষ থেকে কার্জন হলে এবং অসমীয়া মহিলাদের তরফ থেকে আইনকলেজ হলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ গৌহাটী সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় সঙ্কলিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সত্যভূষণ সেন, গৌহাটীতে রবীন্দ্রনাথ, কবিপ্রণাম (১৩৪৮), পরিশিষ্ট পৃ. ২২-২৪।

কবি শিলংএ থাকাকালে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সম্পাদক গোবিন্দনারায়ণ সিংহের এবং শ্রীহট্টের অন্যান্য সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের অনুরোধক্রমে তিনি শ্রীহট্টভ্রমণে সম্মত হন। কবি গৌহাটী থেকে আসাম বেঙ্গল রেলপথে যাত্রা করে ৫ নভেম্বর (১৯১৯) শ্রীহট্টে পৌছেন এবং সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন।

৬ নভেম্বর সকালে শ্রীহট্ট টাউনহল প্রাঙ্গণে জনসাধারণের প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে কবি প্রায় 'দেড়ঘণ্টাকাল' বক্তৃতা করেছিলেন। এটি পরে 'বাঙালীর সাধনা' নামে প্রবাসী পৌষ ১৩২৬-এ মুদ্রিত হয়। ওই দিন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে কবি মহিলা সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় টাউনহলের বিপুল জনসমাবেশে তিনি পুনরায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা অনুলিখিত না হওয়ায় মুদ্রিত হয় নি। ঐ সভার শ্রোতা, গোবিন্দনারায়ণ সিংহের পুত্র সুধীরেন্দ্রনারায়ণ পরে লেখেন 'আজো আমার সেদিনকার কথা সুস্পষ্টরূপে মনে আছে। বক্তৃতা সুরু হল প্রথমে খুব ধীরে ধীরে, কণ্ঠস্বর কানে পৌছায় না। তারপর আস্তে আস্তে কণ্ঠ তাঁর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগল। কবি

সে-বক্তৃতায় আমাদের দেশের দুর্দশার যথার্থ হেতু বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন যে নিম্ন বর্ণের লোকদের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা ও অপ্রীতিই ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ। ভারতবর্ষের পক্ষে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া। তিনি আশা করেন যে একদিন পৃথিবীর এক ধর্ম হবে। সেদিন স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধবে না। বিভেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পাদপীঠ হবে ভারতবর্ষই কেননা, এখানে যত ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহার বর্ণগত পার্থক্য-বিশিষ্ট নরনারীর বাস পৃথিবীর আর কোথাও তত নয়। উপসংহারে বল্লেন "সূর্য্য পূর্বদিকেই উদিত হয়। বাংলা দেশ ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। সমগ্র ভারতবর্ষ তাই আজ বাংলার দিকে আশা করে চেয়ে আছে। বাঙালীকেই আজ ভারতের এই জনজাগরণযজ্ঞে পৌরোহিত্য করতে হবে।" মনে আছে এই বক্তৃতায় এক জায়গায় কবি বলেছিলেন—"এক নয়, দুই নয়, বহু বহু রাজা আমাদের শোষণ করছেন।" তা ছাড়া এ কথাও বলেছিলেন—"কাগজের নৌকোতে ক'রে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না।" মানে দরখাস্ত পেশ করে স্বরাজ মেলে না। "অধর্মেন এধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি'—তাঁর প্রিয় এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে তার তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।'[১]

৭ নভেম্বর, মুরারিচাঁদ কলেজ ছাত্রাবাসে প্রায় চার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ছাত্ররা কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এর

১ সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ, কবিপ্রণাম (১৩৪৮) পরিশিষ্ট পৃ. ৫

উত্তরে কবি প্রায় একঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করেন। কবি-প্রদত্ত এই ভাষণ পরে 'আকাঙ্ক্ষা' নামে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় পৌষ ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়। শ্রীহট্টে রবীন্দ্র সংবর্ধনার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ, কবি-প্রণাম (১৩৪৮) পরিশিষ্ট পৃ ১-৮।

শ্রীহট্ট থেকে চাঁদপুর-গোয়ালন্দের পথে কবি ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় এবং তার পরদিন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছেন।

পত্র ৯, ১০। লণ্ডন থেকে জাহাজে রওনা হয়ে ১৯২০ সালের ২৮ অক্টোবর রাত্রে কবি নিউইয়র্ক পৌঁছেন। তিনি আমেরিকা ত্যাগ করেন ১৯ মার্চ ১৯২১-এ। এই সময়ে, কবির আমেরিকা অবস্থান কালে ৯ এবং ১০ সংখ্যক পত্র লিখিত।

কবি হার্ভার্ডে বক্তৃতা করেন জানুয়ারি ১২ ও ১৩ তারিখে। বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'The Folk Poets of Bengal' এবং 'The Meeting of East and West'। ৯ এবং ১০ সংখ্যক পত্র স্পষ্টতই এই তারিখের পূর্বে লিখিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই সময়ে এণ্ড্রুজের কাছে লিখিত এক পত্রে[১] কবি হার্ভার্ডের বক্তৃতা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন 'I am going to read my lecture on the Poet's Religion to-night to the Wellesley College students. To-morrow and the day after I have to read two more lectures in Emerson Hall, Harvard" এই পত্রের

১ Modern Review July 1922 p7 দ্র Letters From Abroad (1924) p.59

তারিখ ২৫ জানুয়ারি ১৯২১। কিন্তু তারিখটি সম্ভবত ভ্রমাত্মক। আমেরিকার তৎকালীন সংবাদপত্র Evening Globe এর ১২ জানুয়ারির সংখ্যায় কবি-প্রদত্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত খবরটি মুদ্রিত হয়:

'Wellesley Jan 12. Dr. Rabindranath Tagore, the famous Indian mystic philosopher and poet addressed a large audience of Wellesley faculty and students at the Houghton Memorial chapel on the college campus, at 8. 15 last evening. The address was in the form of a paper on the subject "The Poet's Religion" read by R. Tagore, the author and was philosophical and symbolic in form and content' ২

৬ জানুয়ারি বোস্টন থেকে অপর এক সংবাদে প্রকাশ:

'Dr. Rabindranath Tagore, oriental philosopher and poet, will spend two days at Harvard next week speaking Wednesday and Thursday afternoon at 4-30 O'clock in the new lecture hall'৩

উল্লেখযোগ্য ১২ ও ১৩ জানুয়ারি (১৯২১) যথাক্রমে বুধ ও বৃহস্পতিবার ছিল।৪

২, ৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সংবাদপত্র-কর্তিকা 1921.

৪ J. G. Jethabhai 100 years' Indian Calendar (3rd Ed. 1932), p 305

'হার্ভার্ডে……হবে না।' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কালিদাস নাগের পত্র, প্যারিস, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ১৯২১।[৫]

পত্র ১০। 'আমার গানের……জানিয়ো' —এই তর্জমা সম্ভবত সিলভ্যাঁ লেভিকৃত 'মাটীর প্রদীপ' ও 'জনগণমনের' ফরাসী তর্জমা।

জানুয়ারি ১৯২১-এ প্যারিসের ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ ও বণিকদের সম্মিলিত উদ্যোগে 'হিন্দুস্থান সভা'র প্রতিষ্ঠা হয়। এই উপলক্ষে সিলভ্যাঁ লেভি বক্তৃতা করেন এবং 'মাটীর প্রদীপ' গানটি ছন্দে অনুবাদ করেন। গানটি গীত হওয়ার পূর্বে অনুবাদটি তিনি সভাস্থ সকলকে শোনান। এবিষয়ে কালিদাস নাগ লিখেছিলেন 'তাছাড়া "জনগণ" গানটিও —এত প্রিয় হয়ে উঠেছে যে সেটিও Levi অনুবাদ করে প্রোগ্রামে ছাপিয়েছেন।' দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কালিদাস নাগের পত্র, ১৪ জানুয়ারি ১৯২১।

রবীন্দ্রনাথের গানের তর্জমা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সিলভ্যাঁ লেভির পত্র:

'……I have now done with the translations into free verse of your pieces selected by Kalidas Nag; I wish to make them known (anonymously as for my part) to the French public.'[৬]

সম্ভবত লেভির জীবিতকালে এই সব অনুবাদের প্রকাশ হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালে ফরাসী ভাষায় লিখিত '50 unpublished poems of Rabindranath Tagore

৫ রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

৬ রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত

Translated from Bengali by Sylvian Levi' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

পত্র ১১। অগস্ট ১৯২০-তে রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে এসে এখানকার ধনী ব্যবসায়ী কাহ্‌নের (Albert Kahn) 'Autour dumonde' নামক বাগানবাড়ীতে কিছুদিন বাস করেছিলেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এবারেও তিনি এখানে উঠেছিলেন। সিলভ্যাঁ লেভি এই সময়ে ষ্ট্রাসবুর্গে ছিলেন।

পত্র ১২। দান্তের সপ্তম শতাব্দিক উৎসব ফ্লোরেন্সে সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কবি এই সময়ে 'শিশু ভোলানাথের' কবিতাগুলি রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

পত্র ১৫। শেষ পর্যন্ত এই সমাবর্তনে কবির যাওয়া হয়নি।

পত্র ১৬। এই পত্রে উল্লিখিত রোমাঁ রোলাঁকে লিখিত (২১ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন) রবীন্দ্রনাথের চিঠি রোমাঁ রোলাঁর 'Inde' গ্রন্থে (1960 Editions Albin Michael) এবং অবন্তীকুমার সান্যাল অনুবাদিত এই বইয়ের বাংলা তর্জমা 'ভারতবর্ষে' (র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব ১৯৭৬, পৃ ৫১-৫৩) প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিটিতে পিয়ার্সনের চরিত্র-মহত্ব আলোচিত হয়েছে।

'সনেট'টি বৈশাখ ১৩৩১-এ 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং পরে 'পূরবী' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

পত্র ১৭। এইসময়ে হারুনামারু জাহাজে রচিত কবিতাগুলি 'পূরবী' গ্রন্থে সংকলিত হয়। কবি ফ্রান্সের শেরবুর্গ বন্দর থেকে পেরু যাত্রার পথে জাহাজে অসুস্থ অবস্থায় 'ঝড়' কবিতাটি রচনা

করেন। এর ইংরেজি 'Tempest' মডার্ণ রিভিয়ু মার্চ ১৯২৫-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৮। 'আজকাল আমার···স্বপ্নলোক বানিয়েছি।' সম্ভবত 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্গত 'ক্ষণিকা', 'খেলা', 'কৃতজ্ঞ', 'কিশোরপ্রেম', 'তারা', 'মিলন', 'অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতা।

'ডায়ারি'— 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' প্রবাসী ,অগ্রহায়ণ ১৩৩১ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত।

'আজ······কবিতা লিখেচি' কবিতাটি 'মিলন'— পূরবী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

পত্র ১৯। কালিদাস নাগ এ সময়ে প্রথমে ধলভূমে এবং পরে ঘাটশিলায় অবস্থান করছিলেন।

পত্র ২১। এই পত্র প্রসঙ্গে রামানন্দের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৭৮ সংখ্যক পত্র এবং এই পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ২২। দ্রষ্টব্য রামানন্দের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৭৯।

পত্র ২৩। এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চলছিল।

'আমার নিজের··· করি।' প্রসঙ্গত তুলনীয় 'অবশ্য ধর্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করি নে।' চিঠিপত্র-৯, পত্র ১০৩, পৃ ১৮০।

পত্র ২৪। অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ বাগচী ও কালিদাস নাগের উদ্যোগে 'বৃহত্তর ভারত পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে কবির যবদ্বীপ ভ্রমণের পূর্বে কবিকে তাঁরা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন।

পত্র ২৮। 'রায় মহাশয়ের প্রশস্তিবাদ'— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে।

পত্র ২৯। Wilberforce সম্পর্কিত বাণীটি Visva-Bharati News (Aug 1933)-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

সীতাদেবীকে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ২। তর্জমাটি সম্ভবত 'তপোবন' (প্রবাসী ১৩১৬, পৌষ) অবলম্বনে 'Message of the Forest'। এটি ১২ জানুয়ারি ১৯১৯-এ বাঙ্গালোরে কানাড়ী শিল্পসঙ্ঘের অভ্যর্থনায় কবির পঠিত ভাষণ। 'মডার্ণ রিভিয়ু' মে ১৯১৯-এ এটি প্রকাশিত হয় এবং পরে সংশোধিত আকারে 'The Religion of the Forest' নামে 'Creative Unit'y গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রামানন্দের পত্র-প্রসঙ্গ

পত্র ১। 'প্রদীপে…কবিতাটি'—কবিতাটি 'যাচনা', ৭ আষাঢ় ১৩০৫-এ রচিত এবং 'প্রদীপ' শ্রাবণ ১৩০৫-এ মুদ্রিত।

এটি পরে 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।

দেশীয় শিল্প ও পণ্যজাত দ্রব্য সম্পর্কে যাতে দেশের শিক্ষিত লোকদের একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মে এজন্য জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে 'বেনোজল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশজাত এই সব দ্রব্যের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। প্রসঙ্গত পাঠকদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন 'সুবিধা ও অবসরমত একটু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক নিজ নিজ জেলায় যত প্রকার দেশী জিনিষ প্রস্তুত হয় তাহার ঠিকানা,

কারিকরের নাম-ধাম, মূল্য, পরিমাণ, কলিকাতায় পাঠাইবার উপায় ও খরচা প্রভৃতি সম্বন্ধে তালিকা এবং যদি সম্ভব হয় নমুনাদি পাঠাইয়া আনুকূল্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।'

পত্র ২। 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যায় প্রকাশিত এবং আষাঢ় ১৩২৪-এ 'নারায়ণ' পত্রিকায় উদ্ধৃত 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তরে 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধটি রচিত এবং সবুজপত্র আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৩। 'The Nation' প্রবন্ধটি মডার্ণ রিভিয়ু জুলাই ১৯১৭ তে মুদ্রিত হয় এবং পরে সংশোধিতরূপে 'Creative Unity'-তে (Macmillan 1922) সংকলিত হয়।

এই পত্রের পরবর্তী প্রসঙ্গের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫২ ও ৫৩।

পত্র ৬। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ৭৭।

পত্র ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ র জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ৮৭, ৮৮, এবং ৮৯।

পত্র ১২। 'ইন্দিরা দেবীর…কবিতা'-এ দুটি A Prayer (ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু) এবং I Know My Days Will End (জানি গো এ দিন যাবে)

পত্র ১৩। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের ৯৯ সংখ্যক পত্র এবং উক্ত পত্রের পরিচয়।

পত্র ১৪। এই পত্র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ৯৯ এবং ১০০।

পত্র ১৬। ১৫ আশ্বিন ১৩৩৮ সালে শান্তিনিকেতনে মহাত্মাজির জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি 'মহাত্মা গান্ধী' শিরোনামে প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ এ প্রকাশিত হয়েছিল। এর

ইংরেজি অনুবাদ MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI. মডার্ণ রিভিয়ু, জানুয়ারি ১৯৩২-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এটিক •নীচে উল্লিখিত হয়: Translated by a journalist for the Modern Review from the Poet's Pengali speech at Santiniketan on Gandhiji's last birthday as published in PRABASI. Printed with the Poet's approval.

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ মস্কোতে চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'The Meaning of My Pictures' এই নামে তাঁর নিজের ছবি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে এই ভাষণটির প্রতিলিপি মডার্ণ রিভিয়ু জানুয়ারি ১৯৩২-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

'ছবি চারিখানি'—মডার্ণ রিভিয়ু, জানুয়ারি ১৯৩২ সালে এবং প্রবাসী মাঘ ১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের চারিখানি ছবি মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৮। 'ব্রেলস্‌ফোর্ডের বহি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি'—হেনরী নোয়েল ব্রেলস্‌ফোর্ড-কৃত 'Rebel India' (London 1931) বইটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা 'Rebel India' মডার্ণ রিভিয়ু, জানুয়ারি ১৯৩৩-এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ২০। এই পত্র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১২৩ এবং উক্ত পত্রের পরিচয়।

পত্র ২১। 'একটি চিঠি পাইয়াছি'— এটি সম্ভবত এই বৎসর ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য আহ্বান পত্র।

'তপোবন' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের রচনা 'The Message

of the Forest' মডার্ন রিভিয়ু যে ১৯১৯ এ প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ২২। এই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চর 'একজন লোক' কবিতাটির অনুবাদ 'A Person,—An Oldish Upcountry-man'— পাঠিয়েছিলেন। দ্র রবীন্দ্রনাথের ১৩৩ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

পত্র ২৪। মহিলাসম্মেলন ও প্রবাসীর জন্য কবিতা-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৩৫।

পত্র ২৬। মডার্ন রিভিয়ু, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭-এ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় অনুবাদিত ('Morning') তোমারি নামে নয়ন মেলিনু 'এবং ('The Night Lamp' 'ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া') মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ২৭। অরবিন্দ বসু-কৃত তর্জমা এবং Suggest ও Suggestion এর বাংলা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৪২ এবং ঐ পত্রের পরিচয়।

পত্র ২৮। দ্রষ্টব্য পত্র ১৪৮ এবং উক্ত পত্রের পরিচয়।

পত্র ৩১। শরৎচন্দ্রের প্রবাসীতে লেখা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৪৯, ১৫০, ১৫১ এবং উক্ত পত্রসমূহের পরিচয়।

পত্র ৩২। এপ্রিলের (১৯৪০) মডার্ন রিভিয়ুতে রবীন্দ্রনাথের 'Poem : Raidas the Sweeper, was a tanner by caste' (পুনশ্চর : রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো) কবিতাটি মুদ্রিত হয়।

পত্র ৩৩। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৫৪।

পত্র ৩৫, ৩৭। অমিয় চক্রবর্তী ও ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক যুগ্মভাবে কৃত-

'ঐকতান' কবিতাটির অনুবাদ 'The Great Symphony' মডার্ণ রিভিয়ু মার্চ ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়। 'গান্ধি মহারাজ' কবিতাটির কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ 'Gandhi Maharaj' মডার্ণ রিভিয়ু এপ্রিল ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়।

'তিনসঙ্গী'র ইংরেজি অনুবাদ সম্ভবত হয় নি।

পত্র ৩৮। 'নূতন চিঠিটি'—এটি রামানন্দের নিকট লিখিত ১৫৫ সংখ্যক চিঠি, প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮-এ এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

পত্র ৩৯। ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনুবাদিত ও কবি কর্তৃক সংশোধিত 'জন্মদিন' কবিতাটির ইংরেজি তর্জমা 'BIRTHDAY' মডার্ণ রিভিয়ু, মে ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৪০। 'একটি চিঠির প্রুফ'— এট রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বর্তমান সংকলনের ১০০ সংখ্যাক চিঠির প্রুফ।

পত্র ৪১। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৫৮ ও ১৫৯।

পত্র ৪২। 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধটি ১৩৪৮ এর জন্মদিনে পাঠ করবার জন্য রচিত। পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। ১ বৈশাখ ১৩৪৮, সায়াহ্নে রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে এটি উদয়ন প্রাঙ্গণে ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক পঠিত হয়েছিল। কিঞ্চিৎ সংশোধিতরূপে প্রবন্ধটি প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮-এ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণটি প্রথমত যে আকারে লিখিত ও দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন এবং নূতন কিছু বাক্যও ইহাতে যোগ করিয়াছেন। "প্রবাসী"র এই সংখ্যায় যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ভাষণ। ইহা

আলাদা পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে বিক্রীর জন্য রাখা হইয়াছে।

ইহার যে ইংরেজি অনুবাদ "Crisis of Civilization" নাম দিয়া দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, কবি তাহারও সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। সেই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পাঠ মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে।'

পত্র ৪৩। উল্লিখিত পত্র রামানন্দকে লিখিত ১৬০ সংখ্যক পত্র, প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ৪৫। জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' অংশে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, যেমন 'বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গণ্য করা হউক', 'রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গীতালির গান', 'সাধারণ লোকদের জন্য রবীন্দ্রসংগীত সভা', 'নিখিল ভারত রেডিও ও বাংলা ভাষা', 'রবীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথ', 'বিশ্বভারতীর স্বাতন্ত্র্য কেন আবশ্যক', 'রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ কৃতি ও বাঙালীর কর্তব্য' ইত্যাদি। যে দুটি বিষয় রবীন্দ্রনাথের অবগতির জন্য পাঠানো হয়েছিল সম্ভবত উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলির প্রথমটি তার অন্যতম। অপরটি নিতান্তই অনুমান সাপেক্ষ।

পত্র ৪৬। 'সাহিত্যে চিত্র বিভাগ' জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতেই মুদ্রিত হয়।

পত্র ৪৭, ৪৮। সাহিত্যপরিষদের সভাপতিত্বের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পর্কে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র।

পত্র ৫০। ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৮ ও ৫৯ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত গল্পটি 'বদনাম', প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪ ও ১৬৫ সংখ্যক পত্রে এই গল্পটির

মুদ্রণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়।

পত্র ৬০। এই পত্রে উল্লিখিত নূতন লেখাটি 'সাহিত্যশিল্প'—প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ মুদ্রিত। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের ১৬৬ সংখ্যক পত্র ও এই পত্রের পরিচয়।

পত্র ৬১। ভ্রমণবৃত্তান্তটি প্রবাসী বা মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত হয় নি। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের ১৬৮ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

পত্র ৬২। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৬৯।

ব্যক্তি-পরিচয়

অজিত	অজিত চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮), শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক
অনাদি	অনাদিকুমার দস্তিদার (১৯০৩-১৯৭৪), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও সংগীতশিক্ষক
অনিল	অনিলকুমার চন্দ (১৯০৬-১৯৭৬), রবীন্দ্রনাথের এককালীন একান্ত সচিব
অপূর্ব	অপূর্বকুমার চন্দ (১৮৯২-১৯৬৬), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক
অমল	গগনচন্দ্র হোমের পুত্র অমল হোম (১৮৯৪-১৯৭৫), সাংবাদিক
অমিয়	কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১—) রবীন্দ্রনাথের এককালীন একান্তসচিব
অরবিন্দ	অরবিন্দ বসু (১৮৯৫-১৯৭৭) জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয়। দ্রষ্টব্য ১৪২ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

অরুণ	অরুণকুমার সেন দীনেশ সেনের পুত্র, কবি সমর সেনের পিতা
অসিত	অসিতকুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪), প্রথমে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ও পরে জয়পুর ও লক্ষ্ণৌর শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।
আগা খাঁ (তৃতীয়)	আগা সুলতান মহম্মদ শাহ (১৮৭৭-১৯৫৭) ইসমাইলী মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা।
'আমার বড় মেয়ে'	মাধুরীলতা দেবী (১৮৮৬-১৯১৮)
আশু	বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪) প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ
আশু মুখুজ্জে	বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)
ইন্দিরা	ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী।
এনাটোল ফ্রাঁসে	প্রকৃত নাম Jacques Anatole Francois Thibault (১৮৪৪-১৯২৪), ফরাসী কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও নাট্যকার
করুণাবিন্দু বিশ্বাস	ইউ রায় এণ্ড সন্স এর কার্যাধ্যক্ষ
কাডুরি	সাংহাইয়ের এককালীন ধনী ব্যবসায়ী ও ইহুদি-সংঘের সভাপতি
কালিদাস	কালিদাস নাগ (১৮৯২-১৯৬৬) ঐতিহাসিক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা
কালীমোহন	কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২-১৯৪০), শ্রীনিকেতনের

	গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী, সংগীতজ্ঞ শান্তিদেব ঘোষের পিতা
কিশোরী	কিশোরীমোহন সাঁতরা, গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ
কুমারস্বামী	আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী (১৮৭৭-১৯৪৭)। ৫ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য।
কেদার	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৬৫) রামানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র
কেশবচন্দ্র	'নববিধানে'র প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)
কৃষ্ণ কৃপালানি	জন্ম ১৯০৭, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক, মীরা দেবীর জামাতা
গান্ধী	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)
গোরা	গৌরগোপাল ঘোষ (১৮৯৩-১৯৪০) শ্রীনিকেতনের প্রথম যুগের বিশিষ্ট কর্মী
চারু	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) প্রবাসীর সহসম্পাদক, লেখক
চিত্তরঞ্জন	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)
চৈন বন্ধু	সু-ৎসী-মো, রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের সময় দোভাষীর কাজ করেন, শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২৮ সালে।
জগদীশ	বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭)
জ্ঞান	জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মী, আশ্রমিক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র

জোতিদাদা	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)
টমসন	এডওয়ার্ড টমসন (১৮৮৬-১৯৪৬) বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের অধ্যক্ষ
টুচি	Gussepe Tucchi (১৮৯৪-১৯৮৪) প্রাচ্য ভাষাবিদ ইতালীয় অধ্যাপক, বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপক (১৯২৫-২৬)
ডাক্তার বসু	জগদীশচন্দ্র বসু
ডি সিলভা	W. A. De Silva সিংহলের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। ১৯২২ এ সিংহল ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন।
তারাপুরওয়ালা	I. G. S. Tarapoorwala (১৮৮৪-১৯৫৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক, বিশ্বভারতীর পারসিক ভাষার অভ্যাগত অধ্যাপক (১৯২৭-২৯)
দান্তে	মধ্যযুগের বিখ্যাত ইতালীয় কবি Dante Alighieri (১২৬৫-১৩২১)
দিনু	রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯০৫) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র।
নগেন্দ্র গুপ্ত	(১৮৬১-১৯৪০) সাংবাদিক ও সাহিত্যিক
নন্দলাল	শিল্পী নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬) শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ
নিবেদিতা	ভগিনী নিবেদিতা, মার্গারেট নোবল্ (১৮৬৭-১৯১১)

নীতু	নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১১-১৯৩২) মীরা দেবীর পুত্র
নেপালবাবু	নেপালচন্দ্র রায় (১৮৬৬-১৯৪৪) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক
নোগুচি	য়োনে নোগুচি (১৮৭৫-১৯৪৭) ১৪৮ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য
পরমহংস	শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬)
পিয়র্সন	উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন (১৮৮১-১৯২৩)
প্রফুল্ল রায়	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) রসায়নবিদ্, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা
প্রমথ	প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) সবুজপত্রের সম্পাদক, সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল
প্রশান্ত	প্রশান্ত মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) রবীন্দ্রনাথের কর্মসচিব, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা
ফর্মিকি	কার্লো ফর্মিকি (১৮৭১-১৯৪৩) রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক, বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপক (১৯২৫-২৬)
বড়দাদা	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)
বড়দিদি	সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০)
বিধুশেখর শাস্ত্রী	(১২৮৫-১৩৬৪) বিশ্বভারতীর দীর্ঘকালের অধ্যাপক
বীণকর	সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী
বুবা	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বৌমা	প্রতিমা দেবী। ১৮৯৩-১৯৬৯
বুদ্ধদেব	সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। ১৯০৮-১৯৭৪
ভূপেনবাবু	ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (১৮৭৭-১৯৬২), শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক
মণিলাল	সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮৮-১৯২৯
মহেশবাবু	পণ্ডিত ও দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষ, বাঁকুড়া স্কুলের শিক্ষক।
মার্কাস অরেলিয়স	রোমদেশীয় সম্রাট ও দার্শনিক। ১২১-১৮০ খ্রী
মীরা দেবী	রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা। ১৮৯৪-১৯৬৯
ডঃ মৈত্র	দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। ১২৮৪-১৩৫৬। চিকিৎসক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী
মৈত্রেয়ী দেবী	দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা, লেখিকা, সমাজসেবী
যদুবাবু	ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮)
রথীন্দ্র	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১)
রাজেন্দ্র শাস্ত্রী	(১৮৫৯-১৯১৯) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও সরকারী অনুবাদক
রাণী	নির্মলকুমারী মহলানবিশ
রামানন্দ	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(১৮৬৪-১৯১৯) বিজ্ঞানের অধ্যাপক, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং দীর্ঘকাল সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক
রোম্যাঁ রোলাঁ	(১৮৬৬-১৯৪৪) ফরাসী ঔপন্যাসিক ও শান্তিবাদী দার্শনিক

লর্ড সিংহ — সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (১৮৬৩-১৯২৮)

ললিত চট্টোপাধ্যায় — অধ্যাপক ও সাহিত্যিক

লোকেন পালিত — (১৮৬৫-১৯১৫), স্যার তারকনাথ পালিতের পুত্র, বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী, সুহৃদ

লানমান — চার্লস লানমান (১৮৫০-১৯৪১), হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

লেভি সাহেব — সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯৩৫), প্রাচ্যভাষাবিদ্ চেকোশ্লাভীয় পণ্ডিত, বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপক

সন্তোষ — কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯২৬)

সরলা — সরলা দেবীচৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫)

সীতা — রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪)

সুকুমার — সাহিত্যিক সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)

সুকুমারের দিদি — সাহিত্যিক সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯)

সুধীন্দ্র বসু — (—১৯৪৫) জন্মস্থান ঢাকা, আইওআ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক

সুধীরচন্দ্র কর — (১৯০৬-১৯৭৭) রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব

সুভাষ — সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫ ?)

সুরেন — শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯৪-১৯৭০)

শচীন্দ্র দাশগুপ্ত	৫৪-সংখ্যক পত্রপরিচয় দ্রষ্টব্য
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) কথাসাহিত্যিক	
শান্তি	শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
শাস্ত্রী মহাশয়	পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী (১২৮৫-১৩৬৪)
শ্রদ্ধানন্দ	পূর্বনাম লালা মুন্সিরাম (১৮৫৫-১৯২৬), হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা
হেমলতা বৌমা	(১৮৭৩-১৯৬৭) দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী, আশ্রম-বালকদের বড়মা, লেখিকা

সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারবর্গকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পত্র একদা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কোনো কোনো পত্র একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে প্রবাসীতে এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রে। প্রকাশের একটি যথাসাধ্য তালিকা নীচে দেওয়া হল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে এই-সব পত্রের প্রকাশকালে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চিঠিগুলির কিছু কিছু অংশ বর্জন করে মুদ্রিত করেন, কোনো কোনো চিঠি 'অপ্রকাশ্য' বলে চিহ্নিত করেন। বর্তমান সংকলনে পত্রগুলি যথাসম্ভব মূলানুযায়ী মুদ্রিত, তবে কোনো কোনো স্থলে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্জিত হয়েছে। এই সংকলনের প্রথম পত্রটি শান্তাদেবীর 'ভারত-মুক্তি-সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থের পৃ ৬১ থেকে গৃহীত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলী

প্রবাসী

	বর্তমান পত্রসংখ্যা
বৈশাখ ১৩৪৮	১৩, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৪
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮	৯৬, ৯৯, ১০১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭
আষাঢ় ১৩৪৮	১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৬০
শ্রাবণ ১৩৪৮	১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৬৮
ভাদ্র ১৩৪৮	১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩
আশ্বিন ১৩৪৮	৬২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ ৮৫, ৯০, ৬১, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৪
অগ্রহায়ণ ১৩৪৮	৩৫
কার্তিক ১৩৪৯	৪, ৭৬, ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৬ ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩

শ্রাবণ-আশ্বিন	১৩৭৫	৭৩
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৫	৮৩
মাঘ-চৈত্র	১৩৭৫	১২৯
শ্রাবণ-আশ্বিন	১৩৭৬	১৩৮
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৬	৬২
মাঘ-চৈত্র	১৩৭৬	১২৭
বৈশাখ-আষাঢ়	১৩৭৭	৩২
শ্রাবণ-আশ্বিন	১৩৭৭	১১৪
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৭	১৩০
মাঘ-চৈত্র	১৩৭৭	১৪০
বৈশাখ-আষাঢ়	১৩৭৮	১২৪
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৮	১৩৫
মাঘ-চৈত্র	১৩৭৮	১৪১
বৈশাখ-আষাঢ়	১৩৭৯	১৫২
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৯	১৪৯

অরুন্ধতী দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৯	৩

রমা দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৮	১

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৮ ১

শান্তা দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৮ ১৬

আশ্বিন ১৩৪৯ ২, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২১

কালিদাস নাগকে লিখিত

প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৯ ৮

পৌষ ১৩৪৯ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২,

মাঘ ১৩৪৯ ১, ১৪, ১৫

চৈত্র ১৩৪৯ ১৬, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬
২৭, ৩১, ৩২

আজকাল। ৪ মে ১৯৮৪ ১২ক

শান্তিনিকেতন পত্রিকা

শ্রাবণ ১৩২৯ ১৩

সীতা দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ ৫

প্রসাদের উদ্দেশে

শান্তিনিকেতন পত্রিকা

অগ্রহায়ণ ১৩২৬ শ্রাদ্ধবাসরে কবি-প্রদত্ত ভাষণ

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ পত্রাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেন প্রয়াত পুলিনবিহারী সেন। এই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। এই গ্রন্থসম্পাদন সম্পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তখন ১৪১টি পত্র মুদ্রণের কাজ শেষ হয়েছে। অতঃপর ১৯৭৭-এর প্রথম দিকে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং ১৯৭৮-এর প্রথম দিকে শ্রীভবতোষ দত্তের উপর এই ভার ন্যস্ত হয়।

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা পত্রগুলিতে প্রসঙ্গের গুরুত্ব বিবেচনা করে এই খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলপত্রের সঙ্গে মেলানো, তথ্যাদি সংগ্রহ, সর্বোপরি শান্তিনিকেতন প্রেসের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের জন্য গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হল।

এই খণ্ডে সংকলিত পত্রগুলির প্রাপ্তিস্থল স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হল। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিগুলি রামানন্দ তাঁর দুই কন্যা সীতাদেবী ও শান্তাদেবীকে দুই ভাগে ভাগ করে দেন। সীতাদেবী রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তির প্রাক্‌কালে তাঁর কাছে সংরক্ষিত চিঠি বিশ্বভারতীকে দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিও তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন। শান্তাদেবী তাঁর সংরক্ষিত পত্রগুলি দান করেন রবীন্দ্রভারতীকে। সীতাদেবীর নিকট থেকে রবীন্দ্রভবনের জন্য চিঠিপত্র এবং পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কৃতিত্ব পুলিনবিহারী সেনের। রামানন্দের পরিবারবর্গের কাছে লিখিত মূল পত্রগুলি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। এ ছাড়া আরো চিঠি থাকা সম্ভব।

বর্তমান সংকলন মুদ্রণের কাজ যখন অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে তখন

কালিদাস নাগকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় ('আজকাল', ৪ মে ১৯৮৪)। বর্তমান সংকলনে এটি সংযোজিত হল (পৃ ৩২০ ক-৩২০ খ)। পত্রটি প্যারিস থেকে ১ বৈশাখ ১৩২৯-এ কালিদাস নাগের লেখা চিঠির উত্তর। কালিদাস নাগের চিঠিটি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে।

প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি মূল পত্রের অস্বস্তিকর-প্রসঙ্গবর্জিত। কয়েকটি চিঠি রামানন্দ 'অপ্রকাশ্য' চিহ্নিত করে শান্তাদেবীকে দেন। চিঠিপত্র দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশের যখন প্রস্তাব হয়, তখন পুলিনবিহারীর আগ্রহাতিশয্যে শান্তাদেবী সেগুলি কপি করে নিতে দেন। তদনুযায়ী এই চিঠিগুলি গৃহীত। প্রথম দিকের কয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ অমুদ্রিত রাখা আছে। পরবর্তীকালে যথাযথ মুদ্রণের নীতি গৃহীত হলেও পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদিত অংশের পরিবর্তন করা হয় নি।

চিঠির শীর্ষে বাঁদিকে যে ইংরেজি তারিখ তা পত্রে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী প্রদত্ত অথবা পত্রান্তর্গত প্রসঙ্গ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। অনুমিত তারিখ বন্ধনীর দ্বারা চিহ্নিত। তারকাযুক্ত তারিখ ডাকঘরের ছাপ থেকে গৃহীত। তারিখের পূর্বের তারকাচিহ্ন চিঠি ডাকে দেবার এবং তারিখের পরবর্তী তারকাচিহ্ন চিঠিবিলির নির্দেশক।

পত্রের অভ্যন্তরস্থিত তৃতীয় বন্ধনীযুক্ত সমস্ত অংশই অনুমিত পাঠ।

যথাসম্ভব সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এড়ানো সম্ভব হয় নি। সংখ্যা-মুদ্রণে কয়েকটি প্রমাদের প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। দ্রষ্টব্য পৃ. ২৪৫, ৩০৬, ৩১৭, ৪৫০, ৪৫৮ এবং ৪৬০।

গ্রন্থপরিচয় রচনায় নানা ব্যক্তির কাছে সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। প্রয়াত মনোরঞ্জন গুহ এবং শ্রীক্ষিতীশ রায় মহাত্মা গান্ধী-সম্পাদিত 'Young India'তে প্রকাশিত 'The Centre of Indian Culture'-এর সারাংশ প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য অনুগ্রহ করে জানিয়েছিলেন। শ্রীনির্মালা আচার্য লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরি থেকে 'চোখের বালি'র এণ্ডার্সন-কৃত অনুবাদের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। শ্রীপার্থ বসু কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুরনো স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। শ্রীগার্গী দত্তের সাহায্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত যদুনাথ সরকারের 'India Through the Ages' বইখানি দেখবার সুযোগ হয়েছে।

তথ্য সন্ধানে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রভবনের অন্যান্য কর্মীদের সাহায্য সব সময়েই অবারিত ছিল। বর্তমান সম্পাদকের অধ্যক্ষতায় (জানুয়ারি ১৯৭৮-মে ১৯৮১) পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ শ্রীনরেশ গুহ ভবন-গবেষণা-সহায়িকা ড. সাধনা মজুমদারকে বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদন কর্মে সহায়তা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। গ্রন্থপরিচয় ও তথ্যসংগ্রহ, প্রেস কপি প্রস্তুত করা এবং প্রুফ সংশোধন করা— সকল পর্যায়েই তাঁর সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। রবীন্দ্রভারতীতে সংরক্ষিত পত্রগুলি মেলানোর কাজে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহায়তা উল্লেখ্য।

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	শুদ্ধরূপ
১৯৬	১৮	স্প্রিং
২১৩	১০	নিগূঢ়
২১৩	১৮	সম্বন্ধরহস্য
২২৫	২০	রোদ্দুর
২৪৫	২	১-৩৩
২৮৬	৪	অম্বুবাচীর
২৯৭	২	ফুটো
৩০৬	৭	২৪
৩১৭	৭, ৮	৩৩, ১৫
৩২৪	১	তারা
৩৬০	১৭	Personality
৩৬২	৮, ১৮	Nation
৩৯০	১৩	করিয়া
৪০৪	১১	suggest
৪৩২	১৫	অসংযমের জন্যে
৪৪৪	২	এলাহাবাদ
৪৫০	৮	১৯১২
৪৫৮	১১	১৯
৪৬০	৫, ৬	১৯১২
৪৭১	৬	শাসক
৪৮৬	৭	লাহিড়ীর

মূল্য ৪২'০০ টাকা